সুনীল দাস
সম্পাদিত

মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি

পরিচায়িকা
ডঃ সুকুমার সেন

সাহিত্যলোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

স্বর্গত বাবা-মা

৺দেবেন্দ্রনাথ দাস

ও

৺দ্রৌপদী দেবী-র

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

পরিচায়িকা

বাংলায় পুরাতন সাহিত্যের পশ্চিমতটভূমির সঙ্গে নবীন সাহিত্যের পূর্বতটভূমির সহিত সেতুবন্ধন করিয়া যে দুজন লেখক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের একজন হইলেন মনোমোহন বসু। কবিতায় কবিগানে গানে নাটকে প্রবন্ধে ইনি নিজের দক্ষতার প্রচুর পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দেশের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টায়ও ইঁহার যথেষ্ট উদ্যম ছিল। সে কথা ইতিহাসে গাঁথা আছে।

তিনি শেষ বয়সে একদা ডায়েরি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টা স্থায়ী হয় নাই। মনোমোহন বসু মহাশয়ের ডায়েরি যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহা অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ পর্যন্ত—তাহার মধ্যেও প্রচুর ফাঁক আছে, এবং ১৮৯৮ সালের যৎসামান্য। তবে ডায়েরি খাতার শেষে অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান পাওয়া গিয়াছে। এই গানগুলির মূল্য সকলেই বুঝিবেন। ডায়েরি অংশের মূল্য সকলে হয়ত ধরিতে পারিবেন না। ইহাতে লেখকের যে আত্মকথাটুকু আছে তাহার বিষয়মূল্য খুব বেশি নয় তবে ভাবমূল্য যথেষ্ট আছে। মনোমোহনের সরল সুস্থ অন্তঃকরণের স্বচ্ছ প্রতিফলন আছে এই কয়খানি পাতার মধ্যে। ডায়েরি তিনি ছাপাইবার জন্য লিখেন নাই; তাই নিজের মনকে ঢাকিয়া রাখিবার কোন চেষ্টাই নাই, অত্যন্ত উপভোগ্য।

ডায়েরিটির আরও একটি মূল্য আছে; বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচকের পক্ষে। একদা যে এলাহাবাদে কলিকাতা ও বারাসত-নিবাধুই অঞ্চলের কায়স্থদের যে বড়ো উপনিবেশ ছিল সে সম্বন্ধে অনেক তথ্য নিহিত আছে ডায়েরিটিতে।

ভাষাতেও কিছু কিছু বিশিষ্টতা আছে। মনোমোহন লিখিয়াছেন—আইল, আইলেন; আইলে (—আসিল; আসিলেন, আসিলে স্থানে) তাহা হইতেছে আধুনিক কথ্য পদ এল, এলেন; এলে—ইত্যাদির প্রাচীনতম রূপ। এমন পদ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখায় মিলে।

শ্রীসুনীল দাস বইটি সম্পাদন ও প্রকাশ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও বাংলা সংস্কৃতির পোষকতা করিয়াছেন।

শ্রীসুকুমার সেন

ভূমিকা

মনোমোহন বসু উনিশ শতকের এক ঐতিহাসিক চরিত্র। আসন্ন জুলাই ১৯৮১-তে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই উপলক্ষ স্মরণ করে তাঁর সত্তরতম মৃত্যু-দিবসে আমরা প্রকাশ করছি তাঁর অপ্রকাশিত ডায়েরি। এই সঙ্গে থাকছে ছদ্ম-পরিচয়ে লেখা তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম অধ্যায়।

অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত কোন বাঙালী ডায়েরি লেখেন নি, আধুনিক অর্থে আত্মজীবনীও না। ভারতীয় চরিত্রের ইতিহাসবিমুখতাই সম্ভবত এর কারণ। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবেই এই দুই বস্তুর চলন হল বাংলাদেশে। প্রথম কোন্ বাঙালী ডায়েরি লেখেন? সঠিক বলা যাবে না, তবে অনুমান করা চলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বোধ হয় সেই ব্যক্তি। তারপর থেকে ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে এর রেওয়াজ দেখা দিল। বাংলায় প্রথম ডায়েরি যিনিই লিখুন তিনি যে সামান্য ইংরেজী জানা বা ইংরেজী না-জানা কোন ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালীর লেখা প্রথম ডায়েরি এযাবৎ যা পাওয়া গেছে তার লেখিকা কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী দেবী। ইনি ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেন ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে (১২৫৩, আষাঢ়)। এই ডায়েরি কিছুকাল পূর্বে সাময়িক পত্রে ধারাবাহিক ছাপা হয়েছে (মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ থেকে)। বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে কে প্রথম বাংলায় ডায়েরি লিখলেন সঠিক বলা কঠিন। তবে দেখা যাচ্ছে 'সখা'-সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় ডায়েরি লিখতে শুরু করেছেন।

মনোমোহনের প্রায় সমকালেই ডায়েরি লেখেন রাজনারায়ণ বসু। এই ডায়েরি অবশ্য ইংরেজী-বাংলা দুই ভাষাতেই লেখা। এই ডায়েরির কিছু অংশ একদা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ও নব্যভারতে ছাপা হয়েছিল; কিছু শ্রীমতী অশ্রু কোলে তাঁর লেখা 'রাজনারায়ণ বসু : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধার করেছেন। মূল ডায়েরিগুলি বর্তমানে অপ্রাপ্য।

মনোমোহনের ডায়েরি লেখার বাসনা দীর্ঘদিনের। কিন্তু দীর্ঘসূত্রী স্বভাবের উৎসাহহীনতায় 'বহু বৎসর কাটিয়া গেল', ডায়েরি লেখা আর হল না। কিন্তু '...একটি বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হওয়াতে' 'চিরদিনের সংকল্প সিদ্ধ' করতে মনোমোহন ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করলেন ২১ আশ্বিন ১২৯৩, বুধবার থেকে। প্রয়োজনটি নিতান্তই বৈষয়িক অর্থাৎ 'যে সকল পুস্তক বিক্রেতার নিকট আমার পুস্তক বিক্রয় হয় তাহাদের হিসাব রাখা প্রয়োজন'—এইটিই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া অবশ্য কিছু গৌণ উদ্দেশ্যও আছে, সেগুলি 'দৈনিক লিপি'র পাঠকের কাছে অগোচর থাকবে না। গোড়াতেই মনোমোহন বলে রেখেছেন হাতের কাছে যখন যেমন কালি, কলম,

পেন্সিল পাবেন তাই দিয়ে দৈনিক লিপি লিখে রাখবেন। কথা আর কাজের মধ্যে খুব বেশি তফাৎ হয়নি। ফলে ডায়েরির অনেকটাই পেন্সিলে লেখা, এই অংশের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। দামী চামড়ায় সুন্দরভাবে বাঁধানো অলঙ্কৃত একটি খাতাতে মনোমোহন ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। খাতাটির আকার ২১×১৯ সেন্টিমিটার। পুস্তানির পাতার উল্টো দিকে 'পাঞ্জাব কেশরী' রণজিৎ সিং-এর ছবি মনে পড়িয়ে দেবে 'দুলীন' উপন্যাসের কথা। ডায়েরির প্রথমেই তিনি নিজের জন্মপঞ্জিকা লিখে রেখেছেন। আর লিখেছেন নাতি-নাতনীদের জন্মপঞ্জিকা। উদাহরণতঃ ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর কথা উল্লেখ করা চলে (সন ১২৯৯ সাল ৯ বৈশাখ, বুধবার রাত্রি ১০ টা ৫৫ মি.)। ২১ আশ্বিন ১২৯৩ (১৮৮৬) বঙ্গাব্দের পর লিখেছেন ১৬ কার্তিক। এ মাসে ৩০ কার্তিক পর্যন্ত নিয়মিত। অগ্রহায়ণ ও পৌষ, এ দু মাসে মাত্র ১৫ দিন লিখেছেন। আশ্বিন থেকে পৌষ পর্যন্ত ডায়েরি লেখা হয়েছে কলকাতা ও ছোট জাগুলিয়ায় বসে। দেখা যায় একসঙ্গে ৮ দিনের ঘটনা একই দিনে লিখেছেন। আবার অনেকদিনের পুরনো ঘটনা টেনে এনেছেন বর্তমানের খাতায়। এ সময়ের লেখা থেকে তাঁর রচিত পদ্যমালা ও মনোমোহন গীতাবলীর প্রস্তুতিপর্ব, প্রুফ দেখা ও ছবি সংযোজনের নানা খবর জানা যায়। আরো জানা যায় এঁড়েদহের সৌখিন সম্প্রদায়, বাগবাজার হাফ-আখড়াই দল ও ভবানীপুরের সখের দলের যদুবংশ ধ্বংস এবং সীতার পাতালগমন প্রভৃতি গীতাভিনয়ের জন্য রচিত গানের খবর।

১৪ মাঘ থেকে ৪ঠা ফাল্গুন এই সময়ে কাশী, মোগলসরাই, মির্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ ও নৌকাযোগে যমুনা ভ্রমণের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর ডায়েরিতে। এরপর তিনি দীর্ঘ বিরতির পরে ডায়েরি লিখতে শুরু করেছেন। লিখেছেন ৬ ভাদ্র ১৩০৫ বঙ্গাব্দ থেকে ২৭ ভাদ্র পর্যন্ত।

১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১১ ভাদ্র তাঁর 'প্রাণপ্রতিম পৌত্রী শ্রীমতী প্রভা'র মাত্র ১১ বৎসর বয়সে কয়েকদিনের জ্বরে মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে ১৪ পৌষ ১২৯৮ সালে। নিঃসঙ্গ জীবনে মনোমোহন স্ত্রীর অভাব প্রতিনিয়ত অনুভব করেছেন, ডায়েরি পাঠে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর রচিত গানগুলি চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তীর্থযাত্রার বিবরণে মনোমোহন বার বার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন ঃ "সস্ত্রীক তীর্থকরা বড় গৌরবের কিন্তু আমি জানিতাম না যে তীর্থস্নান কালে গাঁইট ছড়া বাঁধিতে হয়, আমার স্ত্রীর তাহা জানা ছিল, যেহেতু স্ত্রীলোকেরাই যথার্থ ভক্তি করিতে জানে, তজ্জন্য তাহারা সকল তথ্যই রাখে। স্ত্রীর অনুরোধেই আমার তীর্থগমন করা হইয়াছিল। নানা স্থান, সুতরাং নানা তীর্থস্থান দর্শন আমার বড় প্রবৃত্তি বটে, এই পর্যন্ত। সে যাহা হউক, নদীতে স্নানার্থ নামিতেছি দেখি যে আমার কাপড়ে টান পড়িল, মুখ ফিরাইয়া দেখি যে, আমার স্ত্রী

আমার কোঁচার কাপড়ের সঙ্গে তাহার অঞ্চল যোগ করিয়া গাঁইটছড়া বাঁধিতেছে। কিয়দংশে ভাব বুঝিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ওকি, একবার গাঁইটছড়া বাঁধায় ধাক্কা আজো সামলাতে পাচ্ছি না, আবার কেন?' সেই দিন এবং আসল দিন ঐ উপলক্ষে ঐরূপ পরিহাস কেন করিয়াছিলাম হায়! তখন কি জানি যে ঈশ্বর আমাকে সে প্রার্থনীয় ধাক্কা হইতে শীঘ্র মুক্ত করিবেন।" এই ধরনের নানা সুখস্মৃতি বারবার তিনি স্মরণ করেছেন গানের মধ্যে।

মনোমোহনের ডায়েরিতে সেকালের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায়। অতুলকৃষ্ণ মিত্র রচিত 'ধর্মবীর মহম্মদ' নাটক নিয়ে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়ে মনোমোহন ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন। ১২ নভেম্বর. ১৮৮৬ তারিখে 'স্টেটস্‌ম্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় মনোমোহন যে 'M' স্বাক্ষরিত চিঠি লিখেছিলেন ঐ পত্রিকায় তার 'লেজা-মুড়া' বাদ দিয়ে ছাপা হয়। ডায়েরিতে মনোমোহন অনবধানতা বশতঃ লিখেছেন ১৩ নভেম্বর শনিবার চিঠিটি ছাপা হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি উদ্ধার করা হল :

THE "DHARMABIR MAHOMED"

Sir,—As I was present at the interview of Baboo Gooroodas Chatterjee with Nawab Abdool Latif Khan, I cannot refrain from correcting a few of the misstatements in "Fara Diavolo's" letter.

The Hindoo friend of Gooroodas Baboo did certainly at first advise him to wait until Mr. Amir Ali's return; but subsequently, on some explanations given by me, he came round to the decision that Baboo Gooroodas should at once make the books over to the Nawab Bahadoor.

Your correspondent says, the Baboo "appeared before the Nawab like a culprit with a heap of the objectionable publication, and a written undertaking to act according to the wishes of the Mahomedan Community." This is all nonsense. The Baboo appeared before the Nawab not as a culprit, but as an invited guest, and not with the heap of books, for the books had been sent on the previous day through his bearer. He never gave any "written undertaking" of any short to anybody. The true fact of the case is this :—The Nawab at the time of signing the receipt for the books wrote a few words on it intimating his desire to see Baboo Gooroodas, who accordingly went to him on the following evening.

The Newab's object in thus inviting him to his house was, as he informed us at the interview, to explain fully why he thought the publication most objectionable and thereby to induce the Baboo to try his best to call back, if possible, those copies that had gone out of his library.

"Fara Diavolo" writes: "The Nawab Bahadoor advised the immediate 'cremation' of the books; but Baboo Gooroodas, with the instinct of his cloth, suggested the putting off of the execution till Mr. Amir Ali's views were known." This is wholly fabulous. The Nawab never once expressed any such desire; neither did Gooroodas Baboo suggest anything of the sort, with another gentleman of a most respectable position in Hindoo Society, I was all the while present at the interview, and joined in all the talk that took place there. The Nawab, on the contrary, most distinctly expressed his intention to invite and gather together the leading men of his community in his house, and dispose of the books in such a manner as seemed advisable and agreeable to them, and the books are, I think, yet intact in the Nawab's house.

১৩০৫, ৬ ভাদ্র থেকে ১১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অর্থাৎ ২৭ ভাদ্র ১৩০৫ (১৮৯৮) পর্যন্ত তিনি কলকাতায় বসে লিখেছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনের কথা। পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (২৭ ভাদ্র ১৩০৫) রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী 'উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' পাঠ করেন। এই সমালোচনার বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করে।

পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদসূত্রেই তাঁর প্রবন্ধটি লেখেন। পূর্বোক্ত সভায় মনোমোহন উপস্থিত ছিলেন। এই আলোচনা সম্পর্কে মনোমোহন মন্তব্য করেছেন,— "উপসর্গ লইয়া যে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা পণ্ডশ্রম মাত্র।" পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথের মূল প্রবন্ধ এবং রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীর সমালোচনার উপর ভিত্তি করে 'উপসর্গ সমালোচনা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ তৎকালীন সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অনুরোধ করে একটি পত্র দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় ছাপা হয়নি। প্রবন্ধটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে মুদ্রিত হয়। রাজেন্দ্রচন্দ্র

শাস্ত্রীর সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে মনোমোহনের বক্তব্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের প্রতি নূতন করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। লেখক আমাদের মান্য গুরুজন সে একটা কারণ বটে, কিন্তু গুরুতর কারণ এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে যে অসামান্য গবেষণা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের মতো অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।
কিন্তু ইতিমধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় 'উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' আখ্যা দিয়া এক রচনা বাহির করিয়াছেন। সেই রচনায় তিনি প্রবন্ধ লেখকের মতের কেবলই প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কোথাও সমর্থনযোগ্য শ্রদ্ধেয় কোনো কথা আছে, এমন আভাসমাত্র দেন নাই।" (উপসর্গ; শব্দতত্ত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী; ১২শ খণ্ড; বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৪৯; পৃ. ৫৫১। উৎসাহী পাঠক পুরশ্রী পত্রিকার ২য় বর্ষ ২য় সংকলনে প্রকাশিত 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ঃ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।)
মধ্যস্থ যন্ত্রালয় থেকে পুস্তকাদি বিক্রয় করা হত। শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য মনোমোহন মধ্যস্থ যন্ত্র হস্তান্তর করতে বাধ্য হলেও পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন এবং এইটিই পরবর্তীকালে মনোমোহন লাইব্রেরি নামে পরিচিত হয়। শেষ বয়সে মনোমোহন তাঁর কর্মময় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০৩।২ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত মনোমোহন লাইব্রেরির সমস্ত স্বত্ব তিনি বিক্রি করেছিলেন তাঁর পুত্র মতিলাল বসুকে। আনুমানিক ১২৮০ সালে মনোমোহন এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। এখান থেকে সুলভ মূল্যে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক, ম্যাপ, নাটক, নভেল, শাস্ত্র, বটতলার বই ইত্যাদি বিক্রি করা হত। মনোমোহন লাইব্রেরির স্বত্ব তিনি যে মতিলালকে বিক্রি করেছিলেন তা জানা যাবে তাঁর ডায়েরি থেকে। চীনাবাজারের বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী শম্ভুচন্দ্র সিংহ কোম্পানি একবার মনোমোহন বসু ও মতিলাল বসুর নামে একটি তারিখহীন পত্র পাঠান। পত্রে পাওনা টাকার তাগিদ দেওয়া হয়। মনোমোহন এই পত্রের উত্তর লিখেছেন ১৯ এপ্রিল ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। এই উত্তরের একটি খসড়া ডায়েরির প্রথম দিকে ছিল আমরা তা এখানে উদ্ধার করলাম ঃ
"...আপনাদের তারিখহীন যে পত্র অদ্য কয়েকদিন হইল আমার ও শ্রীযুক্ত মতিলাল বসুর নামে (যাহাতে দুইজন সাহেবকে মধ্যস্থ মানিয়া) পাঠাইয়াছেন আমার নিজের পক্ষ হইতে তাহার প্রত্যুত্তরে আমার নিবেদন এই যে, আমাকেও যেন 'মনোমোহন লাইব্রেরীর' একজন অংশীদার ভাবিয়া ঐরূপ পত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু আপনারা

বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন যে ঐ লাইব্রেরীর সমস্ত স্বত্ব মায় দেনা পাওনা শ্রীযুক্ত মতিলাল বসুকে অনেকদিন হইল আমি বিক্রয় করিয়াছি। লাইব্রেরীর খাতা পত্র হিসাবাদি সকলই তাঁহার কাছে আছে। তিনিই পাওনা আদায় ও দেনা পরিশোধের ভার লইয়াছেন। অতএব তাঁহাকে লিখিলেই আপনাদের কার্য্যসিদ্ধ হইবে। আমার এ বৃদ্ধ বয়সে ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে পারিব না বলিয়াই লাইব্রেরী পরিত্যাগ করিয়াছি।"

মনোমোহন ২৭ ভাদ্র ১৩০৫ তারিখের পর আর ডায়েরি লেখেন নি। অগ্রহায়ণ ১৩০৫ সাল থেকে তিনি গান লিখতে শুরু করেছেন। লিখেছেন মাত্র ১৩ পৃষ্ঠা। আবার ১৩১৩ (১৯০৬ খৃীঃ) থেকে লিখতে শুরু করেছেন তীর্থযাত্রার গান। এরপর প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা অব্যবহৃত রয়ে গেছে।

এই ডায়েরির গুরুত্ব নানা দিকে। এ থেকে অনেক সামান্য ঘটনার কথা যেমন জানা যাচ্ছে, তেমনি জানা যাচ্ছে, তাঁর জীবনের গৌরবময় দিনগুলির কিছু কথা। চতুর্থবার কাশী ভ্রমণের কথা লিখতে গিয়ে ৩৮ বছর পূর্বে প্রথম কাশী ভ্রমণের স্বর্ণময় দিনের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। এখানেই তিনি উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে কাশীতে তাঁর কবির লড়াই-এর কথা।

মনোমোহনের এই ডায়েরি প্রথম ব্যবহার করেন বাণীনাথ নন্দী। মনোমোহনের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত শোকসভায় তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন সেই প্রবন্ধে এই ডায়েরির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। পরবর্তী কালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালার অন্তর্গত মনোমোহনের জীবনীতে ডায়েরির কোন কোন অংশ ব্যবহার করেছেন। উদ্ধৃতি ছাড়াও তিনি ডায়েরি থেকে জন্মকালের ও স্থানের সঠিক বিবরণ প্রকাশ করেছেন সর্বপ্রথম। ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে ডায়েরিটি পেয়েছেন সে সম্পর্কে লিখেছেন ঃ "শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর সৌজন্যে তদীয় পিতামহ মনোমোহনের একখানি অপ্রকাশিত ডায়ারি বা দিনলিপি আমার হস্তগত হইয়াছে।" ডায়েরিটি বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় আছে। কিন্তু এই ডায়েরি কিভাবে পরিষদে এসেছে নথিপত্র ঘেঁটেও তার হদিস করতে পারিনি। তালিকাভুক্ত না হওয়ায় এবং কোথায় ছিল তার সন্ধান জানা না থাকায় অনেক গবেষকই এই অমূল্য সম্পদ চোখে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

১৩৮৫ বঙ্গাব্দে পরিষৎ-সদস্য শ্রীঅশোক উপাধ্যায় গ্রন্থাগারিকের অনুমতি নিয়ে বাতিল কাগজপত্রের মধ্য থেকে উদ্ধার করেছিলেন মনোমোহনের ডায়েরি ও মধ্যস্থ পত্রিকার প্রথম বর্ষের ফাইল। একই সময় তিনি উদ্ধার করেন উনবিংশ শতাব্দীর নানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও পত্র-পত্রিকা।

বর্তমান গ্রন্থকে আমরা 'মনোমোহন বসুর দৈনিক লিপি' ও 'অপ্রকাশিত গান' এই দুই ভাগে ভাগ করেছি। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে এযাবৎ গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত আত্মজীবনী 'সমাজ চিত্র (পূর্ব ও বর্তমান) অথবা কেঁড়েলের জীবন' এবং 'মনোমোহন

প্রসঙ্গে'। আমরা গোড়াতেই বলেছি বাঙালীর আত্মজীবনী রচনার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের নয়। রাজা রামমোহন রায় ও কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরেজীতে লেখা আত্মজীবনীর কথা বাদ দিলে প্রথম বাংলা আত্মজীবনীর সন্ধান মেলে উনিশ শতকের সাতের দশকে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের লেখা 'রা, সের ইতিবৃত্ত'ই (এপ্রিল ১৮৬৮) প্রথম বাংলা আত্মজীবনী। অনেকে অবশ্য রাসসুন্দরী দেবীর (সরকার) লেখা 'আমার জীবন'কেই (ডিসেম্বর ১৮৭৬) প্রথম আত্মজীবনী বলে থাকেন; কিন্তু এ বক্তব্য মানা চলে না। আসলে 'রা, সের ইতিবৃত্ত' উত্তমপুরুষে বর্ণিত হয়নি এবং বইটি দুষ্প্রাপ্য, সেই কারণেই বোধ হয় এই মতের সৃষ্টি। কালক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাসসুন্দরীর আমার জীবন নয়, মনোমোহনের কেঁড়েলের জীবনই বাংলা আত্মজীবনীর তালিকায় দ্বিতীয়. যদিও এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই সমাজচিত্র তাঁর জন্মস্থান ও জন্মকাল নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে অনেকখানি। অবশ্য ডায়েরি থেকেও তাঁর জন্মতারিখ জানা যায়। 'সমাজচিত্র' মধ্যস্থে ২৮ ভাদ্র ১২৮০ থেকে প্রকাশ আরম্ভ হয়ে শেষ হয়েছে ফাল্গুন ১২৮০ সংখ্যায়। মোট ছয়টি 'পটে' এটি লেখা হয়। ঊনবিংশ শতকের তিরিশের দশকের গ্রাম-বাংলার সমাজকে জানতে হলে কেঁড়েলের জীবন অবশ্যপাঠ্য। গ্রন্থের শেষ পরিশিষ্ট 'মনোমোহন প্রসঙ্গে' মনোমোহনের জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনের উপদেশ ও নির্দেশে আমি এই গ্রন্থ সম্পাদনায় উৎসাহিত হই। তাঁর লিখিত পরিচায়িকা বর্তমান গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

শ্রদ্ধেয় শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীঅতুল সুর, দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ ও নাট্যকার শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের অনুপ্রেরণার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেন তাঁর পারিবারিক সংগ্রহ থেকে দ্বিতীয় বর্ষের দুষ্প্রাপ্য মধ্যস্থ পত্রিকাটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে দিয়ে সম্পাদনার শ্রম অনেকাংশে লাঘব করেছেন। শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দুষ্প্রাপ্য বই দিয়ে সাহায্য করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদনায় আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি অগ্রজপ্রতিম বন্ধুবর শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই বই-এর যাবতীয় পরিকল্পনা তাঁরই। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ধৃষ্টতা নাই।

আমার প্রাক্তন কর্মক্ষেত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক শ্রীশান্তিময় মিত্র আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই বই-এর প্রুফ সংশোধন করেছেন। সম্পাদনকার্যে তাঁর নানাপ্রকার সাহায্যের কথাও স্মরণযোগ্য।

পরিষদের শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী নন্দন ও শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত,

শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রশান্তকিশোর রায়, শ্রীযামিনীমোহন আদক, শ্রীযতনরাম কাহার ও শ্রীতপন চক্রবর্তীর সাহায্যের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগারিক শ্রীতুষারকান্তি সান্যাল ও স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার রেকর্ডকিপার শ্রীঅলোক গুপ্ত 'ধর্ম্মবীর মহম্মদ' সম্পর্কে মনোমোহনের পত্রটি সংগ্রহের ব্যাপারে সাহায্য না করলে এই গুরুত্বপূর্ণ পত্রটি উদ্ধার করা সম্ভব হত না। শ্রীঅশোক চন্দ্র ও আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার সহকর্মী শ্রীমান্ সুজিত ঘোষ এই গ্রন্থের কয়েকটি আলোকচিত্র সুনিপুণভাবে তুলে দিয়ে গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। অধ্যাপক শ্রীমুদুলকান্তি বসুর সহযোগিতা আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে।

'পুরশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসমরেশ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীহরিপদ ভৌমিক মনোমোহনের ডায়েরি ধারাবাহিক পুরশ্রী পত্রিকায় ছাপতে আগ্রহী হয়েছিলেন, এর ফলেই এই বইয়ের সূত্রপাত। শ্রীমতী শিপ্রা দাসের সাগ্রহ সহযোগিতা এই গ্রন্থসম্পাদনার কাজ সহজ করে দিয়েছে। শ্রীমান্ বিমলকুমার পাল প্রভূত শ্রম স্বীকার করে এই বইয়ের নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এঁদের সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

সাহিত্যলোকের কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ এই অ-লাভজনক বই প্রকাশে অগ্রণী না হলে এ বই এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা সম্ভব হত কি না সন্দেহ। এই বই প্রকাশে তাঁর যত্ন ও ধৈর্য আমাকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি সাহিত্য-রসিক বঙ্গভাষীজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন। এই প্রসঙ্গে বঙ্গবাণী প্রিন্টার্সের প্রবীণ কর্মী শ্রীমাখনলাল চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কর্মীদের অক্লান্ত সহযোগিতার কথা স্মরণ করি।

যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও কয়েক জায়গায় মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে। ১৮২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে হিন্দু মেলার দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।' শ্রীরাধারমণ মিত্র তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'কলিকাতা দর্পণ' বইয়ে লিখেছেন—'রাজা বদনচাঁদ ওরফে রাজা বৈদ্যনাথ রায়। মূল রিপোর্টেই টালার বাগান বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা ভুল। হবে কাশীপুরের বাগান। কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি রোড ও ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের মোড়ে এখনো সেই বাগানবাড়ি আছে। টালায় রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কোনো বাগান ছিল না।'—মিত্র মহাশয় তথ্যটি কোথা থেকে পেয়েছেন জানাননি। সুতরাং আমাদের পক্ষে বিচার করা শক্ত, তথ্যটি সঠিক কি না।

পরিশেষে আমার সবিনয় নিবেদন, আমি গবেষকও নই, পণ্ডিতও নই। আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মনোমোহন সম্পর্কে তথ্যগুলি একত্র সন্নিবেশ করতে। ভুলত্রুটি যা রয়ে গেল তার জন্য সম্পূর্ণ আমিই দায়ী।

সুনীল দাস

শ্রীশ্রীঈশ্বরোজয়তি।

মনোমোহন বসুর দৈনিক লিপি

বহুকালাবধি এইরূপ দৈনিক লিপি-পুস্তক করিতে মনের মধ্যে নিতান্ত বাসনা ছিল ; কিন্তু যে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য এই দুর্ভাগ্য জীবনের পক্ষে বিদ্যা, ধন, মান ও বন্ধুতা উপার্জন ও রক্ষণ এবং ইচ্ছা, সত্ত্বেও পরোপকার সাধন বিষয়ে চিরকাল ঘোর ব্যাঘাত জন্মিয়া আসিয়াছে, এ বিষয়েও আমার সেই-পরম শত্রু (দীর্ঘসূত্রিতা) বাদ সাধিয়াছে। ফলতঃ "আজ নয় কাল্", এই করিয়া বহুবৎসর কাটিয়া গেল। শেষে ভাবিলাম, একখানা বড় বই বাঁধাইয়া না লইলে দীর্ঘসূত্রীর নিরুৎসাহ মন উত্তেজিত হইবে না। যদিও কয় বৎসর হইল তদুদ্দেশ্যে একখানা বই একবার বাঁধানো হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে (কি আলস্য হেতু) তাহা আজ্, কাল্ করিয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখার পর একটি বিশেষ প্রয়োজন (যে সকল পুস্তকবিক্রেতার নিকট আমার পুস্তক বিক্রয় হয়, তাঁহাদের হিসাব রাখা প্রয়োজন) উপস্থিত হওয়াতে তাহাতেই তাহা লাগানো হইল, এবারে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চির দিনের সংকল্প সিদ্ধ করিবই করিব। তাহাতে ভাষার ভাল-মন্দর প্রতি দৃষ্টি রাখিব না। যেদিন যে ঘটনা লিপিযোগ্য বা শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক সামাজিক, বৈষয়িক প্রভৃতি বহু বিষয়ক বিশেষ বিশেষ অবস্থা—যখন যাহা উপস্থিত হইবে—তখনই বা তৎপরেই তাহা লিখিয়া রাখিব। যখন যেমন কালী কলম পেন্সিল সম্মুখে থাকিবে, তাহারই সাহায্য লইয়া সংকল্প মত কার্য্য করিব। কিন্তু আমার ভাবগতিক আমি বেশ জানি, যাহা জানি, তাহাতে সম্পূর্ণ ভয় আছে। কিছু দিনের মধ্যেই পাছে পূর্ব্বোল্লিখিত সেই নিদারুণ (নাছোড়বান্দা) শত্রু আবার প্রবল হইয়া সংকল্পকে এক পাশে ফেলিয়া রাখে। জগদীশ্বরের ইচ্ছা, দয়াময় ঐ বিষম বৈরির অভাজন দাসকে রক্ষা কর !

সন ১২৯৩ সাল

[শকাব্দা ১৮০৮। সংবৎ ১৯৪৩। খৃঃ অব্দ ১৮৮৬। এক্ষণে আমার বয়ক্রম ৫৫ পঞ্চান্ন বৎসর ৪ চারি মাস যেহেতু সন ১২৩৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রথম রথের পর দ্বিতীয় রথের মধ্যে যে বুধবার সেই বুধবারে আমার জন্ম। তিথি ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শুক্লাপঞ্চমী। ঠিকুজি ছিল, হারাইয়া গিয়াছে।]

২১শে আশ্বিন, ১২৯৩। বুধবার।

অদ্য আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ মতিলাল বসুর শ্রীমান্ প্রথম নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। অদ্য মহানবমী পূজা। কলিকাতা কম্বলিয়া টোলায় মতিলালের শ্বশুর

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র কর মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহ্ন ১২টা ৩৫ মিনিটের সময় বালক ভূমিষ্ঠ হয়।

[এই লেখাটুকু বেশী দিন নয়, পরে লেখা, এ জন্য পরবর্ত্তী কতক দিনের দৈনিক লিপি নাই।]

১৬ই কার্ত্তিক, ১২৯৩। সোমবার।

অদ্য অনেক দিনের একটি সাধ পূর্ণ হইল। কয় বৎসর ধরিয়া আমার রচিত পদ্য-মালা প্রভৃতি পুস্তকের মধ্যে ছবি দিতে ইচ্ছা-, নানা কারণে এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই। অদ্য পদ্যমালার ২য় ভাগের 'সন্তোষ-মধুকল্প' শীর্ষক পাঠের জন্য পাথুরিয়া[ঘাটা]বাসী প্রিয়নাথ দাস [প্রিয়গোপাল দাস ?] এনগ্রেভার কর্ত্তৃক একখানি ব্লক প্রস্তুত হইয়া আসিল। "ময়ূর" "যূঁইফুল" ও "আঙুর" এই তিনটি ছবির নিমিত্ত ও ব্লকের ফরমাইস দেওয়া গেল। পদ্যমালা ২য় ভাগের ৩য় মুদ্রাঙ্কন গ্রেট ইডেন প্রেসে চলিতেছে, সুতরাং ঐ প্লেটত্রয়ও শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আসিবে।

২৩ শে কার্ত্তিক, ১২৯৩। সোমবার।

এই কয়দিনের মধ্যে "ময়ূর" ও যূঁইফুলের ছবি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। আঙুরের ছবির আদর্শ নিমিত্ত অদ্য গুরুদাস চট্টো মহাশয়ের মেডিক্যাল লাইব্রেরি হইতে ১ম খণ্ড Illustrated Essop's Fable লইয়া এনগ্রেভারকে দিলাম।

অদ্য বড় দুঃখের সমাচার পাইলাম। সুপ্রসিদ্ধ সদ্বিদ্বান্ বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় গত শুক্রবার পরলোকগমন করিয়াছেন। যদিও তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন না, কিন্তু আমার সহিত তাঁহার সানুরাগ আলাপ পরিচয় ও কিছু আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমার কবিতা ও গানের বড় অনুরাগী ছিলেন। ৺মহারাজ কমলকৃষ্ণদেব বাহাদুর যখন শেষ বারের রোগে শয্যাগত, তখন একদা প্রসন্নবাবু দেখিতে যান; আমার কৃত লর্ড রিপন সম্বন্ধীয় বাউলের সুরে দীর্ঘ গানটি উক্ত মহারাজ উক্ত বাবুকে শুনাইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করাতে আমি তাহা শুনাই। প্রসন্নবাবু তাহা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আমার অন্য ২/৩টা গানও শ্রবণ করিলেন। তদবধি আমার প্রতি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ঘনিষ্ঠতা সানুরাগ আত্মীয়তা দেখাইতেন। আহা! কি মধুর ধাতুর নিরীহ অমায়িক ও নিরহঙ্কৃত লোক ছিলেন। যেমন সারবান্ বিদ্বান্, তেমনই সর্ব্বাংশে সজ্জন, স্বদেশের প্রতি সম্পূর্ণ স্নেহবান, অথচ চিৎকারকারী বা বাহ্যভড়ং প্রদর্শক ছিলেন না। ঈশ্বর তাঁহার প্রেতাত্মার যোগ্যধাম বিধান করুন।

অদ্য সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী ষ্টেট্‌সম্যান সংবাদপত্রে প্রকাশ নিমিত্ত M স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাঠাইলাম। তাহার বিষয় ও উদ্দেশ্য এই;—"ধর্ম্মবীর মহম্মদ" নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক (অতুলকৃষ্ণ মিত্র-লিখিত) বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। মুসলমানদের আপত্তি হেতু সেই দুইভাগ বিশিষ্ট পুস্তকের অবিক্রীত

তাবত খণ্ড গুরুদাস বাবু নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুরের নিকট ধ্বংসাভিপ্রায়ে প্রেরণ করেন। নবাব বাহাদুর তদ্বিষয় ইংরাজী সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতে কোনো কোনো বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদক ও ইংরাজী কাগজের কতিপয় পত্রপ্রেরক এতদুপলক্ষে তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া তুলেন। যৎ কালে গুরুদাস বাবু নবাবের বাড়ীতে যান, তখন আমার বন্ধুতম বেণীবাবুর (রুদ্র) সহিত আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম এবং মদাত্মীয় গুরুদাস বাবুর এতদ্বিষয়ক তাবদ্ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সুতরাং বিগত শনিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজ একজন পত্রপ্রেরক ঐ সাক্ষাত সম্বন্ধে কতকগুলি কাল্পনিক অযথা যাহা ছাপাইয়াছিল, সত্যের অনুরোধে তাহার প্রতিবাদ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় ঐ পত্র পাঠাইলাম।

২৪শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার।

কয়দিন পূর্ব্বে পদ্যমালা ২য় ভাগের ছবি হইল বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিয়াছি, অদ্য একটি খুঁতের জন্য বিষাদ পাইলাম। যুঁই ফুলের ছবি মনোমত হয় নাই—দেখিলে যুঁই গাছ বলিয়া চেনা ভার। এই বালক এনগ্রেভার "মধুকল্প"র যে রূপ প্লেট তৈয়ার করিয়াছিল, তাহাতে বড় আশা হইয়াছিল যে, অন্যান্য ব্লকও উত্তম করিবে। কিন্তু দেখিলাম, এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ছাত্রগণ স্বভাবের পাঠশালায় যাইয়া শিক্ষার পরিপক্বতা করা যে অত্যাবশ্যক তাহা অদ্যাপি বুঝে নাই। তজ্জন্যই ময়ূরের মাথার ঝুঁটি ও পায়ের ভঙ্গীও ঠিক করিতে পারে নাই। আঙ্গুরের প্লেটে যে কি করিয়া দাগ হইল চিন্তা হইতেছে এই যুঁই ফুলের ছবির অপকর্ষতা দেখিয়া ছাপি কি না, তৎপরামর্শার্থ ছাপাখানায় নিজে অদ্য গিয়াছিলাম। তাঁহাদের পরামর্শ মতে এবারকার এই তৃতীয় এডিসনে তো সেই মন্দ ছবিই দেওয়া হইল, ভবিষ্যতের নিমিত্ত ঐ প্লেটের পশ্চাদ্ভাগে যথোচিতরূপে আবার নূতন খোদানো যাইবেক।

আর এক বিষয়ে অদ্য দুঃখিত হইলাম—গতকল্য যে প্রেরিত পত্রখানি পাঠাইয়াছিলাম, তাহা ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে অদ্য প্রকাশিত হয় নাই। বোধ করি, authoritative করিতে (অর্থাৎ স্বীয় নাম ধাম স্বতন্ত্র পত্রে লিখিয়া দিতে) যে ভুলিয়াছি, তজ্জন্যই হয়তো প্রকাশ পায় নাই। দেখি কল্য প্রাতে ছাপা না দেখি তো তাহাই করিব।

আর এক বিষয়েও অদ্য মন বিমর্ষ—আমার পরম প্রিয় আবাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব রুদ্রের এবং আমার মাসতুতো ভগ্নী ৺মতীর মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ অন্নদাচরণ রুদ্রের দ্বিতীয়া কন্যাটির আমাশয় হইয়া কয়েকদিন হইল (তাহার মাতার সহিত) মধুপুর ষ্টেসন হইতে আসিয়া ক্রমে সেই রোগ জ্বরাতিসারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। অদ্য বেণীবাবু আমাকে ডাকাইয়া লইয়া দেখাইলেন। মেয়েটির বয়ঃক্রম একবৎসর ৩ মাস মাত্র। তাহার রোগের বৃদ্ধি ও অতিশয় দৌর্ব্বল্য দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। মেয়েটি পরমাসুন্দরী।' আলাহাবাদ হইতে সম্প্রতি আগত, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবু চিকিৎসা করিতেছেন।

এ কয়দিন আমার গীতাবলী গ্রন্থের নিমিত্ত প্রত্যহই একটি আগমনী গান বাঁধা হইতেছে। তৈল মর্দ্দনের সময় নয়তো নাতি নাতিনীরা ঘুমাইলে রাত্রি ৯টা ৯½টার পর গান বাঁধিবার সুযোগ পাই।

২৪ শে ও ২৫ কা. মঙ্গল ও বুধবার।

এ দুই দিন প্রায় সর্ব্বদাই বেণীবাবুর বাটীতে যাতায়াত করিতেছি। প্রাতে পদ্য-মালা ২য় ভাগের ও গীতাবলীর প্রুফ দেখা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় কাজ ব্যতীত আর কিছুই হইতেছে না। মেয়েটীর পীড়া ক্রমশঃই বাড়িতেছে, বোধ হয় ডাক্তার বাবু রোগের সমুদয় লক্ষণ উপদ্রবাদি আয়ত্ত এবং প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কিন্তু অনুমানে বলা যায়।

২৬শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার।

অদ্য ঐ রোগ আরো বাড়িয়াছে। ডাক্তার বাবুর সাহায্যার্থ আমার বাটীর সম্মুখস্থ সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথ শ্রীযুক্ত বিহারীলাল ভাদুড়ী ডাক্তার-মহাশয়কে অদ্য রাত্রে লইয়া যাওয়া হয়।

২৭শে কার্ত্তিক, শুক্রবার।

ঐ পীড়িতা মেয়ের অবস্থা অদ্য অতিশয় মন্দ। মধ্যাহ্নে ভয় হইয়াছিল, আজ টিঁকে কিনা। আমি প্রায় সমস্ত দিন (রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত) তথায় ছিলাম। মেয়ের মাতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু যাদবকৃষ্ণ ঘোষ পার্লামেন্টের পেন্সনভোগী অ্যাসিষ্ট্যান্ট সর্জ্জন। তাঁহাকে অদ্য প্রাতে আনাতে হোমিওপেথিক পরিত্যাগে তাঁহারই দ্বারা এলোপেথিক চিকিৎসা চলিতেছে।

২৮শে ও ২৯শে কার্ত্তিক, শনি ও রবি।

যাদববাবুর চিকিৎসাতে ক্রমশঃ উপকার দেখা যাইতেছে।

এনগ্রেভার প্রিয়নাথ দাস এদেশীয় বিশ্বকর্ম্মার অন্যান্য চেলার ন্যায় বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে জানে। আঙুরের ব্লক অদ্যাপি দিল না, এদিগে যে ফরমে তাহা বসাইতে হইবে, সেই পঞ্চম ফরম প্রস্তুত। অদ্য শনিবার প্রিয় ভৃত্য কুমেদকে উক্ত প্রিয়র বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু দেখা পায় নাই। এজন্য ছাপাখানার সুরেশ বাবুকে (যিনি ঐ বালক শিল্পীকে আমার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন) উহার নিকট লোক পাঠাইতে লিখিলাম।

অদ্য শনিবারের ষ্টেটস্‌ম্যান ইংরাজী কাগজে M স্বাক্ষরিত আমার প্রেরিত পত্রখানি ছাপিয়াছে কিন্তু লেজা মুড়া বাদ দিয়া ও একটী বিশেষ ভুল করিয়া ছাপিয়াছে। যাহা হউক, চতুর্দ্দিগে নানা কাগজে এই "ধর্ম্মবীর মহম্মদ" পুস্তক সম্বন্ধে যে সর্ব্ব জল্পিত কল্পিত মিথ্যা কথা প্রচার পাইতে ছিল, তন্মধ্যে কোনো কোনো অংশের যথার্থ কথা তাহা যে প্রকাশিত হইল, এই কর্ত্তব্য পালনে কতকটা সুপ্রসিদ্ধ হইতে পারিলাম ভাবিয়া সুখী হইলাম।

অদ্য রবিবারের অপরাহ্নে আঙুরের প্লেটখানি ছাপাখানায় পোঁছিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রুফ দেখিয়া সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। কথা ছিল, ব্লক-খানি লম্বায় ৩ এবং পরিসরে ২ বুরুল হইবে—সেই পরিমিত বুক কাষ্ঠের দাম পর্য্যন্ত লইয়া গিয়াছে এবং আঙুরের আদর্শ চিত্র গুরুদাস বাবুর নিকট হইতে তাহাকে যে একখানি পরিপাটি বিলাতি ছাপা বই (Illustrated Essop's Fable) দিয়াছি, তদনুসারে ঠিক ঠিক খোদাই করবার জন্য ঐ তিন বুরুলেরই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই বালক শিল্পী ভুলেও বাক্যানুযায়ী কার্য্য করা অভ্যাসের চালনা করিতে রত হয় না—কথা যাহা বলে এবং কাজে যাহা করে, তাহার প্রায় বহুলাংশই বে-ঠিক। তাহাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা পাইব, এরূপ বাসনা সফল হইবে কি না ঈশ্বর জানেন। যে ব্লক করিয়াছে তাহা ২ ইঞ্চ স্কোয়্যার; সুতরাং ব্লকের দুই পার্শ্বে বেশী ফাঁক থাকা ও উপর নীচে লম্বা আকার হওয়াটা ভাল দেখাইতেছে না। ভিতরের কাজ একপ্রকার মন্দ হয় নাই, কিন্তু একাংশে যাহা করিয়াছে তাহা ভাল হয় নাই।

৩০শে কার্ত্তিক, সোমবার।

আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ও পরমবন্ধু বাবু প্রসন্নকুমার বসু গত সপ্তাহে আসামে পোলীঘাটে ভড় কোং'র ব্যবসার মেনেজারি করিতে নিযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ অদ্য আমার বাসায় আসিয়া আহারান্তে তাহার দত্তপুকুরস্থ ডাক্তারখানার নিমিত্ত ঔষধ কিনিয়া সন্ধ্যায় ট্রেনে ফিরিয়া গেল।

যাদববাবুর চিকিৎসায় অন্নদার মেয়েটী অনেক ভাল। দন্তশূলে কষ্ট পাইতেছিলাম, অদ্য যাদব বাবু সেই দাঁতটী তুলিয়া দিলেন। দাঁত নড়িতেছিল, সহজেই উঠিল। এখন ৩টী দাঁত মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

১২৯৩ সাল। ১৮৮৬

১লা অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার। ১৬ই নবেম্বর।

আমার পত্রোত্তরে বাবু দ্বারকানাথ পাঠক মহাশয়ের পত্র অনেক দিন না পাওয়াতে উৎকণ্ঠিত ছিলাম, অদ্য পাইলাম ও উত্তর লিখিলাম।

অন্য কোনো প্রুফ আইসে নাই। "মনোমোহন গীতাবলী" পুস্তক মুদ্রাঙ্কনে বিস্তর বিলম্ব ঘটিতেছে। ১৬ই ভাদ্রে ইহার কপি ও ১৯শে ভাদ্রে ছাপার কাগজ গ্রেট ইডেন প্রেসে পাঠাই। আড়াই মাসে ১০ ফরম বৈ হইল না। এজন্য তাগিদ করিয়া অদ্য পত্র লিখিলাম।

৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার। ২১ নবেম্বর।

গত কয়েক দিবস প্রিয়তম বন্ধু বাবু বেণীমাধব রুদ্রের পৌত্রীর (অন্নদার ২য়া কন্যার) জ্বরাতিশয়ে পীড়ার চিকিৎসা লইয়া বড় গোলযোগে ছিলাম, একারণ এ পুস্তকে লিখিতে সময় পাই নাই। দুঃখের বিষয়, প্রত্যুষে সেই কন্যাটির মৃত্যু হইয়াছে। গত রাত্রেই সে ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা ছিল। এজন্য অধিক রাত্রে বাটী আসিয়া সেই

গাড়ীতেই ঐ কন্যার মাতার সান্ত্বনা ও সাহায্যার্থে আমার স্ত্রীকে তাহাদের বাটীতে পাঠাইয়া দিই। সমস্ত রাত্রি তথায় থাকিয়া প্রাতে বেলা ৮টার সময় আমার স্ত্রী বাটী ফিরিয়া আসিয়াছে।

"মনোমোহন গীতাবলী" নামক পুস্তকে নূতন গীতগুলি যে ছাপা হইতেছে, আজকাল্ তাহা লিখি নাতি নাতনীরা ঘুমাইলে—রাত্রি ৯টায় তো এ দিকে নয়। হয় এক আদ্‌টা নূতন গান রচনা, নয় পুরাতন গানের পরিবর্ত্তন সহযোগে—যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। পরে আবার উপকথা— আবার ঘুম পাড়ানো। এইরূপে রাত্রি ৯টা ৯½ টা অতীত হইলে গান বাঁধিতে বা পূর্ব্বে রচিতের আবৃত্তি করিতে সময় পাই। অবশ্যই অতি মৃদুস্বরে গুণ গুণ স্বরে সে কাজ হয়। তৎপরে ১০½ টার সময় বা পরের অবস্থায়। আহারের পর পূর্ব্বে কত লেখা পড়া করিতাম—কত রাত্রি জাগরণ করিতাম। এখন আঁচমনের পর ধুমপান মাত্র অপেক্ষা আর বসিতে পারি না—অমনি "পদ্মনাভ" স্মরণার্থ শয়ন।

৯ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

অদ্য আর কিছু লিখিবার নাই। গতরাত্রে সন্ধ্যাকালে গরম মুড়ি কিছু খাইয়াছিলাম, তাহাই উল্লেখযোগ্য। পেটটা কিছু গরম ছিল, শুনিয়াছি মুড়িতে অম্ল নিবারণ করে; আমার প্রিয় ভৃত্য কুমেদকে মুড়ি আনিতে বলিলাম ও তাহার কিছু খাইলাম এমন গুঁড়াইয়া, যে আস্ত গরম মুড়ি মাড়িতেই জব্দ হইতে পারে দন্তের দরকার নাই। একা নয়, দুই নাতিও ভাগ লইয়াছিল।

১১ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার।

এই দৈনিক লিপি লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমি ভাল কাজ করিয়াছি। এখন যেন আমার জীবনের দায়িত্ব বেশী হইয়াছে। ইহা আমার গুপ্ত লিপি, চাবির মধ্যে রক্ষা করিতেছি, অপরে কেহ দেখিতে পায় না বা পাইবার সম্ভাবনা অল্প, তথাপি এই লিখন ব্রত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সমস্ত দিন রাত্রি এম্নি একটি অস্পষ্ট সংস্কার মনের কোণ হইতে উঁকি মারিয়া বলে যে, "অমুক অমুক কর্ত্তব্যে বা সংকল্পে যে অবহেলা করিতেছ, লিখিবার সময় তজ্জন্য লজ্জা বোধ হইবে না?" ফলতঃ ঠিক যেন অন্তস্তল হইতে কে বলে যে, "জবাব দিবে কি বলিয়া ?" জবাব দেওয়া কাহার কাছে? অবশ্যই আপনার কাছে এবং আমি যাঁহার অধীন সেই অন্তর্য্যামী পরম পিতার কাছে। ইহা তো চির দিনই ছিল, তবে এখন কেন ভাবটী এত স্পষ্টতর বা প্রবল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে? তদুত্তরে এই দৈনিকলিপিই তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। আপনার কাছে আপন কর্ম্মের জবাবদিহির ন্যায় চরিত্র সংশোধনের ও পাপপথ পরিত্যাগের উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। এই জবাবদিহির ভয়ে হউক বা অন্যকারণ জনিত দৃঢ়তা বশতঃই হউক এই কয় দিন আমি প্রত্যুষে উঠিতেছি। ভরসা করি; ক্রমে আরো ভোরে উঠিতে পারিব।

গতকল্য অপরাহ্নে আমাকে একখান 'সফিনা' দিয়া যায়। তজ্জন্য অদ্য হাইকোর্টে

যাইতে বাধিত হইয়াছিলাম। মহারাজ ৺কমলকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় ৺শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবীর নামে কর্জ্জ টাকা বাবদ নালিস করিয়াছেন। সেই বন্ধকী দলিলে উক্ত শ্রীমতীর মোহর ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্বতন দেওয়ান—মদীয় স্বর্গগত খুল্লতাত ৺চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের সহি আছে। কুমার বাহাদুরেরা আমার সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে চান যে; উক্ত সহি আমার খুড়া মহাশয়ের কিনা এবং তিনি অন্নপূর্ণার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন কি না এবং তিনি কত বছর মৃত হইয়াছেন; ইত্যাদি অতি সামান্য [বিষয়] সংক্রান্ত সাক্ষ্য। যৎকালে কল্য সন্ধ্যার পূর্বে সফিনা দিয়া যায়, তখন আমি বিস্মিত হই যে আমি তো তাঁহাদের দেনা পাওনার কিছুই প্রায় জানি না, তবে আমাকে সফিনা কেন? অদ্য আদালতে মহারাজার ভাগিনেয় চন্দ্রকালী বাবুর মুখে ঐ সব বেওয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। মোকদ্দমা অদ্য হইল না। চন্দ্রকালীবাবু বলিলেন, যে দিন হইবে আমাকে সংবাদ পাঠাইবেন।

১৩ই অগ্রহায়ণ, রবিবার।

এঁড়েদহের সৌখিন সম্প্রদায়ের গীতাভিনয় নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল আমার হরিশ্চন্দ্র নাটক সংক্রান্ত কতকগুলি গান বাঁধিয়া দিয়াছিলাম। এখন "মনোমোহন-গীতাবলী" পুস্তকের মধ্যে সেগুলির সন্নিবেশ আবশ্যকীয় বিবেচনা হইল। সে গানগুলির মুসাবিদা আমার নিকট ছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইতেছি না। একারণ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্যোগী এঁড়েদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে অদ্য একটি পোষ্ট কার্ড যোগে গান পাঠাইবার প্রার্থনা [করি]।

আমি অপরাহ্নে আমার কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথের অধ্যক্ষতাধীন ব্যায়াম প্রদর্শন ব্যাপার দেখিতে গিয়াছিলাম। কোন স্থানে যাইতে একালে আমার যেরূপ "বাধ" বোধ হয় তাহাতে আমি যে নিজে উদ্যোগী ও উৎসাহী হইয়া গিয়াছি তাহা নয়। বন্ধু বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় আমার উক্ত পুত্র কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে অনুরোধ করেন। আমি বলি, "যদি আপনি যা'ন আমিও যাব।" এইরূপে তাঁহার উৎসাহে তাঁহার সঙ্গে যাওয়া ঘটে। সেই সর্মভিব্যাহারে তাঁহার পুত্র ও কনিষ্ঠ মেয়েটীও যায় এবং আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধ ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় ও বিজয়ের দুই পুত্র ও অক্ষয়ের পুত্রও যায়। ব্যায়াম-ক্রীড়া তেমন ভাল হয় নাই। শুনিলাম প্রধান ক্রীড়ক চারিজন না আসাতে তাঁহাদের এত উদ্যোগ প্রায় অসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তবু যাহা কিছু দেখাইয়াছে, মন্দ হয় নাই।

১৪ই অগ্রহায়ণ, সোমবার।

ভবানীপুরের সখের দলে "যদু-বংশ ধ্বংস" পালায় [গানগুলি] মাত্র আমি রচনা করিয়াছিলাম, তাহার জন্য সেই দলের কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে আমি তাঁহার আফিসে (কাম্প্রেলার জেনারেল) অক্ষয়ের দ্বারা পত্র পাঠাইলাম।

১৭ই অগ্রহায়ণ ১২৯৩।
২রা ডিসেম্বর ১৮৮৬; বৃহস্পতিবার।

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, আমার দীর্ঘসূত্রিতার আর এক মন্দ ফল অদ্য কর্ণগোচর হইল। আমাদের গ্রামবাসী বাবু দীননাথ বসু B. Sc. (ছোটজাগুলীয়া হিতার্থী সভার সহকারী সম্পাদক) অদ্য প্রাতে আসিয়া বলিলেন যে, "বারাসাতস্থ ব্রাঞ্চ রোডশেস কমিটিতে আপনি যে টাকা আমাদের গ্রাম সন্নিহিত বড় রাস্তার মেরামত উদ্দেশে পাস্ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে না আনাতে ল্যাপ্স অর্থাৎ নিয়মিত মেয়াদ গত হওয়াতে রোডসেশ্ ফান্ডে পুনঃ গ্রাসিত হইয়াছে।" এই অপ্রার্থনীয় ঘটনাটি সুধু আমার নিজের দীর্ঘসূত্রিতা দোষে ঘটিয়াছে। "যাই যাই" করিয়া বহুকাল গেল। সুতরাং এখন সেই ৮০ টাকা আবার বাহির করা বিশেষ কৃচ্ছ্র সাধ্য হইয়া উঠিল। যদ্যপি নিজে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইয়া কহিয়া পুনর্ব্বার কিছু হয় তো বড় ভাগ্যের কথা।

শুনিলাম, বারাসাতের ব্রাঞ্চ কমিটি বা তাহার সভাপতিরও হাত নাই। ২৪ পরগণার রোড্ [সেশ] কমিটির অনুগ্রহের উপর এখন নির্ভর। তৎ[পরে] বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আমাকে একটু ভালবাসেন। দেখি অদ্য বা কল্য যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া কিছু করিতে পারি। কিন্তু ঐ যে "অদ্য বা কল্য" উহাই সর্ব্বনেশে কথা! মনের কান তো মলিয়া দিলাম, দেখি কি হয়!

আড়িয়াদহ হইতে শশীবাবু হরিশ্চন্দ্র গীতাভিনয়ের (আমার রচিত) গীতগুলি গতকল্য পাঠাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষ এতশীঘ্র প্রেরণের জন্য মনে মনে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলাম। পত্রদ্বারা সে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত, কিন্তু তা ঘটিয়া উঠা ভার!

সন ১২৯৩ সাল। খৃঃ ১৮৮৬।
১৮ই অগ্রহায়ণ হইতে ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত।

নানা কারণে এই তিন সপ্তাহ কাল দৈনিক লিপিকরণে সমর্থ হই নাই—"মনোমোহন গীতাবলী"র কপি লেখা ও পুরুফ দেখা ও জাগুলীয়া যাওয়া ইত্যাদিই সেই সময়াভাবের প্রধান হেতু। তবে কোনো কোনো দিন বিশেষ চেষ্টা করিলে কিছু সময় পাইতে পারিতাম বটে—আলস্য ও নাতি নাতিনীদের সহিত ক্রীড়া বশতঃ তাহাও ঘটে নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে যে যে প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার যতটা এখন উপস্থিত মতে স্মরণে আইসে তাহাই নিম্নে লিপিবন্ধ করিতেছি।

বাবু কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস (জাগুলীয়ার) কুঠি হইতে প্রত্যাগমন কালে গাড়ি থামাইয়া বলিয়া যান, "পরশ্ব সন্ধ্যার পর একবার আমার বাটী যাইবে।" তদনুসারে গিয়াছিলাম। তাঁহার তৃতীয় পুত্র সুরেশচন্দ্র বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে এককালে ঘরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহারই পরামর্শ নিমিত্ত এই নিভৃত সাক্ষাতের প্রয়োজন। বহুকাল হইতে আমার দৃঢ় সংস্কার

জন্মিয়াছে, যে বিলাত প্রত্যাগত কৃতবিদ্য যুবকগণকে সমাজে গ্রহণ করা অতি কর্তব্য। তজ্জন্য প্রাচীন মতাবলম্বিগণকে আপনাদের আঁটাআঁটি মতের মধ্যে বিশেষ একটু শৈথিল্য ঘটাইতে হইবে এবং বিলাত ফেরতেরা নিতান্ত সাহেব না সাজিয়া যাহাতে আমাদের সমাজ-সঙ্গত তাহার ব্যবহার চাল্ চুল্ ধরণ ধারণ বেশভূষার (কালের পক্ষে যতটা সম্ভব) অতিরিক্ত পথে বেশী গমন না করে, তাহাও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কালীবাবুর উক্ত প্রস্তাবে আমি সর্বান্তকরণে অকুতোভয়ে তাঁহার পুত্রকে এক-কালে গৃহে গ্রহণের পরামর্শ দিলাম। ইহাতে তাঁহার বিশেষ বিপদের যে সম্ভাবনা, এমত তো বোধ হয় না। যেহেতু এ সকল বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের পূর্ব্বকার ভয়ংকর কুসংস্কার অনেক নিস্তেজ হইয়া শিথিল ভাব ধারণ করিয়াছে—এখন আর তত হৈ চৈ ঘটিবে না—বিশেষ সংস্কৃত মতাবলম্বীদের পূর্বে যাহারা পরিবার মধ্যে নিম্নপদে ছিল, এখন বয়োধিক্য প্রযুক্ত ও তাহাদের গুরুজনেরা স্বর্গগত হওয়াতে অধুনা তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বহুপৃষ্ঠবল প্রাপ্তির সম্ভাবনা এখন যদিও কেহ কেহ বক্রী হন, তবে আমরা সকলে পড়িয়া বলিয়া কহিয়া মিটাইয়া দিতে পারিব, এমন প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়। এবং স্থল বিশেষে আর্থিক পূজাও খানদান দ্বারাও প্রতিবাদিত্ব পঞ্চত্ব পাইতে পারে। কালীবাবু যখন সে ব্যয়ে কুণ্ঠিত নয়, তখন বিশেষ চিন্তাই বা কি?

জাগুলীয়ার উত্তরপাড়ার ৺রমানাথ বসুর আদ্যকৃত্যে অধ্যাপকাদি বিদায় উপলক্ষে সেদিন যখন বাটী গিয়াছিলাম, তখন গ্রামের কোন কোন ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে এ প্রসঙ্গ তুলিয়া "বেড়া নেড়ে গৃহস্থের ভাব দেখার" ন্যায় গতিক বুঝিয়া দেখিয়াছি। যাহা দেখিলাম, তাহাতে নিরাশ হওয়া দূরে থাকুক, স্বয়ং সম্পূর্ণ আশাই পাওয়া যায়। উক্ত আদ্যকৃত্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে [দেওয়ায়] সুখী হইয়া আসিয়াছি। তবে নিয়ম ভঙ্গের পূর্ব্ব দিনের (গত শনিবারের) বৈকালে চলিয়া আসাতে সেই দিন বাজে লোকের জলপান ও পরদিনের ভোজ কিরূপ হইল, দেখা হয় নাই—ভরসা করি (এবং শুনিতেছি) উত্তম হইয়াছে।

বারাসাত মহকুমায় যে লোক্যাল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে, তাহার জনৈক মেম্বার (৺ষষ্ঠীচরণ দত্ত) মৃত হওয়াতে তাঁহার স্থলে বারাসাত থানার অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক নূতন একজন মনোনীত হইবেন। পূর্বে যখন প্রথম মনোনয়ন হইয়াছিল, তখন বাটীতে বিনয়ের বিবাহ ও আপনার আঙুলে ঘা জন্য নির্বাচন দিনে উপস্থিত হইতে না পারাতে (সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সত্ত্বেও) আমি মনোনীত হইতে পারি নাই। এক্ষণে আমি কিম্বা আমাদের গ্রামের অপর কেহ যাহাতে মেম্বার পদে মনোনীত হয়েন, ইহার চেষ্টা পাওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। এই কথাটী জাগুলীয়ায় ঐ সময় প্রিয়তম বন্ধু বাবু রাজমোহন দত্তের সাক্ষাতে উত্থাপন করাতে তাঁহার সহিত পরামর্শমতে গ্রামের কলেক্টিং মেম্বার বাবু কৈলাসচন্দ্র বসুকে ডাকাইয়া আগামী শনিবার ২৫শে ডিসেম্বর

তারিখে বেলা ৩টার সময় স্কুলবাটীতে জাগুলীয়া ও তৎ চতুষ্পার্শ্বস্থ তাবৎ গ্রামের প্রধান প্রধান লোকের [যখন] একটী সভা হয়; তাহার ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া একখানি সার্কুলার পত্রের মুসাবিদা লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিয়া আসিয়াছি। তিনি চৌকীদারদের দ্বারা তাহা সর্বত্র পাঠাইয়া সভার আয়োজন করিবেন। আমিও সভার দিবসে জাগুলীয়ায় যাইব; এমন স্বীকার করিয়া আসিয়াছি।

বাটী যাওয়াতে তত্রত্য বড় বাক্সের মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বরচিত গান ও ছড়া পাইয়াছি —"মনোমোহন গীতাবলী"র উপকরণ বৃদ্ধি পাইল। ভবানীপুরের নিমিত্ত "যদুবংশ-ধ্বংস" যাত্রার যে সব গান পূর্ব্বে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম, ঐ কয়েক দিনের মধ্যে তত্তাবৎ বহু কষ্টে আনাইতে পারিয়াছি। এই সকল ও আমাদের পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাঁচালির ছড়া ও গানাদি লইয়াই এই কয়দিন মহাব্যস্ত ছিলাম—এখনও আছি।

পদ্যমালা ১ম ভাগের ১৫শ মুদ্রাঙ্কন হইতেছে। বড় ইচ্ছা ছিল, এই এডিসনে ইহাতে (২য় ভাগের ন্যায়) কতকগুলি ছবি দিব। কিন্তু আমার ন্যায় এনগ্রেভার বালকটীও মহা দীর্ঘসূত্রী—বাড়ার ভাগ মিথ্যাবাদী, সেই জন্যই এবার হইয়া উঠিল না।

৯ই হইতে ১৬ই পৌষ ১২৯৩।
বৃহস্পতি হইতে বৃহস্পতিবার

এ সপ্তাহও "মনোমোহন গীতাবলী"র কপি লেখা, প্রুফ দেখা ও জাগুলীয়ায় যাওয়া ইত্যাদি কাজে মহাব্যস্ত ছিলাম।

বিগত শনিবার ১১ই পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর দিবসে জাগুলীয়ার বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ভূমিতে করদাতাগণের এক প্রকাশ্য সভা হয়। ঐ নিমিত্তই তৎপূর্ব্ব দিনের অপরাহ্নে বাটী গিয়াছিলাম। শনিবার অপরাহ্ন ৪টার পর সভা বৈসে। জাগুলীয়া ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর কয়েক গ্রামের প্রধান প্রধান মুসলমানগণ আগমন করিয়াছিলেন। আমাকেই প্রধান আসন প্রদান করা হয়। পঞ্চায়েতের কলেক্টিং মেম্বার বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু সভা আহ্বানের নিমন্ত্রণপত্র পাঠ করিলে আমি খুব সহজ ভাষায় আত্মশাসন বিষয়টা কি, লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা দেশের কি কি কার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহার সভ্য মনোনীত করণে করদাতামাত্রকেই বিশেষ যত্ন দেখানো কেন কর্ত্তব্য, আমাদের গ্রামের একজন না হইয়া অন্য অঞ্চলের লোক বারাসাতে মনোনীত হইয়া গেলে আমাদের জন্য উপরওয়ালার নিকট হইতে প্রত্যাশা নাই—বহু বৎসরের অসুবিধার প্রতি তৎসমর্থন ইত্যাদি অনেক প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া যাহাতে এবিষয়ে সাধারণের শিক্ষা ও উৎসাহ জন্মে তদুদ্দেশে দীর্ঘ বক্তৃতা করিলাম। পরে সর্ব্ববাদী সম্মতিতে আমাকেই মেম্বর রূপে মনোনীত করণ বিষয়ে ধার্য্য হইল। এক ব্যক্তি কেবল বলিয়াছিলেন "হয় মনোমোহন বাবু অথবা দীননাথ বসু B. A. মেম্বর হউন।" কিন্তু সেরূপ কথা প্রস্তাব পদে গণ্য হইতে পারে না, বিশেষতঃ সে কথায় কেহ পোষকতা

না করাতে এবং দীননাথ বাবু নিজের বোর্ডে উপস্থিতি বিষয়ে সময়াভাব বুঝাইয়া দেওয়াতে উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে আর কোনো কথা কহেন নাই।

ফলতঃ আমার পক্ষে উক্ত দীননাথ বাবু বা অপর কোনো সুযোগ্য লোক মনোনীত হইলে যেন বাঁচিয়া যাইতাম। কারণ একে আমি কোনো স্থানে যাতায়াত বিষয়ে দারুণ কুঁড়ে, তাহাতে এ বয়সে পূর্বের ন্যায় এসব বিষয়ে উৎসাহশীল হওয়া অসম্ভব, সুতরাং গ্রামের লোক যে কেহ হউন; হইলেই সন্তুষ্ট হইতাম। কিন্তু যখন দেশস্থ সকলের ইচ্ছা আমিই মেম্বর পদার্থী হই, তখন এবিষয়ে অবশ্যই আমাকে সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইতে হইবে।

কিন্তু ঐ সভাস্থলে (পূর্বাহ্নের) শুনা গেল, গ্রামের মধ্যে ভোটারের উপযুক্ত বহু বহু লোকের নাম বারাসাতে রেজিষ্ট্রি হয় নাই। কলেক্টিং মেম্বর আইনের মর্ম না বুঝিয়া কেবল বাড়ীর কর্তাদের নাম মাত্র পাঠাইয়াছেন—যে কেহ হউক, বার্ষিক ২৪০ টাকা বা অতিরিক্ত আয় থাকিলেই সে ভোটার হইতে পারে, এ নিয়মানুসারে নাম পাঠান নাই। পরে দীননাথ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন প্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবিধানার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক দরখাস্ত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই দরখাস্ত লিখিত শতাধিক নাম কলেক্টিং মেম্বরের নিকট পাঠাইয়া ইহারা সত্য ভোটারের উপযুক্ত কি না জানিতে চান এবং যদি তাহা হয়, তবে তাহাদের নাম পাঠান নাই কেন, তাহারও কৈফিয়ৎ তলপ্ করেন। কলেক্টিং মেম্বর ভাবিলেন, এই দরখাস্ত দ্বারা তাঁহাকে অপদস্থ করা অভিপ্রায়। সুতরাং কৈফিয়তে লিখিলেন, "আমার মতে ইহাদের যে আয় তাহাতে তাহারা ভোটার হইতে পারে না।" ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ রিপোর্ট পাইয়া সমুদয় নথি [পাঠ] করিলেন—আর কিছুই হইল না! ঠিক এদেশে যে প্রণালীতে মকদ্দমা বানান হয় একাজেও সেই পথ অবলম্বিত হইল! ইহার অপেক্ষা ভয়ানক দুঃখের বিষয় আর একটা গণ্ডগ্রামের কলেক্টিং মেম্বরের সত্যের অপহ্নবে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হইল [না।]

প্রথমেই কি একথা ভালরূপ জানা গেল; আমার অনেক চেষ্টা ও অনেক বুঝানোর পর এসব কথা বাহির হইল। তখন বিষম বিপদে পড়িলাম। যদি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সত্য বুঝাইয়া প্রতিকারের পন্থা করা যায়, তাহা হইলে গ্রামের নিন্দা; অর্থাৎ হাকিমের দৃষ্টিতে কলেক্টিং মেম্বর মাত্রই গ্রামের মাথা মানুষ, সুতরাং যে গ্রামের মাথা (অন্ততঃ নাক, চক, বা কানও ত হইবে) এমন মিথ্যাপ্রিয়, সে গ্রাম যে কত ভদ্র তাহা বুঝিতেই পারেন। রফায় অনেক চেষ্টা পাইলাম অর্থাৎ ঐ কলেক্টিং মেম্বর দ্বারাই দ্বিতীয় রিপোর্ট মধ্যে—"পূর্বে ভুল হইয়াছে, এখন দশজনের সভায় বসিয়া আলোচনান্তে বুঝিলাম সত্য সত্যই অনেকে যোগ ইত্যাদি" কথা লিখিয়া পাঠাইবার প্রস্তাব করিলাম। তাহাতেও বলিলেন "পঞ্চায়েতের মিটিং না করিলে এখন কিছু বলিতে পারি না।" তখন অগত্যা সভায় সভাপতি (আমি) দ্বারা ঐরূপ ভাবের দরখাস্ত লিখিয়া পাঠান ধার্য্য হইল। তাহাতে যাহাতে কলেক্টিং মেম্বারের ভ্রম ব্যতীত অন্য দোষ না দর্শিতে পারে,

এরূপ ভাবেই লেখা হইয়াছে। সে দরখাস্ত কলিকাতা আসিয়া গতকল্য ডাকে প্রেরিত হইয়াছে এবং ভোটারদের অপর একটি দরখাস্ত সর্ব্বত্র স্বাক্ষর করান যাইতেছে। তাহাতে তাঁহাদের নাম রেজিষ্টারি হয়. এইরূপ দাবিও প্রার্থনা আছে।

১৪ই মাঘ ১২৯৪ সাল। শুক্রবার ২৬শে জানুয়ারি।

অদ্য দুই প্রহরের ট্রেনে কাশী যাত্রা করি। হাবড়া ষ্টেশনে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধ ও কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথ সঙ্গে আসিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া যায়। আমার সহযাত্রী আমার স্ত্রী, আমার পৌত্র শ্রীমান বরেন্দ্র-কৃষ্ণ, আমার পিসু[তুতো] ভগ্নীর জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ এবং ঐ বধূমাতার ঝি একজন এবং প্রিয় ভৃত্য কুমেদাচরণ ধাওয়া। আমাদের বিছানা ১টা বড় মোট ও একটা বিলাতী তোরঙ্গ ব্রেকভ্যানে মাল হিসাবে যায়, অবশিষ্ট ২টা তোরঙ্গ ও বস্ত্রাদি আমাদের সমভিব্যাহারে গাড়ির মধ্যে যায়। বর্দ্ধমানে আসিয়া আহার্য্য কিছু সংগ্রহ করি। ট্রেনের পথে যাহা যাহা দেখাইবার উপযুক্ত তত্তাবৎ স্ত্রীগণকে দেখাইয়া তত্তাবতের বিবরণাদি যাহা তাঁহারা বুঝিতে পারে তাহা বলিয়া বুঝাইয়া পরমামোদে গমন হইল। অপর বিষয় ঐতিহাসিক অনেক কথা তাঁহারা বুঝিবেন [না] বলিয়া তদালোচনা করিতে পারি নাই—হায়! আমাদের সহযাত্রী সঙ্গিনী ভদ্রমহিলাগণ যে কবে পারদর্শিতা দেখাইয়া সঙ্গী পুরুষের সহস্রগুণে অধিকতর আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন! পথে যাহা যাহা দেখিলাম ও যে যে বিষয়ে কথোপকথন করিলাম, তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত, চর্বিত ও আলোচিত হইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ সুধীপ্রবর বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মহাশয় তাঁহার ভ্রমণ পুস্তকে যে সব উৎকৃষ্ট বর্ণনা ইংরাজিতে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য তাবৎ বিষয়ই প্রায় সুন্দর চিত্রিত আছে; সুতরাং সে পক্ষে অধিক প্রয়াস পাওয়া তত আবশ্যক নয়। তবে সে সব সম্বন্ধে আমার নিজের চিত্তভাব যখন যেমন হইবে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইব।

গাড়িতে পরম সুখেই আসিতেছিলাম, কেবল দুইটী কারণে যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই কিছু অসুবিধা ও কষ্ট পাইতেলাগিলাম। তাহার প্রথম কারণ শীতাধিক্য। পূর্বে কয়দিন বাদলা হওয়াতে শীত বেশী পড়িয়াছে, বিশেষ যতই উপর অঞ্চলে গাড়ী আসিতে ও রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই বঙ্গদেশাপেক্ষা অধিকতর শীতানুভব হইতে লাগিল, আমাদের গাত্রে উত্তম শীতবস্ত্র ছিল, তথাপি হাড়ে হাড়ে কাঁপাইতে লাগিল। আমি তবু ঘন ঘন তামাকু সেবনে কথঞ্চিৎ গরম হইতেছিলাম, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তাহাও অভাব! দ্বিতীয় কারণ নিদ্রার অভাব। বালক পৌত্রটী ও বালিকা বধূমাতাকে গাড়ির খোলে শয্যা পাড়িয়া শোয়াইয়া রাখাতে তাহারা উত্তমরূপে সমস্ত রাত্রি ঘুমাইল; বেঞ্চের উপর অপর দুজন স্ত্রীলোকও একপ্রকার নিদ্রাভোগ করিলেন। কিন্তু আমার আর কুমেদের মূলেই ঘুমাইবার জো ছিল না, কেননা প্রতি ষ্টেসনে লোকের এত ভিড় এবং আমাদের গাড়িতে [উঠিবার] জন্য পুনঃ পুনঃ এত আক্রমণ যে তন্নিবারণ

উদ্দেশ্যে দ্বাররক্ষায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল। নিষ্প্রয়োজন অর্থব্যয় না ঘটে, এই অভিপ্রায়েই তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আসি, সুতরাং সে শ্রেণীর গাড়িতে বেশী লোক হইবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পরদিন গ্রহণ, প্রায় সকল লোকই, গ্রহণের দিন কাশীধাম স্নানদানোৎসুক হইয়া ঐ রাত্রে দলে দলে সকল ষ্টেসনে আইসে। রেল-কর্ত্তাদের বেশী গাড়ি দেওয়া উচিত ছিল। ষ্টেসনমাষ্টারেরা একবার আসিয়া কোন বন্দবস্তই করিল না, সুতরাং বলপূর্বক যে যে গাড়িতে পারিল উঠিল। কোনো কোনো গাড়িতে ১৪।১৫।১৬ জনেরও অধিক লোক হইল, অথচ ১০ জনের বেশী লওয়া নিয়ম নয়। হায়, তৃতীয় শ্রেণীর এ যন্ত্রণার কথা সংবাদপত্রে ও দরখাস্তে ও গবর্নমেন্টের আদেশ লিপিতে সর্বদা বিবৃত হইলেও রেলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভ্রূক্ষেপও করেন না। যদিও আমার বেশভূষা উত্তম থাকাতে গাড়ীর দ্বারে আমাকে দেখিয়া লোকজন চলিয়া গেল, এবং তাহাতে আমার গাড়ী নিরাপদ রহিল, কিন্তু অন্যান্য গাড়ীর দুর্দশা ও অসহনীয় ক্লেশ দর্শনে বড়ই কষ্ট হইল। তবু ভাল শীতকাল, এ যদি গ্রীষ্মঋতু হইত, তবে কি ভয়ানক অস্বাস্থ্যকর [অবস্থা] ঘটিত, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়।

১৫ই মাঘ ১২৯৪ সাল। শনিবার ২৭ জানুয়ারি ১৮৮৮।

অদ্য কোথায় ১১টা ৫৩ মিনিটে (মাদ্রাজী ১১টা ২০ মিনিটে) মগুল সরাইতে পেঁাছিব, না একেবারে কাশীতে ১টা ১½টার সময় পেঁাছিয়া স্নানাহার করিব, ঐ কারণ [অর্থাৎ] রেলের গাড়ি দেরিতে আসাতে তাহার ব্যাঘাত ঘটিল। মগুল সরাইতে নামিয়া শুনিলাম এক ঘণ্টা তথায় অপেক্ষা হইবে। অতএব স্নান ও জলযোগ অনায়াসে হইতে পারিত, কিন্তু লোকের এত ভীড় যে তাহাও সম্পূর্ণরূপে ঘটিয়া উঠিল না। গাড়ী থামিবা মাত্র লটবহরগুলা মুটেরা ষ্টেশনের কম্পাউন্ডের এমন এক স্থানে রাখিল যে, যদিও স্থানটী নিরাপদ পরিষ্কার ও মনোরম, তথাপি যাত্রীদলে তিন দিক এরূপে বেষ্টন করিয়া রহিল যে আমরা আর পার্শ্বপরিবর্ত্তনেরও স্থান বা সুবিধা পাইলাম না। ওদিগে ষ্টেশনের ভিতরকার ফটক দুইটী বন্ধ করিয়া তথায় পাহারা বসিল; মুটেদের আর পাওয়া গেল না, সুতরাং বাজারে যাইতে পারিলাম না, অকষ্ট-বন্ধনে পড়িয়া সেই এক স্থানেই বন্ধ থাকিলাম—তবে এক একজন করিয়া যাহার যা কিছু দরকার সারিয়া আসিল। সোচে যাওয়া তো কাহারই হইল না, স্নানেরও সুবিধা ঘটিল না। কুমেদ বাজারে গিয়া জলখাবার কিনিয়া আনিল, তাহাই (আমার স্ত্রী ভিন্ন—তাহার সমস্ত দিন উপবাসেই কাটিল) সকলে জলযোগ করিয়া লওয়া গেল। ক্রমে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, যাত্রী-লোক সকল বিশেষতঃ হিন্দুস্থানীরা অধীর হইয়া উঠিল, এককালে শত শত লোক সদস্যভাবে ভিতরের ফটক আক্রমণার্থ দৌড়িল, আমরা ফটকের নিকটে থাকাতে চাপনের

ভয়ে ভীত অবস্থায় বহুক্ষণ যাপনের পর এবং ষ্টেশনের একবাবুকে বিস্তর বুঝাইবার পর অন্যপথ দিয়া যাত্রিগণকে কাশী-গামী গাড়ীর দিকে যাইতে দিল, যে পথ খুব বড় বড় গাছ বিশিষ্ট ময়দানের মতন, সুতরাং ভীড় হইলেও হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি বড় হইল না, তথাপি মুটের জন্য অপেক্ষা করিয়া আমরা প্রায় সর্ব্বপশ্চাতে গেলাম। এরূপ স্থলে মুটেরা জামাইবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে, অনেক পয়সা লয়, যাত্রীদের তখন গত্যন্তর নাই, অন্য মুটেরা ষ্টেসনে প্রবেশ করিতে পায় না। এ সকল বিষয়ে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষের তাচ্ছিল্য নিতান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণতুল্য দোষাবহ। কিন্তু গরিব নেটিভ দল আর পশুদল তাঁহাদের চক্ষে সমান। পশুগণের প্রতি তাঁহারা এতদপেক্ষা সদয়। ফলতঃ যে তৃতীয় শ্রেণীর পয়সা হইতেই এত লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ, সেই নিম্নস্তরের প্রতি শতাধিক অত্যাচার ও তাহাদের অসীম কষ্ট নিবারণ পক্ষে কর্ত্তারা শিথিলযত্ন হইয়া বহুকাল হইতেই মহাপাপ করিতেছেন! বিশ্বনিয়ন্তার অলংঘ্য নিয়মানুসারে কেহই কোনো নৈতিক অপরাধ করিয়া নিস্তার পাইতে পারেন না, অতএব শীঘ্র বা বিলম্বে হউক এই ত্রুটীর সমুচিত ফলভোগ করিতেই হইবে। পাপের দণ্ড কখন কিরূপ ঘটে, তাহা বুঝা মানববুদ্ধির সাধ্য কি? এই মহাপাপেরও দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত যে কি হইবে, তাহা এখন কিরূপে বলিব।

ঐ দিনের অত্যাচার বর্ণনার এখনও পরিসমাপ্তি হয় নাই। আমরা ঐ রূপে তো গাড়ীর কাছে গেলাম, গিয়া দেখি গাড়ীতে উঠা, বিশেষ স্ত্রীলোকের পক্ষে, বড়ই দুষ্কর। অর্থাৎ প্লাটফর্ম নাই, এতদিন হইল ঐ রেল চলিতেছে, তথাপি প্লাটফর্মের নামগন্ধ বা কোনো উদ্যোগ দেখিলাম না—ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের প্লাটফরম অতি নিকটে, না হয় যতদিন আউড রোহিল খণ্ডের প্লাটফর্ম তৈয়ার হইতেছে, ততদিন সেই প্লাটফরম ব্যবহারের ব্যবস্থা হউক, তাহাও নয়। গাড়ীগুলি খুব বড় বড়, পরিসরও উচ্চ, তাহাতে উঠিতে গেলে পাহাড়ে উঠিতে হয়। আবার যে গাড়ীতে যাই, সেই গাড়ীই পূর্ণ। মুটিয়ারা পয়সা চাহিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত, অগত্যা এমন অবস্থাতেই সম্মত, এমন সময়ে ষ্টেশন বাবুকে পাইয়া স্থান চাওয়াতে তিনি দয়া করিয়া (তাঁহার কর্ত্তব্যকাজ, তবু যেন দয়া বোধ হইল) অনেক কষ্টে একখানি শকটে আমাদের ও আমাদের তোরঙ্গ প্রভৃতির স্থান করিয়া দিলেন। গাড়ীখানির মধ্যে ছয় কামরা বা থাক, কিন্তু মধ্যে মধ্যে থাক ছিল না, সামান্য ঠেসানের ব্যবধান থাকাতে সমস্ত গাড়ীখানি যেন একটী বড় গৃহের ন্যায়, তাহাতে ৬০ জন লোক ধরে, সে দিন বেশী লোক ছিল। যাহা হউক, আমরা যে কামরায় বা বিভাগে উঠিলাম, তাহা মধ্যস্থলে, তাহাতে যে কয়জন হিন্দুস্থানী স্ত্রীপুরুষ ছিলেন, তাঁহারা প্রাচীন ও অতি ভদ্র বংশীয়, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে পরম সুখেই আলাপাদি চলিতে লাগিল—উভয় পার্শ্বের বিভাগেও সেইরূপ ভদ্র হিন্দুস্থানী সকল ছিলেন। গাড়ীগুলিও ইষ্ট ইণ্ডিয়াদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে ভাল ও পরিসর। সুতরাং সুখ সুবিধা সকলই ঘটিল। মনে করিলাম, অতঃপর কয় মিনিটের

মধ্যেই সুখে কাশী পৌঁছিব। কিন্তু রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের অমার্জ্জনীয় অপরাধে সেই সুখ দুঃখে পরিণত হইল। ঐ যে যাত্রিগণকে গাড়ীতে উঠাইয়া চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, আর জনপ্রাণীরও দেখা নাই—ঠিক যেন উপকথার রাক্ষসী-ভক্ষিত পুরীর মতন স্থানটা এককালে জনশূন্য হইয়া উঠিল। অনতিদূরস্থ রেল সকলের উপর ফোঁস ফোঁস শব্দে (২/৩ খান আরোহী শকট যুক্ত) এঞ্জিন কয়খান বারবার যাতায়াত করিতেছে দেখিতে পাইলাম এবং কিছু দূরে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের বাসস্থানের বারিকের মত ঘরে একজন সাহেব ও দুই তিন জন চাকর বাকর মাত্র যাহা দেখা যাইতে লাগিল, নচেৎ এককালে জনশূন্য! এইভাবে যখন এক ঘণ্টা গত হইল, তখন ঐরূপে কারাবদ্ধ শত শত যাত্রী অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল, কেবল বিরক্তি ও গাড়ী থামাইয়া রাখায় চিৎকার সর্ব্দা শ্রুত হইতে লাগিল। চাবি-বন্ধ এবং অনেক উঁচু হইতে নামিতে হয়, সুতরাং দৌড়াইয়া গিয়া কাণ্ডখানা কি, তাহা যে দেখিয়া আসিব, তাহাও ঘটিল না। স্নানাহার অভাবে ও গত রজনীর জাগরণে দেহ বড়ই জ্বালাতন, তদুপরি এই অভাবনীয় যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। কিন্তু ধৈর্য্য বৈ উপায় কি? ক্রমে প্রায় দুই ঘণ্টা এই অসহনীয় অবস্থায় অতিবাহনের পর একজন ইউরোপীয় গার্ড দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি জ্বলিয়া উঠিয়া ইংরাজীতে ভৎর্সনা ও অভিযোগ করিলাম। প্রথমে সে ব্যক্তি একটু ঠাট্টার সুরে উত্তর দিল, পরে যখন কড়া কড়া অথবা মিঠা-কড়া গোটাকতক শুনাইয়া দিলাম ও রিপোর্টের কথা বলিলাম, তখন নরম হইয়া সবিনয়ে বলিল "বাবু, আমি কি করিব, একাজ আমা হইতে হয় নাই, যাহা হউক আর দেরি নাই, ড্রাইভার ঐ উঠিল, এই দেখুন তাহাকে ছাড়িবার সঙ্কেত দিতেছি, মাপ করিবেন, ইত্যাদি।" ফলতঃ ইংরাজীওয়ালা একজন একটু তেজ দেখাইল ও রিপোর্টের কথা বলিল বলিয়াই ঐটুকু নরম সরম যাহা হইল, নচেৎ ভেড়া ছাগল পালের প্রতি মেষ পালকের ব্যবহার অপেক্ষাও নেটিভ লোকের প্রতি ইহাদের আচরণ অধিক প্রশংসনীয় নয়। আমিও ঐ গার্ড সাহেবকে বলিয়া ছিলাম যে, "এ ট্রেনে যদি ইউরোপীয় লোক থাকিত তবে কি তোমরা এরূপ করিতে সাহসী হইতে? এ নাকি গোরু ভেড়ার পাল পাইয়াছ, যাহা ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু জানিও এ অপরাধের জবাবদিহি অবশ্যই করিতে হইবে।"

ঐ কথোপকথনের ফলে অতি শীঘ্র গাড়ী ছাড়া হইল দেখিয়া গাড়ী সুদ্ধ তাবল্লোকে আমার অনুরাগ করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিয়া দুঃখ হইল, এত লোকের মধ্যে প্রতিকারের চেষ্টা বা সাহস বা প্রবৃত্তি কাহারো নাই। আমরা যে যার কাজে গেলাম, সে অত্যাচার ভুলিলাম, আবার সেইরূপ অত্যাচারে আপনারা পীড়িত হইব বা স্বদেশীয় জনগণ পুনঃ পনঃ পীড়িত হইবে জানিয়াও তাহার কিছুই কেহ করিল না। এই ঔদাসীন্য জন্য আমাদের এই অবনতি-দুর্দ্দশা এই চিরন্তনহীনতা।

কাশীর ডফরিন পুল চমৎকার নিৰ্ম্মাণ। তাহা পার হইয়াই কাশীর ষ্টেসনে প্রায়

৫টার সময় উপস্থিত হইলাম, এখানে ঘোটক শকট বড়ই কম, আমরা তো পাইলাম না; কাজেই নৌকা ভাড়া করিলাম। এখানেও কুলিলোকের বড়ই অত্যাচার, কলিকাতা বা অন্যস্থানের তুলনায় দ্বিগুণ পয়সা না লইয়া কাজ করিল না। নৌকাওয়ালারাও তেমনি ভয়ানক লোক, জো পাইয়া অনেক ভাড়া লইল—পাঁচ সিকারও অধিক লইয়া তবে আমাদিগকে অমৃতরায়ের ঘাটে লইয়া যাইতে স্বীকার করিল। তদ্বাদে নৌকার ছাদে দুইজন ব্রাহ্ম যুবককে অতিরিক্ত পয়সা লইয়া উঠাইল। আমি যখন সমগ্র নৌকা ভাড়া করিয়াছি, তখন তাহা তাহারা ন্যায় মতে পারে না, কিন্তু কে কলহ করে? যাহা হউক ঐ দুই-ব্রাহ্ম যুবক কিয়দ্দূর নৌকা চলিবার পর ব্রহ্মসঙ্গীত গান ও উপাসনার্থ আমার অনুমতি চাহিল, আমি বলিলাম, এমন উত্তম বিষয়ের জন্য আবার অনুমতি কেন? তাঁহারা বলিলেন "মহাশয়! এ কার্য্যে অনেকে মহা বিরক্ত হন, বিশেষ আপনার সঙ্গে স্ত্রীলোক, এই কারণেই অনুমতি চাওয়া।" যাহা হউক তাঁহারা ছাদে বসিয়া সুস্বরে ব্রহ্ম সংগীত গাইয়া আমাদের পথশ্রান্তির প্রচুর শান্তিবিধানে সমর্থ হইলেন। আমি সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা পথের মধ্যে এক ঘাটে নামিলেন।

নৌকা হইতে আমার স্ত্রীকে কাশীর গল্প, তীরের শোভা সমস্ত দেখাইয়া অনেক ঘটনাদির পরিচয় দিতে মহা সুখে চলিলাম। পূর্ণিমায় চন্দ্রকিরণ-বিধৌত কাশীর সৌধমালা ও ঘাট ইত্যাদির যে কি রমণীয় অপূর্ব শোভা, তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বর্ণনা দ্বারা সম্যগ্ বুঝাইয়া দিই, এমন শক্তি ও সময় আমার নাই। বিশেষতঃ এই দৈনিক লিপি বিবিধ কাজের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি লেখা, সকল কথা ও ঘটনা এতন্মধ্যে প্রার্থনীয় রূপে লিখিয়া উঠা ভার। কেবল "মেমো" স্বরূপ ইহাকে যখন তখন কিছু কিছু লিখিয়া রাখা মাত্র।

রাত্রি ৮টার সময় ঘাটে পৌঁছিয়া মুটে ভাড়া করিয়া (এখানেও বেশী) আমার পিসতুতা ভগ্নিপতি হোমিওপেথিক প্রাক্টিসনার বাবু শ্রীকৃষ্ণ দত্তের দেবনাথপুরা নামক পল্লীস্থ ভবনে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাদিগকে পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন, তাঁহার পুত্রবধূ আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন; সেই পুত্রবধূ যে নির্বিঘ্নে এমন আত্মীয় সঙ্গে আসিয়াছেন ইহাতেও তাঁহার প্রচুর উল্লাসানুভব করিলেন।

[আমরা] আসিব, পূর্ব্ব হইতেই কথা ছিল, কিন্তু আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় বহু ঘটিকা অতীত হওয়াতে তাঁহারা সে দিন আর আসার প্রত্যাশা করেন নাই। রজনীতে অল্পাদি আহারান্তে শুইয়া পড়িয়া বাঁচিলাম, অত্যন্ত ক্লান্তির পর খুব সুবিধাই ভোগ করিলাম। স্নান আর কাহারো হইল না।

দৈনিক লিপি; কাশী, মাঘ ১২৯৪।

১৬ই মাঘ ১২৯৪ সাল। রবিবার। ২৮শে জানুয়ারি ১৮৮৮।

অদ্য রবিবার। প্রাতে গতদিবসের ক্লান্তি জন্য কুত্রাপি যাই নাই, বাসায় ছিলাম বাটীতে পত্র লিখিলাম। মেয়েরা দেব দর্শনাদি করিয়া আইল। বৈকালে শ্রীকৃষ্ণ,

বরেন ও কুমেদকে সঙ্গে লইয়া কাশীর পশ্চিম বিভাগস্থ নূতন রাস্তা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণ করিলাম। দুর্গাবাটির পথে বড়ারের রাণী স্থাপিত এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি দেখিলাম। যেমন সুন্দর মন্দির, মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেব-দেবী মূর্ত্তিগুলিও তেমনি মনোহারিণী। এ মন্দির প্রতিষ্ঠা বেশী দিন হয় নাই। মন্দিরে প্রবেশ মাত্রই গহ্বর মধ্যে অপূর্ব্ব ও বৃহৎ শিবলিঙ্গ অর্দ্ধমূর্ত্তি দৃশ্যমান। ইহা মন্দিরের দর-দালান ন্যায় স্থানে। মন্দিরটী যেমন সুদৃশ্য, তেমনি আলো ও বায়ুপূর্ণ অন্যান্য দেবমন্দিরের ন্যায় অন্ধকূপবৎ নহে। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রধান স্থানে ভগবান কেশবের চতুর্ভুজ পাষাণ মূর্তি কৃষ্ণমর্ম্মর রচিত, সুগঠিত—চতুরহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভমান। বিগ্রহটি ছোট নন, অথচ খুব প্রকাণ্ডও নহেন, তাহাতে আরো ভালো দেখায়—বিগ্রহের সাম্য মূর্ত্তি ভক্তের উক্তি উদ্রেক পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। ওঁহারই বামপার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে ভিত্তির কুলাঙ্গি মধ্যে ভগবতী মূর্ত্তি, শ্বেতমর্ম্মরে গঠিত, নিতান্ত ছোট নন, আহা! কি সুন্দর মুখশ্রী, আর এক কোণে পার্ব্বতী মূর্ত্তি, তাহার এরূপ শ্বেতমর্ম্মর অতিসুন্দর, এই উভয় মূর্ত্তিরই শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য, দেবী-মাধুর্য্য, দেবীভাব, স্বভাবোপযোগিতাময়ভঙ্গী; গণ্ড ইত্যাদি কি সুন্দর, কি অনন্দ-জনক, কি শ্রদ্ধা উত্তেজক! বিশেষতঃ বিম্বাধর যুগল যেন প্রকৃত প্রস্তাবেই মৃদুমধুর হাস্য হাসিতেছে, দেশী শিল্পী দ্বারা যে আজ কাল্ পাষাণোপরি এমন অতুলিত স্বভাব-সৌন্দর্য্যময় মনোহর মূর্ত্তি খোদিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। অঙ্গ প্রত্যংগ বেশভূষা ও রং প্রভৃতি তেমনি সুন্দর। কেবল একটী মাত্র ত্রুটী বিশেষ রূপে লক্ষিত হইল যে, বদনের সহিত অবয়বের পরিমাণ সামঞ্জস্য ঠিক রক্ষা হয় নাই। অর্থাৎ বদনদ্বয় যত বড় হইয়াছে, দেহদ্বয় সে পরিমাণে কিছু ছোট হইয়াছে—হয় শ্রীমুখ দুখানি আর একটু ছোট, নতুবা বপু ও হস্তপদাদি আর একটু বড় করা উচিত ছিল। যাহা হউক, সাধারণতঃ সাধারণের দৃষ্টিতে এই দুই মূর্তি অতি অপূর্ব্ব বলিয়াই অনুভূত হইবে—হইবে কেন, হইতেছে।

১৭ই মাঘ ১২৯৪, সোমবার। ২৯শে জানুয়ারী ১৮৮৮।

প্রাতে (কিছু বেলা হইলে) শ্রীকৃষ্ণ ও কুমেদ ও বরেন্দ্র সঙ্গে প্রথমে মৎস্য তরকারী ফল মূলাদির বাজারে গিয়া তাহারই সাহায্য করিলাম। ঐ বাজার দশাশ্বমেধের ঘাটের উপরে। কুমেদের দ্বারা সে সব বাসায় পাঠাইয়া আমরা তিনজনে মানমন্দিরে গেলাম। যে মানমন্দির ইতিহাস বর্ণিত মারয়ারাধিপতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জয়সিংহের অদ্ভুত কীর্ত্তি—মথুরা জয়পুর প্রভৃতি কয়েকস্থলে স্থাপিত জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি সন্দর্শন ও সমালোচনার্থ কয়েকটী মানমন্দিরের মধ্যে কাশীর মানমন্দিরটীও বিশেষরূপে বিখ্যাত। এস্থলে জ্যোতিঃশাস্ত্র সংক্রান্ত কতপ্রকারের যন্ত্রাদি ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না—রেবরণ্ড ডফ প্রভৃতি কত বড় বড় বিদ্বান্ ও জ্যোতির্বিদ্গণ এই মানমন্দিরে আসিয়া দেখিয়া অবাক্ হইতেন। কিন্তু হায়! সে রামও নাই, সে

অযোধ্যাও নাই—পূর্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যা যৎকিঞ্চিৎ পাষাণের মণ্ডল অর্ধমণ্ডলাদি অর্থহীনভাবে পড়িয়া আছে মাত্র, সেরূপ যন্ত্রাবলী, রাশি চক্রাদি ও গণনা উপায় প্রভৃতি কিছুই আর নাই। যেমন কোনো কোনো জীবের অস্থিদর্শনে লোকে পূর্বে তাহার এক সময়ে যে ছিল, তাহা জানিতে পারে মাত্র, এই মানমন্দিরে এখন যাহা আছে প্রায় তাহাই বটে। ৩৭/৩৮ বৎসর পূর্বে প্রথম যখন কাশীধামে আসি, তখনও যাহা যাহা ছিল, এক্ষণে সে সবও অদৃশ্য হইয়াছে। মানমন্দিরের বাড়িটি উমত্ত, ঠিক গঙ্গার উপর, তাহার ঘাটও উত্তম, সম্প্রতি বাড়িটী মেরামতও হইয়াছে, রক্ষক লোকজনও আছে, কিন্তু আসল বস্তু নাই—সে পক্ষে কাহারো যত্ন নাই—কাহারো দৃষ্টি নাই। যে যাহার রসগ্রাহী নয়, তাহার দ্বারা তাহার গুণ-গ্রাহিতা বা যত্ন আশা করাই বৃথা। ভূতপূর্ব জয়পুররাজ নানা বিষয়ে বিলক্ষণ রাজগুণমালায় ভূষিত ছিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। অন্ততঃ পূর্ব পুরুষের কীর্ত্তি বলিয়া তৎরক্ষার চেষ্টা পাওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। ভরসা করি বর্ত্তমান মহারাজ এখন যতটা পারেন সে পক্ষে চেষ্টা পাইবেন। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়াও নিতান্তই পাগলের মতন বকিতেছি, যে কাজে ইংরাজেরা গৌরব না করেন, সে কাজে তার চেয়ে কেহই কি আর উৎসাহী হয়? যদিও ইংরাজ স্বদেশীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে মহানুরাগী; কিন্তু দেশীয় রাজার স্থাপিত তদ্বিষয়ক কীর্তি সম্বন্ধে তাহার অনুরাগের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং তাঁহাদের ক্রীতদাসবর্গের নিকটেই বা তদ্রূপ অনুরাগের আশা কোথায়? মানমন্দির উপর নীচে গঙ্গার উপর বারাণ্ডা ও সৌধশেখরের ছাদ বেড়াইয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তথা হইতে আসিয়া উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক ডাক্তারের ডাক্তারখানায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া তাম্রকূটের ধূম্র সেবন ও গল্পাদি হইল। স্থানটি এখন সুন্দর হইয়াছে; পূর্বে গোদাবরী নামে কাশী সহরের মধ্যস্থলে জলপ্রবাহহীন বিষ্ঠাময় খালের ন্যায় যে নদী ছিল, অথবা বর্ষাকালে সরু নদী ও অন্যকালে কদর্য্য দৃশ্য ও দুর্গন্ধ পদার্থ পূরিত ঐরূপ শুষ্ক গভীর প্রণালী যাহা ছিল এবং যাহাকে ৩৮ বৎসর ও ৩৪ বৎসর পূর্বে যখন আমি দুইবার কাশীতে আসি, তখন দেখিয়া বড়ই বিরক্ত এবং কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অনুযোগ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম; এখন সেই পয়ঃ-প্রণালী বুজাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে সুপ্রশস্ত সুচারু বর্ত্মনির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহারই দ্বারে উমেশবাবুর ঐ ডাক্তারখানা। দশাশ্বমেধের ঘাট পর্যন্ত গিয়া ঐ রাস্তার শেষ হইয়াছে, তাহারই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বাঙ্গালী টোলা এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমদিকে হিন্দুস্থানী পল্লী, চক এবং বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কালভৈরব, গোপাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবস্থান। ফলতঃ ঐ রাস্তাটী কাশীনগরকে যেন দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া অসংখ্য সঙ্কীর্ণ-গলিময়ী পুরীর শ্বাস প্রশ্বাসের সুন্দর যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। যখন গোদাবরী নানা ভয়ঙ্করী নালা বিদ্যমান ছিল, তখন দশাশ্বমেধের ঘাটটীও অতি কদর্য ও

ন্যক্কারজনক স্থান ছিল, এখন ঐ একমাত্র চারুকর্ম্মের গুণে সেই ঘাটও পাশ্ববর্ত্তী ঘোড়া ঘাট অতি সুরম্য নদী পুলিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘাটের উপরে অথচ ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে ফল মূল তরকারী মৎস্যের বাজার রাস্তার ধারে ও একটী প্রশস্ত পোস্তার উপর প্রতিদিন বসাতে এবং প্রায় চারিদিকেই নানাবিধ দেশী বিলাতি পণ্যদ্রব্যের সুন্দর সুন্দর বিপণি-সকল স্থাপিত হওয়াতে স্থানটী কি জনতায় কি রম্যতায় কি সম্বায়ু সমাগম পক্ষে অতি উত্তম ও ভ্রমণের উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ পূর্বে কদর্যতামূলক স্মৃতির সাহায্যে এই সুদর্শন আরো মনোহর রূপ লক্ষণীয় হইতেছে। রাস্তাটী খুব প্রশস্ত, সুনির্ম্মিত, প্রত্যহ জল সিঞ্চিত এবং তাঁহার উভয় পার্শ্বে পাষাণ-পয়ঃপ্রণালী ও ফুট পাথে সুশোভিত।

ঐ স্থান হইতে ঐ রাস্তা বাহিয়া পশ্চিমমুখ হইয়া চলিলাম। কিয়দ্দূরে চৌমাথা। সেই চৌমাথার উত্তরদিকে কাশীর মহারাজা একটী সুন্দর শিবমন্দির নির্ম্মাণ ও নানা দেবমূর্ত্তির সংস্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের উপরিভাগ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু নিম্নভাগ যেরূপ সুগঠিত হইয়াছে, তাহাতে উপর যে তদুপযুক্ত সুচারুশীল হইবে, তাহা দর্শন মাত্রেই বুঝা গেল—তাহার উপকরণাদিও তথায় প্রস্তুত রহিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তর আরও সুন্দর, নানা চিত্রবিচিত্র কারুকার্যে খচিত ও শিল্পজ পদার্থে সুসজ্জিত। তবে সত্য বলিতে গেলে কলিকাতায় গৌরীবেড় নামক পল্লীতে পার্শ্বনাথের নবমন্দিরের (কি বাহির কি ভিতর) নিকট ইহাকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির বা চৌতারাটী বড় না হইলেও সুন্দর হইয়াছে।

উহা দর্শনান্তে ঐ রাস্তার মোড় ফিরিয়া দক্ষিণাদিভিমুখে চলিয়া আপনাদের দেবনাথপুরার বাসভবনে অনেক বেলায় ফিরিয়া আসিয়া স্নান-ভোজন করিলাম।

ঐ ১৭ই মাঘ সোমবারের বৈকালে নারদঘাট বা অমৃতরায়ের ঘাট হইতে নৌকা চড়িয়া গঙ্গায় উত্তর মুখে চলিলাম! সঙ্গে আমার স্ত্রী, পৌত্র ও ভৃত্য ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ, তস্য পুত্র অতুল ও সুশীল, কন্যা নৃপেন্দ্রবালা ও মেনি এবং তাহার শাশুড়ী অথবা আমার বৃদ্ধা পিসি প্রভৃতি দিবাভাগে নৌকাযোগে কাশীর গঙ্গা-তীরস্থ অপূর্ব্ব ও অত্যুচ্চ সৌধমালা ও অতুলনীয় ঘাট পরম্পরার অলৌকিক শোভা দেখিতে দেখিতে মহা-হর্ষে আমরা রেলওয়ের ডাফ্‌রীণ পুলের নিম্ন দিয়া সেই অদ্ভুত সেতু পার হইয়া আদিকেশবের ঘাটে তরণী লাগাইলাম। আদিকেশবের মন্দিরের কুঠিতে যে পাহাড়ে উঠিতে হয়; স্ত্রীগণের বিশেষতঃ প্রাচীনা পিসিমাতার তদুত্থানে কিছু কষ্ট হইল। কিন্তু আদিকেশব ঠাকুর দর্শনে সে ক্লেশ ক্লেশ বলিয়াই আর বোধ হইল না। কেশবদেবের চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটী কৃষ্ণপ্রস্তরের সুন্দর গঠিত এবং স্থানটিও অতি নির্জ্জন ও মনোহর। কাশীর তীর্থযাত্রিগণকে অগ্রে এই আদিকেশবের দর্শনপূজন করিয়া তবে গিয়া বিশ্বেশ্বরাদি দর্শন করিতে হয়। এতদ্দ্বারা শৈব বৈষ্ণবের বৈরতাভাব যাহা অনেকে কীর্ত্তন করিতে ভালো বাসেন তাহাতো

বুঝাইতেছে না—বরং শৈবগণওযে বৈষ্ণব তাহাই বুঝাইতেছে। নতুবা শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থানে কেশবের এত গৌরব কদাচ ঘটিত না। যাহারা ধর্ম্মান্ধ গোঁড়া শৈব্য বা গোঁড়া বৈষ্ণব, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র, নতুবা যাহারা যথার্থ ভক্ত তাঁহাদের নিকট হরি-হরের অভেদ ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। বিশ্বেশ্বর স্বয়ং বারাণসীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াও কেশবদেবের এত মান বৃদ্ধি করা তাঁহার মতন যোগীশ্বরের উচিত কার্য্যই হইয়াছে। কিন্তু ইহা তো রূপকের কথা, প্রকৃত কথা এই যে, শৈবরা অসহিষ্ণু ধর্ম্ম গোঁড়া নয়, বরং গোঁড়া বৈষ্ণবরাই বিশিষ্টরূপে অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কাশীতে যেমন কেশবের বহুমান, বৃন্দাবনে তেমন শিবের বহুমান আছে কিনা, তাহা যতক্ষণ বৃন্দাবনে না যাইতেছি, ততক্ষণ বলিতে পারিতেছি না।

আদিকেশবের পরেই বরুণা এই ক্ষুদ্র নদী কাশীকে পশ্চিম ও উত্তরে বেষ্টন করিয়া জাহ্নবীর অঙ্গে গা ঢালিয়াছে। কাশীর দক্ষিণে অসী নদীও ঐরূপে সুরধুনীর সঙ্গে মিলিয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্রকায়া অসী ও বরুণা এবং তরঙ্গা গঙ্গা, এই তিনে মিলিয়া কাশীকে একটী দ্বীপ করিয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় এই নিমিত্তই কাশী পৃথিবী ছাড়া স্থান বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। এবং গঙ্গার ধারে কাশী যেরূপ উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত, তদ্দর্শনে মহাশূলীর ত্রিশূলোপরি স্থাপিত বলিয়া যে বর্ণনা আছে, তাহা বড় মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক ঐ বরুণার মধ্যে নৌকাযোগে ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বর্ষা ব্যতীত সে আশা সফলা হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বর্ষা ব্যতীত অন্য কালে অসী বরুণাতে জল থাকে না, এখন মাঘ মাসে যাহা একটু কর্দ্দমযুক্ত জল দৃষ্ট হইল, আর কিছুদিন পরে সে সামান্য শিক্ত অবস্থাও থাকিবে না। সুতরাং ঐ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ঐ মোহনা পার হইয়া উত্তরাভিমুখে সুপ্রসিদ্ধা ও সুপণ্ডিতা তপস্বিনী মা-জীর আশ্রম দর্শনে চলিলাম। বরুণা-সঙ্গম হইতে কিছু দূরে গিয়াই সে আশ্রম পাইলাম এবং সপরিজনে তাঁহার দর্শন বন্দন আলাপনাদি করিয়া চরিতার্থ হইলাম। তাঁহার পবিত্র ও শান্তিময় আশ্রম ও তাঁহার প্রশান্তময়ী মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার সহিত ও আশ্রমবাসী অন্যান্য ব্যক্তির সহিত সাধু আলাপে মন মোহিত হইল। শ্যামাচরণ বাবু নামে মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বতন উকীলবাবু এক্ষণে পরমার্থ পথের পথিক হইয়া ঐ আশ্রম মধ্যে জপতপাদি সাধনোপযুক্ত একটী কাঁচাপাকা সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন, তাঁহার সহিত নানা কথোপকথনেও সুখী হইলাম। আমার পরমাত্মীয় বন্ধু কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বাবু বিহারীলাল ভাদুড়ি মহাশয় এই মা-জীর একজন পরম ভক্ত। তিনি এবং আর ২।৩ জন ভক্তেই তাঁহার সমুদয় ব্যয় ভার বহন করেন; এজন্য অন্য কাহারো দান তিনি গ্রহণ করেন না। পূর্ব্বে বা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বংশের ঐ ভাদুড়ি মহাশয়ের যত্ন ও ব্যয়ে মা-জীর আশ্রমের নিম্নে যে ইষ্টক-পোস্তা নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহা প্রবলভক্ষা তরঙ্গময়ী গঙ্গা গ্রাস

করিয়াছে, তজ্জন্য আশ্রমটীর এখন বিলক্ষণ পতনাশঙ্কা হওয়াতে উক্ত বাবুর যত্নে পুনর্ব্বার ভালোরূপে পোস্তা বাঁধার উদ্যোগ হইতেছে। রেলওয়ে সংক্রান্ত একজন বাবু ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধির সাহায্যে তাহা এবার নির্ম্মিত হইবে। তাহার জন্য অতি উত্তম ইট কতকগুলি আনীত হইয়াছে দেখিলাম। আরো শুনিলাম কলিকাতার বিখ্যাত দাতা ধনী বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় (এখন তিনি কাশীতে) ঐ পবিত্র আশ্রমও পোস্তা সুদৃঢ় ও সুচারুরূপে নির্ম্মাণার্থ প্রচুর সাহায্য দানে প্রস্তুত হইয়াছেন।

আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া আমরা নৌকা যোগে বাসে ফিরিয়া আসিলাম। সে দিন ঐরূপে গেল।

১৮ই মাঘ ১২৯৪, মঙ্গলবার। ৩০শে জানুয়ারী ১৮৮৮।

অদ্যপ্রাতে কোথাও আর যাওয়া হয় নাই, বাসায় বসিয়া পত্রাদি লেখা হয়। রূপরাম নামক জনৈক ব্রজবাসী কলিকাতা হইতেই পশ্চাতে লাগিয়াছেন, তিনি অদ্য কাশীর বাসাতেও আসিয়া উপস্থিত। এস্থলে গয়ালী ও ব্রজবাসী লইয়া আমি যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি; প্রসঙ্গত, স্মরণ হইল তো বলিয়া ৺গুরুচরণ পরামাণিকের পৌত্র ও তদ্রূপ ভাবাপন্ন অথচ তদপেক্ষা অধিকতর সুসভ্য, সুশীল ও প্রাতঃস্মরণীয় ৺তারকনাথ পরামাণিকের পুত্র প্রায় তদ্রূপ ভাবাপন্ন অথচ অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুশিক্ষিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ পরামাণিকের নিকট পশ্চিমযাত্রার বিদায় গ্রহণার্থ যে দিন যাই, সে রজনীতে তাহার বাটীতে গান বাদ্যের মজলিস হয়; প্রসিদ্ধ কানাইলাল গয়ালী এসরাজ যন্ত্রে অতি সুমধুর বাদ্য বাজাইয়া শ্রোতৃবর্গের মনোমোহন করেন। কথায় কথায় আমার উ-পশ্চিম আগমনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া উক্ত গয়ালীকে (যদি আমার গয়া যাওয়া ঘটে, এই আশায়) গয়াধামে পুনর্ব্বার দেখা সাক্ষাত হইবে, এমনভাবের কথাও বলা হয়। এবং কালীকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতির প্রশ্নোত্তরে "বৃন্দাবন যাওয়ারও ইচ্ছা আছে, ভাগ্যে ঘটিলে হয়" ইতিভাবের পরিচয় দিয়াও বিদায় গ্রহণ করি। পরদিন রাধাকৃষ্ণ মাহাতো নামক গয়ালীর গমস্তা প্রিয়নাথ দত্ত আমার কলিকাতার ভবনে গিয়া উপস্থিত, মহা হাঙ্গাম। তাঁহাকে ঐ কালীবাবুই বলাতে তাঁহার প্রভুর জজমান বাড়াইবার অভিপ্রায়েই আমার স্বর্গগত পিতৃব্য ৺চন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের জীবদ্দশায় কয়েক বৎসর তাঁহার গয়া গমনের সংবাদ যাতায়াত ও প্রসাদাদি দান করিয়া খুল্লতাত মহাশয়কে এক প্রকার প্রতিশ্রুত করাইয়াছিলেন যে, "যখন আমার আপত্তি নাই ইত্যাদি।" খুড়া মহাশয়ের সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া ঐ প্রিয়নাথ দত্ত জোর করিতে লাগিলেন যে, "রাধাকৃষ্ণ মাহাতোই আপনার গয়ালী। যদিও কর্ত্তা মহাশয়ের গয়া-যাত্রার অভিপ্রায় সিদ্ধ না হইতেই তিনি গতায়সু হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিয়োগ পালন আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য"। এই কথা বলিয়া প্রসাদাদি দিলেন। আমিও তদুত্তরে এই ভাবের কথা কহিলাম যে, "সেজজ্যেঠা মহাশয় প্রভৃতি আমার বাটীর

গুরুজনেরা গয়ায় গিয়া যাঁহাকে গয়ালী করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম যখন ভুলিয়াছি, এবং খুড়া মহাশয় যখন ঐরূপ আশা দিয়াছিলেন, তখন আমারও সে পক্ষে বিশেষ আপত্তি হইতে পারে না, অতএব যাহা হয় দেখা যাইবে।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে কালীবাবু স্বয়ং আসিয়া তাঁহার গয়ার পুরোহিত ঐ মাহাতো মহাশয়ের জন্য ও বিশেষ অনুরোধ করাতে আমিও ঐ ভাবের কথায় একপ্রকার স্বীকারবদ্ধ হইলাম। মনে করিলাম, কানাইলাল ঢেঁড়িকে তো কথা দিই নাই। কেবল গয়াধামে আবার দেখা সাক্ষাত হইবে এই মাত্র ভাবের যাহা কিছু আশা দিয়াছি তাহা গান বাজনা আমোদ প্রমোদের ভাবেও হইতে পারে এবং তিনি যেরূপ অতুল সম্পত্তির অধিকারী; তাহাতে আমার ন্যায় সামান্য জজমানের জন্য এত আশা প্রকাশ কখনই করিবেন না। তদ্বাদে স্বর্গীয় কর্ত্তা মহাশয় যাঁহাকে আশা দিয়াছিলেন, তাঁহার জন্যই পরমাত্মীয় মহামান্য কালীবাবুরও অনুরোধ পাড়িতেছে। অতএব যদিও কানাইলালের প্রতি প্রাণের টান আছে, তথাপি রাধাকৃষ্ণকে গ্রহণ করা কর্ত্তব্যরূপে গণ্য হইতে পারে। যদি কানাইলাল সে দিন আমার নিবট আসিতেন কি বলিয়া পাঠাইতেন, তবে আর এ বিপদ ঘটিত না—তাহা হইলে যে পক্ষে প্রাণের টান, সেই পক্ষে কথা দেওয়া ঘটিয়া সকল জ্বালা চুকিয়া যাইত। তৎপর দিবসে রাধাকৃষ্ণ মাহাতো স্বীয় পুত্র ও গমস্তা সহিত স্বয়ং আসিয়া ঐ বন্ধন যাহা কিছু শিথিল ছিল, তাহা সুদৃঢ় করিয়া গেলেন। যদিও আমি পূর্ণমাত্রায় অস্বীকারবাক্য দিই নাই, তথাপি একপ্রকার স্বীকৃত হওয়াই হইয়াছিল বটে। যাহা হউক; তৎপর দিন সহসা কানাইলাল ঢেঁড়ি আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার হৃদয় কাঁপিল, তখন বুঝিলাম ইঁহারা হাজার মহাধনী হউন, একটী সামান্য জজমানও ইঁহাদের নিকট মহারাজা রূপে গণ্য, ইঁহারা জজমান বাড়াইতে ও রাখিতে নাছোড়বান্দা—নাই বা হইবে কেন, উহাই উঁহাদের লক্ষণ। তিনি সমাদৃত হইয়া উপবিষ্ট হইবামাত্র বলিলেন, "শুনিলাম; আবার নাকি কোন্ গোয়ালী আসিয়াছিলেন।" আমি সমুদয় অবস্থা ও বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলাম, তিনি শুনিয়া বিপুল আগ্রহ ও মহা অভিমানের সহিত বলিলেন, "তাহা হইবে না, কদাচই হইবে না, আপনি আমার, অন্য কাহার সাধ্য আপনাকে লইতে পারে. কালীবাবু আমার জজমান নন, তবু তাঁহার অনুরোধে আমি তাঁহার বাড়ী গিয়া আমোদ করিয়া আইলাম; এইটী কি তাহারই প্রতিফল—তাঁহারই সাক্ষাতে আপনি আমার জজমান হইয়াছেন, তথাপি তিনি কি বলিয়া অন্যের জন্য আপনাকে অনুরোধ করেন; এই কি তাঁহার ন্যায় লোকের উচিত ? তা তিনি যাহাই করুন আর যাহাই বলুন আমার এ অপমান আপনি করিতে পারিবেন না, আমি কখনই ছাড়িব না। কবে আপনার খুড়া কাহাকে আশা বাক্য কহিয়াছিলেন; তাঁহার গয়া যাওয়া ঘটেও নাই, আপনি যে সামান্য সূত্রে বদ্ধ হইতে কদাচ বাধ্য নহেন। আমার সহিত আপনার অগ্রে কথা হইয়াছে ; আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসরাজ বিদ্যায় আমার শিষ্য হইয়াছেন, আপনি এখন অন্যকে

কদাচ বরণ করিয়াই আমার অপমান করিতে পারিবেন না।" আমি বলিলাম, "ঐ চরণেই আমার প্রাণের টান, কেবল ঐ যাহা বলিলাম, সেই সব ঘটনাসূত্রেই আবন্ধ হইয়া পড়িয়াছি, দেখি কি হয়, যাহাতে প্রাণের টানের দিগে পড়িতে পারি, সর্ব্বান্তঃকরণে সেই পক্ষই চেষ্টিত রহিলাম।" ইত্যাকারের কাঁচা-পাকা অর্দ্ধ স্বীকার অর্দ্ধ চেষ্টার স্বীকার বলিয়া কহিয়া সেই নাছোড়বান্দাকে তো কোথাও বিদায় করিলাম। রাত্রে কিন্তু নির্জন হইলে মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, বিপদ বড় সহজ নহে। ভগবান উদ্ধার করুন তো তবেই নিস্তার। ফলতঃ গয়ায় পিণ্ড দিলে পিতৃলোক উদ্ধার হইবেন, ইহা আমার ধর্ম্মপ্রত্যয়মূলক সংস্কার নহে, কেবল গুরুজনগণ ও পরিজনবর্গের নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই সে কথার কল্পনা জল্পনা হইতেছিল, এখন এই বিপদে পড়িয়া ভাবিলাম তবে তো দেখ্‌ছি গয়ায় যাওয়া ও গয়াস্থানটি দেখাই আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল—যাহা হয় শেষ হইবে। পরদিন পরমবন্ধু দ্বারকানাথ পাঠক মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিলাম, তিনি প্রত্যহই কালীবাবুর বাড়ি যান, তিনি বলিলেন কানাই গয়ালীকে গয়ালী করাই উচিত, গয়ায় যাইবার কিছু দিন পূর্ব্বে আমাকে কোন ছল-ছুতায় পত্র লিখেন ও আমি কালীবাবুকে বুঝাইয়া তাঁহারই দ্বারা রাধাকৃষ্ণ মাহাতোকে ক্ষান্ত করিব।

এই তো গেল গয়ালীর কথা। ব্রজবাসী লইয়াও তুমুল সংগ্রাম। রামপ্রসাদ নামক একজন ব্রজবাসী প্রথমে আমার 'কটীকামু' ভবনে আসিয়া জজমানত্ব পদে বরণ করেন। আমি বলিলাম, "আমার বন্ধু বাবু কেশবচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের শ্যালক বৃন্দাবন গোবিন্দজীর পুরীর কামদার, কেশববাবু তাঁহাকে অনুরোধ পত্র দিয়াছেন, যদি আমার বৃন্দাবন যাওয়া ঘটে, তবে ঐ বন্ধুর শ্যালক গৌরদাস বাবাজী যে ব্রজবাসীকে লইতে বলিবেন, তাঁহাকেই লইব। তোমার নাম তাঁহার নিকট করিব; তিনি তাহাতে অমত না করেন তো তুমিই হইবে।" তিনি সেই কথায় সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন; ভাবিলাম এ উৎপাত চুকিয়া গেল, বাঁচিলাম। ও মা, তার পরদিন আবার ঐ কালীবাবু আর তাঁহার নিজের বাদীকে পাঠাইয়াছেন। ইহার নাম রূপরাম, ইনি যখনি কলিকাতায় যাইবেন তখনই ঐ কালীবাবুর বাটীতেই ভোজন বায়নাদি করিয়া তাঁহাকে চরিতার্থ করেন। ফলতঃ কালীবাবু আপনার পুরুষানুক্রমে যেমন পরম ভক্ত ও তীর্থাদি বিষয়ে তেমন পুরুষ, আমাদিগকেও তাই ঠাওরান। আমাদের ন্যায় লোকের প্রকৃত মনের ভাব যে কি তাহা ত তাঁহারা জানেন না, বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের তীর্থগমনের পূর্ব্বে যেমন নানাবিধ ঘোরঘটা ও তীর্থগুরুজীদের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া থাকে; মনে করেন আমাদেরও বুঝি তাই। আমরা কি ধনে কি মনে যে স্বতন্ত্র জীব, তাহা ঠাওরাইতে না পারাতেই এই সকল উপরোধ অনুরোধ ইত্যাদি। স্বাস্থ্য ও দেশভ্রমণ উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ আমার পশ্চিমে আসা; তবে বুড়া প্রেয়সী সঙ্গে, তাহারই ধর্ম্ম-সংস্কারানুযায়ী যৎকিঞ্চিৎ তীর্থকার্য ও দান ধ্যানাদির যাহা কিছু আবশ্যক; তাহা

উপস্থিত মতে সামান্য প্রকরণে ঠিকা পুরোহিত দ্বারা নির্ব্বাহ হইলেই যথেষ্ট। এ ভাব কালীবাবু বুঝিবেন কিরূপে? যাহা হউক তাঁহার নিকট বিদায় লইতে গিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছি। ঐ রূপরামকে যত বুঝাইলাম, কিছুতেই তিনি শুনেন না। শেষ কাজেই এই কড়ারে সম্মত হইলেন যে, গোবিন্দজীর কামদার গৌরদাস বাবাজীর নিকট পূর্ব্বাপর ব্যক্তির সহিত তাঁহার নামেরও উল্লেখ করিব, তিনি যাঁহাকে লইতে বলিবেন, তাঁহাকেই লওয়া যাইবে। বোধ হয়, তিনি গৌরদাসকে অগ্রেই হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইবেন। তাহা হইলেই হইল, তিনি যখন কালীবাবুর পুরোহিত, তখন তাঁহাকে লইতে গৌরদাস বলিলে আমিও সন্তুষ্ট হইব। সে যাহা হউক; ঐ ঘটনার পর আমি যে কয়দিন কলিকাতায় ছিলাম, সে কয়দিন তিনি প্রত্যহ যাইতেন এবং কানাইলাল গয়ায় চলিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার লোক সর্ব্বদাই যাইত এবং যখন হাবড়া ষ্টেশনের গাড়িতে উঠি, দেখি যে তাঁহার লোক তথা পর্য্যন্ত আসিয়া মহা যত্ন বিকাশ করিয়া আমাদিগকে চালান দিয়া তবে ফিরিয়া গেল। ঐ রূপরাম কাশীতে গিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমার বাসায় গিয়া ধরিয়াছেন। আমি এত বুঝাইলাম, কেন ঠাকুর অমন কর, আমার যে কথা সেই কাজ, যাহা বলিয়াছি তাহার একচুল অন্যথা হইবে না, বৃথা কেন কষ্ট পাও, চলিয়া যাও, গৌরদাসের নিকট দুই নাম উপস্থিত করিব। তিনি যাঁহাকে বলিবেন তাঁহাকেই ব্রজবাসী করিব। আর আমার কাছে লভ্যই বা কি? যৎসামান্য পূজা দক্ষিণা বৈ আমার নিকট বেশী প্রত্যাশা আকাশ কুসুম। সেকথা কে শুনে? যে কয়দিন তিনি কাশীতে ছিলেন, সর্ব্বদা আত্মীয়তা করিতে যাইতেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই প্রসাদ দানের কথাও বলিব।

সেই দিন মধ্যাহ্নে ভাগিনের অতুলের সঙ্গে যখন ভোজন করি; তখন অতুল তাহার মাতাকে বলিল, "মা অমুক বাবু কাল্ আমাকে যে সব বরফি দিয়াছেন, তাহার একখান আমাকে দেও।" বরফি আইল; দেখিলাম সবুজবর্ণ, জিজ্ঞাসায় অতুল বলিল পেস্তার বরফি। ভোজন করিলাম। ভোজনের এক ঘন্টা বাদে অতুলের পিতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলাম, "কেন যে আজ্ আমি চক্ষু খুলিয়া রাখিতে পারিতেছি না। দিবানিদ্রা আমার কখনই অভ্যাস নয়, অনেকে মধ্যাহ্নে ভোজনের পর পুস্তকাদি পাঠ করিতে গেলে অমনি ঘুমাইয়া পড়ে, আমার তাহা ঘটে না বরং পাঠের অনুরোধে সমস্ত নিশাযাপনের পরবর্ত্তী মধ্যাহ্ন হইলেও কিছুমাত্র ঘুম আইসে না, তবে কেন আজ আমার চক্ষুর পাতা এত অবাধ্য হইতেছে?" এইরূপ অভিযোগ পুনঃ পুনঃ করিতে হইল। শেষে ৩টার পর বস্ত্রাদি কিনিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণ, কুমেদ ও বরেনকে সঙ্গে লইয়া কাশীর চকে চলিলাম। পথে দেহ যেন অবশ; নয়নদ্বয় মুদ্রিত ও চরণ যেন অচল-প্রায় হইতে লাগিল। কেন এমন অসুখ হইতেছে, বলিতে বলিতে চকে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচিত এক দোকানে বসিয়া বস্ত্রাদি কিনিলাম; সকল খরিদ শেষও হয় নাই, এমন সময় তামাক সাজিয়া আমার হাতে দেওয়াতে যেমন দুই একবার টানিয়াছি; অমনি

যেন মাথা ঘুরিয়া ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম—বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল।—সে সিদ্ধির প্রবল নেশায় যেমন যেমন হয়, তাহাই অনুভব করিতে লাগিলাম। যাহা কিছু চৈতন্য জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের সাহায্যে তখন বুঝিতে পারিলাম যে, অতুলের বন্ধু বাবু তাহাকে মাজুমের বরফি দিয়াছিলেন, সেই বরফি খাইয়াই আমার এই ভয়ানক অবস্থা ঘটিয়াছে। সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম। সেই বন্ধু বাবুর উদ্দেশে এবং অতুলের উদ্দেশেও (তখন অতুল যে জানে না ইহা মনে হইল না) বিস্তর অনুযোগ প্রয়োগ করিতে লাগিলাম—ফলতঃ এমন চুরি করিয়া নেশা করানো সর্ব্বনাশের সোপান। যাহার নেশা মাত্র সহ্য হয় না, তাহার তো ইহাতে সর্বনাশ হইতে পারে। বিশেষতঃ বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে দুইবার সিদ্ধি খাইয়া আমার প্রাণ যাইতে বসিয়াছিল। একবার বিজয়ার রাত্রে গাঁ সুদ্ধ জড় হইয়া ডাক করাইয়া পাশ পুকুরের জল ঢালিয়া ও অন্যান্য বিস্তর উপায় করিয়া আরাম করেন—বাটীতে কান্না পড়িয়াছিল। আর একবার কলিকাতাতেও প্রায় ঐ দশা ঘটে। তদ্‌বধি সিদ্ধি আর প্রায় স্পর্শ করি না। এই সব কথা বলাতে দোকানদার নূতন ভাণ্ড আনাইয়া তেঁতুল গুলিয়া আমাকে খাইতে দিল, আমি বেহুঁসে তাহা ক্রমে পান করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য এই, মনে হইতেছিল প্রাণ যায় যায়, বুদ্ধি ও চৈতন্য মূলেই নাই এবং পড়ি পড়ি, কিন্তু স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি তথাপি যায় নাই এবং অচৈতন্যও হই নাই, খুব মনের বল করিয়া সঙ্গীগণকে সঙ্গে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেই বিভ্রমের সময় দেখি সেই কাশীর গোপালজীর মহাপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত; নানাবিধ উত্তম সামগ্রী। সেই নেশার মধ্যেই তাহাকে বকিলাম যে তাহাকে পুরোহিত করিতে পারিব কি না যখন ঠিক নাই; তবে কেন তিনি এসব কাণ্ড করিতেছেন। বকিয়া ঝকিয়া আপন অসুখ বলিয়া বিদায় দিলাম, কিন্তু প্রসাদ খাইতে ছাড়িলাম না—নেশার ঝোঁকে অনেকটা খাইয়া ফেলিলাম। আমি উদরাময় পীড়া লইয়া কাশী আসি, কাশীতে আসিয়াই সে পীড়া প্রায় সারিয়াছিল, ঐ রাত্রে কতকগুলা খাইয়া পেটটা আমার গরম হইল, তাহা শোধরাইতে ২।৩ দিন গেল। সে রাত্রি কিরূপ যে কাটিল, তাহা আর বলা বাহুল্য। এবং তাহার পরদিনও মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সেই—ছিল। স্নানাহারের পর শান্তি লাভে নিস্তার পাই।

১৯শে মাঘ, বুধবার। ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৮৮।

পূর্ব্ববর্ণিত পূর্ব্বদিনের ঘটনায় অদ্য প্রাতে কোনো কার্য্যই করিতে পারি নাই। স্ত্রীলোকেরা দেবদর্শনাদি করিয়াছিল। অপরাহ্নে চাকর দিয়া পূর্ব্বদিনের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনা হয়। আর কোনো বিশেষ কার্য্য হয় নাই।

২০শে মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১২৯৪। ১লা ফেব্রুঃ, ১৮৮৮।

বৈকালে নৌকাযোগে স্ত্রীলোকদিগকে ও বরেন ও কুমেদকে সঙ্গে লইয়া আমি আর শ্রীকৃষ্ণ বেণীমাধবের ঘাটে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর সকলে আরংজেব বাদশার নির্ম্মিত

সুপ্রসিদ্ধ বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠিয়া শোভা দেখিয়া ও দেখাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করি। পূর্ব্বে ঐ স্থানে নাকি বেণীমাধবের মূর্ত্তি ও মন্দির ছিল; হিন্দুদ্বেষী বংশের ধ্বংসের সূত্রধর পাপমতি আরংজেব সে মন্দির ও মূর্ত্তি নষ্ট করিয়া তৎস্থানে অতি সুন্দর ও সুদৃশ্য এক বিশাল মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। সেই মসজিদের উভয় পার্শ্বে কলিকাতার মনুমেন্টের ন্যায় কিন্তু তদপেক্ষাও কয়তলা অধিক উচ্চ দুইটি বিচিত্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। প্রতি স্তম্ভে পাষাণ নির্ম্মিত সোপান সুপ্রণালীতে গঠিত হইয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। ঐ সোপান মূল স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়া একটু করিয়া নীচু নীচু হইত, তবেই আমাদের দুর্ব্বল রাজ্যের পক্ষে সুবিধা হইত। কাশীতে যেখানে যত পূর্ব্বকার মসজিদ আছে (তাহাতো অসংখ্য) সেখানেই ঐ রূপ বড় বড় ধাপ—চড়া চড়া দেশ, সবল পথের জন্যই গঠিত পাহাড়িয়া মুলুক, সুতরাং কৃষ্ণের জীব বাঙ্গালীদের উপযোগী নিম্ন নিম্ন ধাপ গাঁথিবে কম। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন কাশীতে থাকি, অথবা তাহার চারি বৎসর পরে দ্বিতীয় বার যখন আসি, তখন ঐ ধ্বজার উপর উঠিয়া তথায় বসিয়াই ঐ আরংজেব ধ্বজা সংক্রান্ত একটি গান বাঁধিয়া ছুরি দ্বারা ভিত্তির গায়ে আঁচড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম, হয়তো এ আঁচড় বহুকাল তিষ্ঠিবে, কিন্তু অদ্য গিয়া দেখিলাম সে আঁচড়ের চিহ্নমাত্র নাই। অদ্য উহার উপরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিগ যাহা দেখিলাম, তাহা স্বীয় হৃদয়ে অনুভব ভিন্ন অন্য হৃদয়ে সে ভাবের অনুরূপ ছবি অঙ্কিত করিতে পারি, এমন সাধ্য এ ক্ষুদ্র লেখনীর নাই। [লাইনটি ছেঁড়া; পড়া যায় না] ক্ষান্ত হইব যে, তাহার উপর হইতে ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে আষাঢ় মাসের প্রথমে (তখনও তড়খা নামে নাই) নিম্নস্থ গঙ্গাকে যেন সাপবৎ দেখিয়াছিলাম। এ বার ঢোঁড়া সর্পবৎ দেখিলাম। অর্থাৎ কাশীর গঙ্গা শুষ্ককালে যখন খুব শুকাইয়া যায় তখন ঐ ধ্বজার উপর হইতে তাহাকে এত অল্প পরিসর জলরেখাবৎ বোধ হয়, যেন সুদীর্ঘ একটি ছেলে সাপ খেলা করিতে করিতে যাইতেছে; এমনিই বোধ হয়। এখন মাঘ মাস; এখনও জল এত দূর নামিয়া বা কমিয়া যায় নাই—এখন চৈত্র বৈশাখের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রখর রৌদ্রের রুদ্র-মূর্ত্তি আইসে নাই—সে সব ঐ ধ্বজা হইতে গঙ্গার অপর পারেও রামনগর বা ব্যাসকাশীর দৃশ্য অতি সুন্দর। তথা হইতে বিন্ধ্যাচলকে যেন সুদূর আকাশের গায় অনুচ্চ অথবা সুদীর্ঘ মেঘ-মেখলা সাদৃশ্য কি সুদৃশ্য-বস্তুই দেখা যায়। বারাণসী পুরীতে এত যে ৫।৬।৭ তলা প্রস্তর প্রাসাদাবলী, সে গুলিকে যেন সুগঠিত কুটিরাপেক্ষা কিঞ্চিৎ কোনো ক্ষুদ্রতর জীবের আরামস্থানে বলিয়া জ্ঞান হয়! সহরের চতুর্দ্দিক বড় বড় বৃক্ষাবলীকে যেন ছোট লেবুর গাছ এবং ছোট গাছগুলিকে যেন গাঁদাফুলের গাছ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কিয়দ্দূরস্থ গঙ্গাতীরবাহী লোকজনকে এবং অসংখ্য ঘাট হইতে যে সব কাহারও রমণীগণ কুম্ভমস্তক উঠিতেছে; তাঁহাদিগকে যেন বালক বালিকা বলিয়া দৃষ্টিভ্রম জন্মে। সহস্র শিবমন্দিরের চূড়া সমূহের দৃশ্য কি মনোরমা

যাহাদিগকে ভূতল হইতে উচ্চ ও মহোচ্চ পদার্থ বলিয়া জানিতাম, এখন তাহাদিগকে আমার নিম্ন প্রদেশে নীচু পদার্থবৎ দেখিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের তুলনা তুল্য কি অতুল্য ভাবই মনোমধ্যে উদিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিন সে প্রকারের ভাব সকলকে হৃদয়ে উদিত ও বর্দ্ধিত হইতে দিতে সময় পাইলাম না। কারণ সঙ্গে স্ত্রীলোক, তাঁহাদিগকে নানা দিগের নানা শোভা দেখাইব না হৃদয়কে নিভৃত ভাবমালায় সাজাইব? বিশেষতঃ তিন চারি বৎসর বয়স্ক শিশু পৌত্রটী ও তদপেক্ষাও কিছু বড় ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী দুইটী, তাহারা শৈশব-চাঞ্চল্যে স্বভাবতঃই সুচঞ্চল, তাহাতে স্থানটী ভয়ঙ্কর সুতরাং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যতিব্যস্ত থাকাতে চতুর্দ্দিগে এত যে ভাবিবার অপূর্ব্ব বিষয় ও দৃষ্টি সুখোপযোগী এত যে রমণীয় শোভা, তাহা আর পেট ভরিয়া ভোগ করিতে পারিলাম না। এইরূপে ঠেকিয়া শিখিয়া মনে মনে সংকল্প করিয়াছি, আবার যখন আসিব, তখন হয় একাকী নয় তো অন্য কোনো বন্ধু সঙ্গে আসিব এবং আলাপী জনকেও এরূপ স্থলে আসিতে দেখিলে ঐ প্রকারে যাইতে উপদেশ দিব। যাহা হউক, এক প্রকার সাধারণ দৃষ্টি সুখ ও সঙ্গীগণের সহিত আমোদ উপভোগ পূর্ব্বক নামিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার পাদুকা পরিহিত হইয়া পার্শ্বস্থ পুরীতে শ্রীশ্রীবেণীমাধবজী বিগ্রহের সুচারু মূর্ত্তি ও সন্নিহিত অন্যান্য দেব-দর্শনে সুখী হইলাম। তথা হইতে সকলে মিলিয়া কালভৈরব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবাদি দর্শন পূর্ব্বক চকে আসিলাম। তথা হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাসায় পাঠাইয়া আমি আর শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণের দরকারী কতকগুলি লক্ষ্নৌ ছিট বস্ত্র ক্রয় পূর্ব্বক সন্ধ্যার পর বাসায় গিয়া সেদিনকার কার্য্য শেষ করিলাম।

এস্থলে উল্লেখিতব্য আমাদের অন্তঃপুরপিঞ্জর-রুদ্ধা-রমণী-পক্ষিণীরা কাশীতে যতটুকু স্বাধীনতা অর্থাৎ দেবদর্শন উদ্দেশে প্রায় সর্ব্ব পল্লীতে পদরূপে গমনাগমনের স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পাইয়া মহা সুখিনী হয়, এমন আর কুত্রাপি নহে। তবে বৃন্দাবনের কথা এখনও বলিতে পারি না, বোধ হয় তথায় গিয়াও এইরূপ দেখিতে পাইব।

২১ মাঘ শুক্রবার, ১২৯৪। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮।

অদ্য প্রাতে অন্যত্র গমন হয় নাই; কেবল আমার স্ত্রীর তীর্থকার্য্য স্বরূপ সধবা, কুমারী ও ব্রাহ্মণাদি কতককে ভোজন করানোর উদ্যোগ করিলাম। মধ্যাহ্নে সে কার্য্য একপ্রকার সুচারুরূপে হইয়া গেল। কাশীপ্রবাসী অনেক দুঃখী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এইরূপ সূত্রে প্রায় প্রত্যহই পরের স্কন্ধে আহার ব্যাপার ও পরিবার-পোষণভার নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। আমি তো সামান্য আয়োজনে অল্প সংখ্যায় খাওয়াইলাম এবং দক্ষিণাও প্রত্যেককে দুই আনার বেশী দিলাম না, কিন্তু কত শত ভক্ত এমন সর্ব্বদাই কাশীতে আসিয়া থাকেন, যাঁহারা সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও এসব কার্য্যে ব্রাহ্মণ পরিবারবর্গের আর্থিক বিষয়ে মহোপকারে লাগেন।

ঐ দিন বৈকালে ভ্রমণ বহির্গত হইয়া কলিকাতার বাবু নীলমাধব সেন ডাক্তার মহাশয় স্বাস্থ্যলাভ আশায় যে সুন্দর বাসা করিয়াছেন, তথায় গিয়া তাঁহাদের তাসক্রীড়া কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বরেন্দ্রের সহিত জগন্নাথের পুরী অভিমুখ ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে বাসায় আইলাম। এইদিন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অক্ষয় বাবাজীর প্রথম পক্ষের পিসশ্বাশুড়ী (মানীর বাগানের প্রসিদ্ধ ৺রামকৃষ্ণ সরকারের পুত্রবধূ—ইঁহারা সাতু লাটুবাবুদের জ্ঞাতি এবং তাঁহাদেরই শিবালয়ে কাশীধামে বাস করেন।) আমাদের বাটীশুদ্ধ মেয়েপুরুষ তাবৎকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দিবাভাগে মেয়েরা ভোজন করিয়া আসিয়াছেন। পুরুষেরা রাত্রিকালে গেলেন। আমি অবেলায় ভোজন করিয়াছিলাম, রাত্রে আর আহার করিব না বলিয়া তথায় গেলাম না। আমার স্ত্রী দিবাভাগে গিয়াছিল, কিন্তু আহার করে নাই; তবে নিমন্ত্রণ কারিণীকে একটী টাকা দিয়া প্রণাম করে। তিনি আবার আমার নাতিকে সেই টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ইতি শুক্রবারের পালা।

২২শে মাঘ, শনিবার ১২৯৪ সাল। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮।

অদ্য আমার উদরাময়ের ন্যায় একটু অসুখ হয়, কিন্তু সামান্য। তজ্জন্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও ভোজন ক্ষান্ত হই নাই। আমার স্বর্গগত মধ্যম সহোদরের শ্যালীপতি-ভাই অথবা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয় বাবাজীর মেশোমহাশয় বাবু নবীনচন্দ্র বসু (হালিসহরের) যিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের নানা অফিসে কর্ম্ম করিয়া এখন পেন্সন লইয়া সস্ত্রীক কাশীবাস করিয়াছেন। তাঁহারই ভবনে অদ্য নিমন্ত্রণ। এবং তাহা বাটীশুদ্ধ স্ত্রীপুরুষে উত্তমরূপে পরম পরিতোষে রাখিয়া আইলাম, যেহেতু নিমন্ত্রণ কর্ত্তারা স্ত্রীপুরুষে এত যত্ন ও আদর অবেক্ষণ করিলেন এবং এত প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দিলেন যে, পরিতোষ ভিন্ন অন্য কিছুই হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ও বরেন্দ্রের সহিত বাবু মহেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ভবনে গেলাম। ইনি আমার পুরাতন বন্ধু; প্রথমবার কাশীতে যখন আসি তদ্বধি যে তিনবার আসিয়াছিলাম, তাঁহার সৌজন্য যত্ন ও আমোদজনক বন্ধুতায় বরাবরই পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু এবারে তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদ দূরে থাকুক; ঐ দিনের পূর্ব্বে দেখা করিতেও সময় পায় নাই। অদ্য সেই দেখা করিতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। উভয়ের মহা আনন্দ। তাঁহার বৈঠকখানা সুসজ্জিত, পরিচ্ছন্ন এবং বীণা প্রভৃতি ভাল ভাল বাদ্যযন্ত্রে শোভিত। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ সেতার ও বীণা বাদক। ইনি সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের বহুল শিক্ষা ও আলোচনা করিয়াছেন। হাতেও খুব অভ্যাস করিয়া পাকা বাদক হইয়াছেন—বিশেষতঃ রাগরাগিণীর আলাপে অতি পণ্ডিত। এবারে তাঁহার বাদ্য শুনিবার সুযোগ ঘটে নাই। পূর্ব্বে যতবার কাশী আসিয়াছি, ততবারই শুনিয়া মোহিত হইয়াছি। কেবল হাতখানি যেন একটু কড়া বোধ হইয়াছিল।

শুনিলাম এবারে নাকি নিপুণতা আরো বহু সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। সন্ধ্যাপর তাঁহার বাটীতে পুনর্ব্বার আসিয়া বাদ্য শুনিবার কথা ধার্য্য হইল তখন বিদায় লইলাম। কিন্তু নানা স্থানে গমন ইত্যাদি কারণে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পর আর তাঁহার বাটীতে যাইতে পারি নাই, পরদিন কাশী হইতে চলিয়া আসা হয়, এজন্য তাঁহার বাদ্য শুনিবার সুযোগ না হওয়াতে দুঃখিত আছি।

তথা হইতে তিনজনে বারাণসী দোপাট্টা শাল কিন্‌খাপ ইত্যাদি যে সব কারখানায় বুনানি হয়, তথায় যাইয়া ঐ চির প্রসিদ্ধ শিল্পকার্য্যের প্রকরণ ও তাঁতবোনাদি দেখিলাম। শিল্পীরা তাবতেই জোলা-মুসলমান। এমন হিন্দুয়ানির রাজধানী কাশীতে হিন্দুদের ব্যবহার্য্য এমন প্রধান শিল্পকার্য্যে কেন যে হিন্দুকারিকরের এত অভাব, ইহার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বহুজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াও সন্তোষজনক সদুত্তর পাইলাম না।

তথা হইতে পাতালেশ্বর শিব দেখিয়া রাণা মহলে গেলাম। তথায় আমার পিস্-শ্বাশুড়ী কাশীবাস করিয়া আছেন। সহরের ভিতর যে রাস্তা তাহা হইতে কয়েকটী ধাপ উঠিলে এবং ক্রমে কিছু উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তাঁহাদের বাসগৃহ। কিন্তু গঙ্গাধার হইতে সে গৃহটী ত্রিতল। কাশীতে বহুস্থানের গঙ্গাতীরস্থ বাটী এইরূপ—গঙ্গা হইতে ত্রিতল চারিতল যে পুরীকে দেখায়, সহরের দিগ্ হইতে গেলে তাহাকে যেন সমতল ভূমিস্থ একতলা গৃহ বলিয়া জ্ঞান হইবে। ঐ বাসা বাটী বারাণ্ডায় গিয়া দেখি যে গঙ্গার ধারে তাহার নীচে যে ঘাট দু তিন তালা নীচে, সে গৃহের নীচের তলা যে কেবল পোস্তা তাহা নহে, নীচের তলাতেও সুন্দর গৃহ, তাহার জানালা ও বারাণ্ডা আছে, কেবল সহরের ভিতরের দিগে কিছু নামিয়া সে গৃহের মধ্যে বা তাহার প্রাঙ্গণে যাইতে হয়। না দেখিলে তাহার ভাব বুঝা ভার। তথায় আমার পিস্‌শ্বাশুড়ী ব্যতীত অন্যান্য প্রাচীনা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বিধবারা একত্রে বাস করেন; প্রত্যেকেই আপন আপন ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, আপনারা পাক করেন, তবে আমার পিস্‌শ্বাশুড়ীর ন্যায় অসমর্থা স্থবিরারা ব্রাহ্মণ কন্যার পাকে ভোজন ও সমর্থাদিগের শ্রমসাহায্য গ্রহণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন। ঐ পাড়ার নাম চৌষট্টী যোগিনী পল্লী। তথায় সন্ধ্যা হইল; বাটী ফিরিলাম।

উপরে একটি উল্টা পাল্‌টা বর্ণনা হইল। অর্থাৎ ঐ রাণামহলে যাইবার পূর্ব্বে সীতারাম পালধি মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে যে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তাহা লিখিতে ভুল হইয়াছে। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন কাশীতে আসি, তখন ঐ সীতারাম বাবুর সহিত বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছিল। তৎকালে ভারত প্রসিদ্ধ কবিবর ও প্রভাকর সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও কাশীতে ছিলেন। আমি তাঁহারই সাথে এক বাটীতে ও একাম্নে বাসা করিয়াছিলাম। আমাদের বাসায় কাশীর সকল বড় বড় বাঙ্গালী বাবুই প্রায় সর্ব্বদা আসিতেন। যেহেতু ঈশ্বর বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় ক্রীড়া কৌতুক

করা সর্ব্বদা সকল শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বাঙ্গালীর সুখের কাজ ছিল। ঈশ্বর বাবু যেমন কবি, তেমনই সদালাপী, আমোদী, ক্রীড়া প্রিয় ও সৌজন্যশালী ছিলেন। তিনি যখন যেখানেই যাইতেন বা থাকিতেন, তখন তথা এই বিবিধ শ্রেণীর লোকের সমাগম এবং নানা আমোদ প্রমোদ হাস্য কৌতুক তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। কাশীতে ৭।৮ মাসেরও অধিক প্রবাস (আমার প্রায় ছয় মাস, তাঁহার আসার ২।৩ মাস পরে আমার আসা হইয়াছিল) করাতে তাঁহারই বাসভবন কাশীর মধ্যে প্রধান আমোদের স্থল হইয়াছিল। দিবাভাগে তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি ক্রীড়ায় অসম্ভব আমোদ নানা বিষয়ক কথোপকথন কবিতায় তরঙ্গ, রঙ্গরসের স্রোত, সকলই প্রায় ছিল। এজন্য শুধু দেখা শুনা উদ্দেশ্যেও যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু সীতানাথ পালধি মহাশয় একজন প্রধান। পালধি মহাশয় বড় ভালো লোক, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবলে বাঙ্গালী টোলায় প্রসিদ্ধ। সেই বৎসর ৺শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে কাশীতে সখের দুইটি কবির দল হয়। একদলের নাম কাশীবাসী দল অন্য দলের নাম মথুরাচ্ছত্রের দল। পালধি মহাশয় এবং শীতলপ্রসাদ গুপ্ত শেষোক্ত দলের প্রধান উদ্যোক্তা কর্ত্তা ছিলেন। কাশীবাসীর দলে ঈশ্বর বাবু গান বাঁধেন এবং মথুরাচ্ছত্রের দলে আমি গান বাঁধি। সেই সূত্রে পালধি মহাশয়ের সহিত তখন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যদিও তিনি আমার অপেক্ষা ১০।১১ বৎসর বয়সে বড়, তথাপি বিলক্ষণ আত্মীয়তা হইয়াছিল। তাঁহাকে ঠাকুর দাদা বলিয়া ডাকিতাম।

অদ্য আবার তাঁহার নিকট গিয়া সেই পুরাতন আত্মীয়তার পঙ্কোদ্ধার করা গেল। এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, অন্যত্র গমনাগমনে বড় সমর্থ নন, কিন্তু বসিয়া বসিয়া খুব সজোরে যেরূপ কথাবার্ত্তা কহিলেন; তাহাতে খুব জ্বরাগ্রস্ত স্থবির বলিয়া বোধ হইল না। নানা কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম বিজ্ঞতায় "দুধটুকু মরিয়া ক্ষীরটুকু" হইয়াছেন। ঠাকুরদাদা রঙ্গরসও ছাড়েন নাই। তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তথা হইতে ঐ রাণামহলে গিয়াছিলাম।

চৌষট্টী যোগিনীর পাড়া হইতে বাসায় গিয়া দেখি দরজী বসিয়া আছে। তাহাকে নেটের মশারি একটা সেলাই করিতে দিয়াছিলাম, তাহাই আনিয়াছে। সেই সময় বাটী হইতে বেরোন গান ডাকযোগে পোঁছিল। এবং শিবপুর নিবাসী বাবু রামচন্দ্র সরকার মহাশয় দেখা করিতে আইলেন। ইনি বিজ্ঞ ও প্রাচীন কবি, কবিগানের কবি। এক্ষণে কাশীবাসী হইয়াছেন। আমারও কবিতা রচনায় খ্যাতি আছে, তাহা তিনি দেশে থাকিতেই জানিতেন। আমার রচনার প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ, তাই আমি কাশী আসিয়াছি শুনিয়া কয়েকদিন ধরিয়া দেখা করিতে আসিতেছেন। সন্ধ্যার পর তাঁহাকে বিদায় করিয়া জলযোগান্তে পরদিন যাত্রার জন্য জিনিসপত্র প্যাক করা গেল। সেদিন কাটিল।

২৩ শে মাঘ; রবিবার ১২৯৪। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮

অদ্য ১০টায় গাড়ীতে কাশী ছাড়িয়া মঙ্গলসরাই আসিয়া এক ঘন্টারও অধিক অপেক্ষা করিতে হয়। অভিপ্রায় কলিকাতার মধ্যাহ্নিক ট্রেন আইলে তদারোহণে মির্জাপুর যাওয়া। কিন্তু ট্রেন বড়ই লেট হইল—ঐ ট্রেনটা প্রায়ই লেট হয়। যে সময় প্লাটফরমে অপেক্ষা কবি, সেই সময় নিম্নলিখিত গানটী রহস্য স্থানে অন্যমনস্কভাবে গাইয়া ফেলাতে আমার স্ত্রীর অনুরোধে তাহাকে লিপিবন্ধ করণার্থ স্মরণ রাখিলাম—

রাগিণী—জংলা। তান—পোস্তা।

ওরে; অষ্টাহ বাস ক'রে তোরে ছাড়িলাম কাশী!
ভাল ক'রে তোরে যেন দেখি ফের আসি!
যাত্রা করি বিন্ধ্যাচলে, সবাই যেন রই কুশলে,
মথুরা প্রয়াগ, গোকুলে, (এখন) যেতে বড় মন্ উদাসী। ১॥
সিদ্ধিদাতা গণাই দাদা; পথে না দেন বিঘ্ন বাধা,
আপনার যেমন পেটটী নাদা (দেখ্তে) বরেনেরে তাই ভালোবাসি ২॥
অথবা (কারণ বরেনকে তাই ভালবাসি। ২॥)

ঐ গানটি গাইতে গাইতে দেখি উপর অঞ্চলের গাড়ি আসিয়া থামিল। কত লোক নামিল। উরির মধ্যে একজন ভদ্রলোক আমার নিকটস্থ হইলে উভয়েই যেন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম, অথচ তখন বিন্দুমাত্র চিনিতে পারি নাই। পরস্পরের নাম ধাম জিজ্ঞাসাতে আমি দৌড়িয়া উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিলাম ও আপন নাম বলিয়া পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনে বন্ধ হইলাম। ইঁনিই কাশীর সেই শীতলপ্রসাদ গুপ্ত, যাঁহার কথা ইতিপুর্ব্বেই বলিয়াছি। [প্রথমবার যখন কাশীতে আসি, সে ৩৮ বৎসরের কথা; তখন ইঁহার সহিত খুব আত্মীয়তা ও প্রণয় হইয়াছিল। পরে তিনি এলাহাবাদে গবর্ণমেন্টের অনুবাদক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকাতে বহুকাল তথায় সপরিবারে বাস করিতেছেন।] এখন তিনি পেন্সন পাইতেছেন এবং অপরাপর কর্ম্মেও অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্রটীর (একশত টাকা বেতনে ঢাকাতে কর্ম্ম করেন) ভয়ানক পীড়া (Thisis) হওয়াতে তাঁহার চিকিৎসার্থ কাশীর নিজ ভবনে লইয়া যাইতেছেন। গাড়ীতে তাঁহাকে শয্যাগত ও অতিশয় জীর্ণ-শীর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। শীতল বাবুর ন্যায় সদানন্দ, সদালাপী ও সজ্জন ব্যক্তির এরূপ নিদারুণ মনস্তাপ কেন ঘটিল, ঈশ্বরই বলিতে পারেন। সঙ্গে স্ত্রী; কন্যা, পুত্রবধূ ও অপর দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের নিকট কত গৌরবে আমারপরিচয় দিয়া আলাপ করাইয়া দিলেন। দুঃখের মধ্যে আলাপ ক্ষণিক, কেননা তৎক্ষণাৎ আমাদের গন্তব্যস্থলের গাড়ি আইল। বিষাদে বিদায় লইতে বাধিত হইলাম। আবার যদি এহাবাদে দেখা হয় তো বলিতে পারি না। ইনি কয় বৎসর পুর্ব্বে এলাহাবাদ হইতে আমাকে এতন্মর্ম্মে এক পত্র লিখেন যে "বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পক্ষে কন্যাদায় এখন মহাবিপদ হইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্ব-

স্বাস্ত ও অসম্ভবরূপে ঋণগ্রস্ত না হইলে আর মেয়ে পার করা ঘটে না, ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই উচিত। আমি এলাহাবাদে তজ্জন্য একটী সভা স্থাপনের যত্ন করিতেছি। কিন্তু রাজধানী কলিকাতায় একটী মহাউদ্যোগ না হইলে নিম্নতর স্থানের চেষ্টায় কি হইবে। আপনি ঈশ্বরানুগ্রহে এক্ষণে কলিকাতায় একজন গণ্য মান্য লোক; তথাকার বড় বড় লোকের সাহায্যে মুন্সি প্যারেলালের অনুকরণে যদি কিছু করিয়া উঠিতে পারেন তো স্বীয় সমাজের অশেষ মঙ্গল করা হয়।" ইত্যাদি ইংরাজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি পীড়িত অবস্থায় প্রায়ই স্বীয় গ্রামে থাকিতাম। এ যদি আরো কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, যখন আমার মধ্যস্থ কাগজের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যখন জাতীয় সভায় আমি একজন প্রধান বক্তা ও সাহায্যকারী রূপে গণ্য হইতাম এবং যখন প্রায় সকল বড় লোকের সহিত সম্ভাব ও তাঁহাদের নিকট গমনাগমন ছিল, তখন এই মহৎ বিষয়ের এরূপ মহৎ প্রস্তাব হইত, তাহা হইলে হয়তো কতকটা করিয়া ফেলা যাইত। তাহাও সন্দেহের বিষয়, কেননা আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে বাঙ্গালীর দ্বারা বচন হয়, প্রকৃত কোন ভাল কার্য সিদ্ধ হওয়া এখনও বহুদূরবর্ত্তী কাল সাপেক্ষ। বহুপুরুষানুক্রমিক জাড্য, ও স্বার্থপরায়ণতা চলিয়া আসিয়া হাতে হাতে স্বদেশহিতৈষিতায় বিপরীত ভাব ঘুণ ধরার ন্যায় লাগিয়া রহিয়াছে, এখন কি দুই চারি পাতা ইংরাজী পড়িয়া সেই সব পৈতৃক রোগ এককালে সারিতে পারে। তবে এইরূপ চেষ্টা ও শিক্ষা ও অভ্যাস ক্রমশ হইতে হইতে দেশের ধাতু পরিবর্ত্তিত হইয়া ভালর দিগে দাঁড়াইতে পারে। অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু চেষ্টা না করিলে ধাতুসংশোধন হইবে কেন? অতএব এই মর্ম্মে তখন শীতলবাবুর জবাব দিয়াছিলাম। অদ্য সে কথাও উঠিল। এই ৩৮ বৎসরের মধ্যে সেই চিঠি ও পরস্পরের সংবাদ লোকের মুখে শুনা ব্যতীত দেখা সাক্ষাৎ আর ঘটে নাই—যৌবন হইতে দুজনেই বুড়া হইয়াছি, সুতরাং দর্শনান্তে চিনিতে পারা অসম্ভব। শীতল বাবুর নিকট খুব সত্বর বিদায় লইয়া আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। অনেক জিনিষপত্র তজ্জন্যই এবং গোলমালওয়ালা গাড়ীতে না উঠিতে হয় অথবা আমাদের গাড়ীতে গোলমাল না ঘটে, এই অভিপ্রায় সিদ্ধি উদ্দেশ্যেই অত তাড়াতাড়ি। নচেৎ হায় আরো কয় মিনিট প্রিয় শীতলবাবুর সঙ্গে প্রিয় আলাপ চলিত। গাড়ী ছাড়িল; যথা সময়ে মুজাপুর পৌঁছিল, চন্ডালগড়ে আর নামা হইল না, গাড়ি মধ্য হইতেই চুনারের সুপ্রসিদ্ধ উত্তম দুর্গটি স্ত্রীকে দেখানো হইয়াছিল। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে কাশী হইতে নৌকাযোগে আসিয়া সে দুর্গ দেখিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর তো দেখা ঘটে নাই, এজন্য প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে কোনো সুযোগ তথায় পুনর্ব্বার গমনের ইচ্ছা রহিল।

মঙ্গলসরাই হইতে যে গাড়ীতে মুজাপুর যাই, সেই গাড়ীতে অপর এক ভদ্র বাঙ্গালী যুবক একটি প্রাচীনা সহিত ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের আলাপ হইল।

যুবকটীর নাম গুরুপদ মুখোপাধ্যায়। তিনি এলাহাবাদে কর্ম্ম করেন, তাঁদের আদিবাস রিসড়া। অধুনা তাঁহার পিতা কাশীবাস করেন, পিতৃদর্শনার্থ তিনি কাশী গিয়াছিলেন এখন আবার এলাহাবাদ যাইতেছেন। মুজাপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া আমি কথায় কথায় তাঁহাকে বলিলাম যে, "অদ্য মুজাপুর নামিয়া তথা হইতে এককালে বিন্ধ্যাচলে যাইবার ইচ্ছা ছিল, তজ্জন্য কলিকাতাস্থ বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (রেজিষ্ট্রার) মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর কর্ম্মচারীর উপর কাশী হইতে এক সুপারিস পত্র আনিয়াছি। প্রতাপবাবুর মাতা এখন বিন্ধ্যাচলে বাস করিতেছেন, হয় তাঁহার বাটীতে আমাদের রাত্রি যাপনের স্থান দিবেন, নয়তো অন্য কোনো স্থানে থাকিবার সুবিধা করিয়া দিবেন, ইহাই ঐ অনুরোধ পত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু বিন্ধ্যাচলে তাঁহারা কোন্ দিগে কোন্ পাড়ায় থাকেন, তাহার কিছুই জানি না, রেলের গাড়ী যদি ঠিক নিয়মিত সময়ে মঙ্গলসরাইতে বা মুজাপুরে আসিয়া পেঁছিত, তবে দিনে দিনে গিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান খুঁজিয়া লইতে পারিতাম। তাহাতো আর ঘটা ভার, এখন তো তিনটা, মুজাপুর ষ্টেসনে নামিতে ও কিছু জলযোগ করিয়া গাড়ী ভাড়াদি করিতে সাড়ে তিনটার অধিকও হইতে পারে। শীতকালের বেলা, দেখিতে দেখিতে অবসান হইবে। স্ত্রীলোক ও বালক সঙ্গে রাত্রিকালে অজানিত স্থানে কিরূপে ঘুরিয়া বেড়াই? বিশেষতঃ শুনিয়াছি, বিন্ধ্যাচলে বাঙ্গালী আর নাই। যা কিছু বাঙালী তা মুজাপুরে। তাইতো এখন করি কি? আপনি এদেশে অনেকদিন আছেন, মুজাপুরে রাত্রি কাটাইতে পারি এমন ভাল সরাই কি অন্যস্থান কি জানেন?" তিনি তদুত্তরে অদ্য বিন্ধ্যাচলে গমনের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া মুজাপুরেই রাত্রি যাপনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তথায় যে সরাই আছে, বলিলেন "তাহা আপনাদের ন্যায় ভদ্রলোকের অবস্থানের উপযোগী নহে। আমি যে পরামর্শ দিতেছি, তাহাই করিলে, দেখিবেন পরম সুখে থাকিতে পারিবেন। মুজাপুরে বাবু রতিকান্ত ঘোষ নামক যে ডাক্তার বাবু আছেন, তিনি অতি সদালাপী, সরল ও সজ্জন লোক, আপনি তাহার বাটীতে যান, পরম যত্নে রক্ষিত ও সমাদৃত হইবেন।" তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলাম এবং ষ্টেসন হইতে যে গাড়ী লইলাম তাহাকে ডাক্তারবাবুর ভবনেই যাইতে কহিলাম। গাড়োয়ান এক উত্তম বাটীর দ্বারে গিয়া থামিল এবং বলিল এই ডাক্তারবাবুর বাড়ী। বাটীতে অনেক কষ্টে এক বৃদ্ধ দেশওয়ালাকে পাইলাম। সে কহিল, "ডাক্তারবাবু সপরিবারে কানপুর গিয়াছেন।" হরিবোল হরি! স্মরণ হইল, গাড়ীর যুবক নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন, রতিকান্তবাবু সপরিবারে মুজাপুরেই আছেন। তবে এমন হইল কেন? "Necessity is the mother of invention," বড় দরকারেই বুদ্ধি যোগাইল। জিজ্ঞাসিলাম; "এ ডাক্তারবাবুর নাম তো রতিকান্তবাবু?" প্রাচীন উত্তর দিল, "তা জানি না, ইনি ডাক্তারবাবু।" জিজ্ঞাসিলাম, "নিকটে কোনো বাঙ্গালীবাবুর বাটী আছে?" সে সম্মুখস্থ এক বৃহৎ বাটী দেখাইয়া দিল। তথায় গেলাম। অনেক ডাকাডাকির পর এক যুবা বাবু উপরের গবাক্ষে হাস্যমুখে

দেখা দিলেন। আত্ম অবস্থা তাঁহাকে বলাতে তিনি বলিলেন, "রতিকান্তবাবু হাসপাতাল বাটীতেই থাকেন, সম্মুখের বাটী তাঁহার নয়, অন্য ডাক্তারের।" তখন তাঁহার নিকট সকট চালককে আনিয়া ঠিকানা বুঝাইয়া বলাতে গাড়োয়ান মিয়া গমর গমর করিতে করিতে এবং বেশী পয়সা স্বীকার করাইয়া সেই city হাসপাতালে লইয়া' গেল। এই ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম, হাসপাতাল বাড়ীর মধ্যে কেমন করিয়া থাকিব, তবে রতিকান্ত-বাবু সপরিবারে আছেন, দেখা যাউক কি হয়। হাসপাতালটী প্রকাণ্ড স্থান ব্যাপিয়া। ফটকের মধ্যে গাড়ি প্রবেশিয়া দক্ষিণে হেলিয়া কিছুদূর গিয়া এক বৃহৎ বাংলোর সম্মুখে থামিল। শুনিলাম ঐ বাংলোই ডাক্তারবাবুর আবাসস্থান। নামিলাম, একটি বেহারাকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, বাবু সপরিবারে বিন্ধ্যাচলে গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় বা পরেই আসিবেন। অন্তঃপুর হইতে এক প্রাচীনা পরিচারিকা (কিন্তু পায়ে কাঁসার ঘুমুরওয়ালা পাঁয়জোর ও মল) আসিয়া হিন্দী ভাষায় মহাযত্নে আমার স্ত্রীকে গাড়ি হইতে নামাইয়া বাটীর ভিতর যাইতে আহ্বান করিল। বোধ হয়, তাহারা ভাবিল, আমরা বাবুর কোনো অন্তরঙ্গ হইব। যাহা হউক বেলা বেশী নাই; কোথায় আর বাসা খুঁজি, যে ভাব ভাবিয়াই হউক যখন বাটীর পরিচারক ও পরিচারিকা এত যত্ন দেখাইতেছে, তখন হাতের লক্ষ্মী আর পা দিয়া ঠেলা উচিত বোধ হইল না। আমরা নামিয়া বাটীর মধ্যে গেলাম এবং জিনিষপত্রও নামাইয়া বাহিরের কতক জিনিসপত্র বাটীর মধ্যে লওয়া হইল। তখন রতিবাবুর পরিবারেরা কেহই বাড়ী ছিলেন না; সুতরাং আমি অনায়াসে বাটীর মধ্যে যাইয়া আমার স্ত্রীর অবস্থানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলাম। বাটীর সকল ঘরেই চাবি বন্ধ, সুতরাং ভিতর বাটীর নীচের বারাণ্ডায় (খুব পরিসর ও নিতান্ত মুক্ত নয়) স্ত্রী দ্রব্যাদি সহিত রহিলেন, সংগে আমাদের নিজের বিছানা জলখাবার প্রভৃতি ছিল, সকলেই হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিলাম। তাহাদের রন্ধনশালায় চাবি দেওয়া ছিল না, পানীয় জলের অভাব হয় নাই। চাকর চাকরাণীও অন্যবিধ জলের সরবরাহ প্রভৃতি সাধ্যমত সকল সুশ্রূষাই করিল। জলযোগান্তে বরেন্দ্রকে লইয়া বাহিরে গেলাম। বাহিরের বারাণ্ডায় তক্তাপোষাদি বসিবার আসন ছিল, উত্তমরূপে উপবিষ্ট হইয়া তামাকুটের ধূম্র-সেবনাদি স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। মতিলাল নামক ক্ষীণ মস্তিষ্ক এক কায়স্থ যুবক আসিয়া বিস্তর যত্ন করিল। পরিচয়ে বুঝিলাম, এন্ট্রান্স পাস করিয়া I.A. পাসের পরীক্ষার পড়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে পড়িয়া পড়িয়া এ দশা ঘটিয়াছে। পিতা ভ্রাতা কেহই নাই, ঐ রোগ জন্মিবার পর মাতা মরিয়াছেন। এক মাতুল আছেন, তাহার নাম করিলে মতি মুখ বিকৃত করে ; বলে; "এর কথা আর বলবেন না।" রতিকান্তবাবু তাহার কেহই নন, তথাপি দয়া করিয়া আহার দেন, সে তার মাতৃ ভবনে গিয়া শয়ন করে। রতিবাবুর দয়ালুতার আরো প্রমাণ পাইলাম। ১২/১৩ বৎসর বয়স্কা গৌরবর্ণা হিন্দু-স্থানী এক বালিকা পুনঃ পুনঃ আসিতে যাইতে লাগিল। প্রতিবারেই তাহার মুখে হাসি ও চক্ষের এক প্রকার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাহার মস্তিষ্কও সম্পূর্ণ সুস্থ

নয়। জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম, তাই বটে, তাহারও পিতা মাতাদি নাই, স্বামী আছে কিনা ঠিক কেহ বলিতে পারিল না—সে নাকি দূরস্থানীয় শ্বশুরগৃহ পলাইয়া আসিয়াছিল। রতিবাবু দয়া করিয়া খাইতে পরিতে থাকিতে দেন। সংসারের কাজ কর্ম্ম প্রায় কিছু করে না। কিন্তু তাহাকে কার্য্য বিশেষে নিযুক্ত রাখা উচিত, যেহেতু সে তেমন পাগল নয়, একটু চঞ্চলমতি এই পর্য্যন্ত, কাজে নিবিষ্ট থাকিলে তাহার ভাল হইতে পারে। একথা আমি ব্যক্ত করিয়া বলিয়া আসিয়াছি। রৌদ্র পড়িলে বরেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সহর ও গঙ্গাতীর ভ্রমণ করিয়া আইলাম। সহরটী মন্দ নয়; কিন্তু রেলওয়ের পূর্ব্বে যৎকালে জলপথেই সে অঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিকাংশই নির্ব্বাহিত হইত, তখন এই মুঙ্গাপুর যেমন উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের কেন্দ্রস্থল, সুতরাং মহৈশ্বর্য্যশালী একখানি প্রধান নগরী ছিল, এখন বহু বহু গুণে তাহা কমিয়া গিয়াছে। মুজাপুরের ব্যবসায় এখন চতুর্দ্দিগে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ নগর যে কোনো প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান, তাহা নহে, ইংরাজ আমলেই ইহার শ্রীবৃদ্ধি—সেই শ্রীবৃদ্ধি খুবই হইয়াছিল এবং ইংরাজের পূর্ব্বে এস্থলে অসংখ্য ধনী বণিক ও মহাজনগণের কুঠি ও বাসস্থান ছিল; এখন তত নাই—শুনিলাম ষোড়শ অংশের একাংশও নাই। ইহার গঙ্গাতীর ভ্রমণের সুবিধা দেখিলাম না, তবে অভ্যন্তরে পরিষ্কার। রত্ন সকল মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা সুরক্ষিত বটে। "মন্দিরাদি কাশীর অনুকরণে, তেমন ঘাট কিন্তু একটীও দেখিলাম না, হয়তো অন্যভাগে দু একটা থাকিতে পারে। হাসপাতালের নিকটেই প্রকান্ড এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছে; জিজ্ঞাসাতে উত্তর পাইলাম "ঘণ্টাঘর।" বুঝিতে না পারিয়া তথায় গেলাম। দেখিলাম একটী সুন্দর বাটী ও দালান, সম্মুখে ও আশেপাশে পরিপাটী পুষ্পবাটিকা ও ইঁদেরা—মালিরা ফুলবাগানে বেড়াইতে দেখিয়া এবং আমার নাতি সস্পৃহ নয়নে এবং বাক্যেও দুই একটী ফুল পাইবার লালসা প্রদর্শন করিতেছে বুঝিয়া প্রধান মালী একটী বড় ফুল তুলিয়া আনিয়া দিল। জানিলাম স্থানটী আর কিছুই না, মিউনিসিপাল বাটী অনরেরি মাজিস্ট্রেটদিগের সভা ও বিচার স্থান এবং স্তম্ভটি চুঙ্গি অথবা octroi সম্বন্ধীয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার হাসপাতাল মধ্যে প্রবেশিয়া দেখি প্রকান্ড কম্পৌন্ডের এক কোণে এক পাকা ঘর, তাহারই কাছে তখন অনেক লোক জড় হইয়া কি তামাসা যেন দেখিতেছে। নিকটস্থ হইয়া দেখি, দিব্য চুনকাম করা সেই উচ্চ একতলা ঘরটীর জানালায় (জানালাটী মাটি ছাড়া কিছু উর্দ্ধে স্থিত) বসিয়া দিব্য এক শ্রীমান যুবা পাগল হাসিতেছে ও নানা বক্তৃতা করিতেছে। বহুলোক একত্র হইয়া সেই তামাসা দেখিতেছে। পাগলের বয়স ২৫।২৬ বৎসর হইবে, বর্ণ গৌর, মুখশ্রী অঙ্গ সৌষ্ঠব সুচারু; গোঁপ যোড়াটী ও মাথায় কেশ ভদ্রজনোচিত, কেবল বিন্যাস অভাবে যাহা কিছু এলোথেলো; কান্ডে দৃষ্টি বিলক্ষণ; দেহ সম্পূর্ণ সবল ও কর্ম্মঠ; দন্ত দুপাটি আরক্তিম-শুভ্র ও সুশ্রেণীবদ্ধ, গলায় পৈতার গোছা কিন্তু ধবল নয়;

ওষ্ঠাধরযুগল পরম সুন্দর, তাহাতে হাসি যেন লাগিয়া রহিয়াছে—সে হাসি কি মধুর কি মনোহর। এমন ব্রাহ্মণ যুবকের এই বয়সেই এমন শোচনীয় পীড়া দেখিয়া বুক ফাটিতে লাগিল। চতুর্দ্দিগের লোকের সহিত উত্তম হিন্দিতে কথা কহিতেছিল, আপনি হাসিতেছিল, তাহাদিগকেও হাসাইতেছিল। তাহার একজন রক্ষক আমার নিকট আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল, "পাগল বেশ ইংরাজী জানে, আপনি ইংরাজী কথা বলুন না।" শুনিয়া আর চেহারা দেখিয়াই বুঝিলাম যুবকটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। একটু নিকটে গিয়া ইংরাজীতে নাম ধাম ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সকল প্রশ্নেরই সদুত্তর দিল, কেবল—কিছু বেশী ও কথায় কথায় এবং মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের তাহাকে আটক রাখা অন্যায় এই ভাবের অনেক এলোমেলো কথা "মাতা ভ্রাতা আছেন, বিষয় সম্পত্তি আছে, ফার্ষ্ট আর্টস ফেইল হইয়াছিলাম, কুসঙ্গে পড়িয়া মদ খাইয়া পাগল হইয়াছি।" ইত্যাকারের পরিচয় ইংরাজীতে দিল। অনেকক্ষণ ইংরাজীতে অনেক কথোপকথন হইল; ইংরাজীও বিশুদ্ধ ও অনর্গল কহিতে পারে। ঘুরিয়া তাহার দ্বার যাইতে আমাকে অনুরোধ করিল, আমি গেলাম, সে দিগে থামওয়ালা বারাণ্ডা দ্বারে লৌহ রেল, তন্মধ্য হইতে বিস্তর কথা কহিল। আমি যত বলি তোমার যে মহৎ পীড়া হইয়াছে, তাহা যখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তখন কেন এত বাচালতা কর এবং যাহার তাহার সহিত এত অধিক কথা কও। তদুত্তরে বলিল—"বেশী কথা না কহিলে প্রাণ কেমন করে। বিশেষতঃ আটক করিয়া একা রাখিয়াছে, সুযোগ পেলেই লোকের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করে। আপনি ডাক্তারবাবুকে বলিয়া কহিয়া যদি ছাড়িয়া দিতে পারেন, তবে আমি আবার সহজ মানুষ হইয়া বেড়াই। এই দেখ, ছিন্ন বস্ত্র, গায়ে কম্বল, ইহা কি আমার পক্ষে সঙ্গত?" ইত্যাদি শুনিয়া রক্ষককে বলিলাম, "এত লোককে এত বাজে জড় হইতে ও উহাকে বকাইতে দেওয়া তোমাদের উচিত নয়। ঠিক যেন চিড়িয়াখানায় তামাসা দেখাইতেছে। উহাতে উহার পীড়া বোধ হয় আরো বাড়ে। অতএব লোকজন তফাৎ করিয়া দেও।" আমি ডাক্তারবাবুর বন্ধু, উহা ভাবিয়া ভয় পাইয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ লোকজনকে তাড়াইয়া দিল। আমি good evening বলিয়া পাগলের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আইলাম। ভাবিলাম মদে কিভাবে দেশ ছারখার করিল। এবং পরীক্ষার পাঠাভ্যাস জন্য শরীর নষ্ট করিয়া ফেলাতে দেশে সামান্য অনিষ্ট ঘটিতেছে না। ইত্যাদি ভাবে বিষন্ন মনে বাসায় প্রবেশ করিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যে রতিবাবুর বাসায় ঐ তিন পাগল ব্যতীত আরো একজন পাগলের সহিত রাত্রে আলাপ হইয়াছিল, সে ব্যক্তিও বাঙালী, সে যোগ যাগ ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া পাগল। তদ্বাদে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দুই শিক্ষিত শিষ্যও ঐ বাসায় রাত্রে আইলেন; তাঁহাদের কথা পরে হইবে; যদিও তাঁহারা পাগল আখ্যা পান নাই, কিন্তু এক প্রকার পাগল বটেন।

কিঞ্চিৎ পরেই রতিবাবুর পাঁচখানি গাড়ি আসিয়া দ্বারে লাগিল। তখন সন্ধ্যা

অতীত। স্ত্রীলোকেরা নামিবেন বলিয়া আমি একটু দূরে গিয়াছিলাম। যথা সময়ে রতিবাবুর নিকটে গিয়া যে সূত্রে যে কারণে আসা সকলই সংক্ষেপে বলিলাম। আমার নাম ধামাদি কতক অবগত হইয়া মহা সমাদরে গৃহে লইলেন এবং আমার স্ত্রী ও পৌত্রের কোনোরূপ কষ্ট না হয় তাহা বলিয়া পাঠাইলেন। আরো আলাপ পরিচয়ে তিনি আমাকে রামাভিষেকাদির লেখক বলিয়া জানিতে পারিয়া এবং তাঁহার শ্বশুরের সহিত আমার কুটুম্বিতা প্রভৃতি কয়টা ঘনিষ্ট সম্পর্ক বাহির হওয়াতে খাতির যত্ন ও অনুরাগাদি ক্রমেই বাড়িল। রাত্রে তাঁহার ওস্তাদজীকে আনাইয়া প্রায় দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাদ্য হইল। ওস্তাদজী মুসলমান হইলেও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গানও উত্তম জানেন, কমলাকান্তজী, দেওয়ানজীর রামপ্রসাদী এবং জয় দেবী প্রভৃতি অতিসুন্দর গাইতে লাগিলেন। মুসলমান হইয়া এবং বাঙ্গালা সংস্কৃতাদি মূলে না জানিয়াও এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ গান গাওয়া শুনিয়া আমি অবাক ও সুখী হইলাম। আমার আমোদে তাহাদের সকলেরই মহা আনন্দ জন্মিল। রতিবাবু নিজেও ওস্তাদজীর নিকট গান শিখিতেছেন এবং তাঁহার এক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী বন্ধু শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমোদ প্রমোদের মধ্যে রাত্রি ১০টায় গেরুয়া অথবা পরিস্কৃত বসন পরিহিত দুই বাঙ্গালী যুবক কলিকাতা হইতে রেলযোগে আসিয়া উপস্থিত। তন্মধ্যে একজন রতিবাবুর আত্মীয়, তাঁহার নাম নৃত্যবাবু, অপরজন ঐ আত্মীয়ের বন্ধু, তাঁহার নাম যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং সমধর্ম্মাবলম্বি। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরের প্রসিদ্ধ পরমহংস ৺রামকৃষ্ণ মহাত্মার শিষ্য। ১০।১৫ জন শিক্ষিত ভদ্র যুবক বরাহনগরের ৺কালীনাথ মুন্সিদের পুরাতন বাটিতে ধর্ম্মসাধন উদ্দেশে একত্র (brotherhood) অবস্থান করিতেছেন, এই দুই যুবক সেই ভ্রাতৃদল সান্নিবিষ্ট দুজনেই বেস লোক, বিশেষতঃ নৃত্যবাবুর (রতিবাবুর আত্মীয়) মুখখানিতে যেন সদাই প্রসন্নভাব ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বিরাজমান। তাঁহাদের সঙ্গে সে রাত্রে কিছুক্ষণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া বুঝিয়াছি, তাঁহাদের গুরুর যেমন ধর্ম্মান্ধতার অভাবে উদারতারই পরিচয় শুনিয়া আসিতেছি, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা সে তেজস্বিতা ও উদারতার অধিকারী হইতে পারেন নাই—পদে পদে তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মবিষয়ে যেখানে সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধবিশ্বাসাচ্ছাদিত অযৌক্তিকতা; সেইখানেই কিছু না কিছু ভক্তিভাব বা গোঁড়ামি দেখা দিয়া অনিষ্ট ঘটায়। ইঁহারাও সেইরূপ ধর্ম্মান্ধতায় অন্ধ হইয়া সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক বরাহনগরে বাটি ভাড়া লইয়া যোগাভ্যাস (অন্ততঃ তাঁহারা মনে করিতেছেন, যোগসাধন) করিতেছেন। হায়! বঙ্গসমাজের এখন কি টলমল অবস্থা! ইংরাজী শিক্ষার আদ্যাবস্থায় নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা হিঁদুয়ানির প্রতি দ্বেষভাব খুব প্রবল হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় অবস্থায় পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অতিরিক্ত ভাবোদ্দীপক শাখায় প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া গোঁড়ামিতে ও হিঁদুয়ানির প্রতি বিদ্বেষে পূর্ণ হওয়াই ফ্যাসন দাড়াইতেছিল। তৃতীয় অবস্থায় হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের প্রতি অযথা অনুরাগ প্রকাশক এক দল, [বিশৃখৃষ্ট]

নামক যোগানুরাগী অপর দল, পরমহংস বা যোগী সন্ন্যাসীভক্ত অপর দল—ইঁহারা প্রকৃত যোগ, প্রকৃত সন্ন্যাস, প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝুন বা না বুঝুন, কিন্তু ধর্ম্মানুরাগে অধীর হইয়া সাহেবেরা ভাল বলিয়াছেন বলিয়া হিঁদুর শাস্ত্র কেহ বা কোনো শাস্ত্র মধ্যে গোটাকতক মনোমত সে শাস্ত্রকে স্বীয় কল্পিত নানা অর্থে সাজাইয়া নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতেছেন, কেহ কেহ বা (প্রকৃত হিন্দু না হইলেও) আড়ম্বরময় হরিসভা করিয়া ও অন্য শতবিধ প্রকারে দেশের সাধারণ মনোরঞ্জন সাধক সহজ পথে বিচরণ করিয়া মতাক্রান্তদিগকে অজস্র গালি দিতে সুযোগ পাইতেছেন। এসব ছাড়া আরো কত প্রকার কান্ডই হইতেছে, তাহার অধিকাংশ দেখিয়া সন্তোষ দূরে থাকুক মহাক্ষোভ ও চিন্তা জন্মিতেছে, এ স্থলে এ প্রসংগ যথোচিত রূপ নির্ণীত ও বিবেচিত হওয়া অসম্ভব, বিশেষতঃ এই দৈনিকলিপি যেরকম তাড়াতাড়িতে লেখা, এবং প্রায়ই বরেন্দ্রভায়া লিখিবার সময় যে উত্যক্ত করে, তাহাতে কোনো বিষয়ই ইচ্ছামত লিখিয়া উঠা দুষ্কর। তবে যখন যাহা দেখা শুনা হয় বা মনে যেসব ভাবতরঙ্গ ক্রীড়া করে তাহাই লিখিয়া রাখতে পারিলেও যথেষ্ট। একে কেবল স্বগত চিন্তার অনুশীলন ও নিতান্ত আপন জনের আমোদ উৎপাদনার্থ লেখা; এতদ্দ্বারা বাহিরের কেহ যে কোনো বিশেষ উপদেশ বা আনন্দ পাইবেন এমন সম্ভাবনা ও অভিপ্রায়ও নয়। প্রায় রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত গান বাদ্য আলাপ কুশলাদি ভাজন শয়ন হইল। বাহিরে আমার প্রতি যেরূপ আদর হইয়াছিল, অন্তঃপুরে রেতিবাবুর বাটীর স্ত্রীলোকেরা ততটা জানেন না। কিন্তু রতিবাবুর নিজের যত্ন প্রকাশের ত্রুটি ছিল না। তাঁহার বাটী যশোহর জেলায়, তিনি আমাদের অঞ্চলেই বিবাহ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ নাই, সেই স্ত্রী এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সে মেয়েটি যে পাত্রে পড়িয়াছে, তাহার একটী পুত্র হইয়াছে। তাহার সহিত কন্যাটি পিত্রালয়ে আছেন, তাঁহার স্বামী লক্ষ্ণৌ নগরে ক্যানিং কলেজে পড়িতেছেন। রতিবাবুর কন্যার নিকট আমার কৃত নাটকগুলি আছে, তিনি আমার লেখার একজন ভক্ত। শয়নের পূর্ব্বে রতিবাবু বলিলেন "অদ্য আমরা বাটী ছিলাম না, রাত্রে বিন্ধ্যাচল হইতে সকলে ফিরিয়া আসাতে আহারাদির আয়োজন করা হয় নাই, অতএব কল্য বিন্ধ্যাচল হইতে মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া আপনাদিগকে আমার বাটী আহার করিতে হই[illegible]।" তাঁহার নিকট তাহাই স্বীকার করিলাম।

২৪শে মাঘ, সোমবার। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১

প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যানন্তর ঘোড়ার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল যাত্রা হইল। মুজাপুর হইতে বিন্ধ্যাচলের নিম্নতীর্থ বা সহরটী প্রায় দুই ক্রোশ এবং তথা হইতে উপরের দেবী স্থানটী অর্দ্ধক্রোশাধিক হইবে। নিম্নভূমিস্থ সহরে দশহাজার লোকের বাস। তত্রত্য মন্দির ও ভোগমায়ার ব্যাপারগুলি অনেকাংশে কালীঘাটের তুল্য। কালীঘাটের নিকটে যেমন কলিকাতা; ভোগমায়ার নিকটে তেমনি মুজাপুর, কালীঘাটে যেমন হালদার

মহাশয়েরা, এখানকার পাণ্ডারাও সেইরূপ। তবে কালীঘাটে যেমন বহু বাঙালী, এখানেও প্রায় সেইরূপ। তবে কালীঘাটে পয়সার কম দেওয়া লওয়া হয় না, এখানে ইংরাজী এক পাই (পয়সার তৃতীয়াংশ) বা আধা পয়সা বা গোরক পুরিয়া ঢিবুলা (পয়সার আড়াইটা) বা কিছু আটা, গম যব, চাউল যাহা কিছু দিলেই হইল। কিন্তু আমরা সে সন্ধান না জানাতে আমাদের গোটা পয়সাই গেল। যখন শিখিলাম তখন আর তাড়াইয়া আনিবার সুযোগ ছিল না। কালীঘাটে যেমন পাঁঠা বলি, এখানেও তাই, তবে এ দুঃখীর দেশে ও নিরামিষভোজীর দেশে সংখ্যাতে অত্যল্পই হইয়া থাকে। অতি কম লোক, তম্মধ্যে বাঙালীরাই অধিক পাঁঠা খান বা বলিদান দিয়া থাকেন। গত রোজ রতিবাবুরা তিনটা পাঁটা বলি দিয়া মহাপ্রসাদ রন্ধন করিয়াছিলেন। কালীঘাটের সঙ্গে অনেক বিষয়ে প্রভেদও লক্ষ্য হইল। তথায় যেমন বহু লোকের পরিষ্কার বাসা পাইবার ও থাকিবার সুবিধা, এখানে তেমনটী নয়। তথায় কাণ্ডকারখানা পূজাদি খুব বাহুল্য পরিমাণে ও বাহুল্য প্রকরণে, এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পতর। কালীঘাটে চণ্ডীপাঠ ও শাস্ত্রয়নাদি খুব জাঁকের, এখানে ততটা নয়, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণে আছে। কালীঘাটের মন্দির খুব বৃহৎ, এখানে তত বড় নয়। কালীঘাটে দেবী থাকেন গহ্বরে, তাঁহার মূর্ত্তি দুর্জ্জননাশিনী বিকট ভঙ্গীর, এখানে বস্ত্রাবৃত দেহের উপর, একখানি ক্ষুদ্র পাষাণবদন মাত্র। শুনিলাম, ইনি চতুর্ভুজা, কিন্তু একখানি হাতও দেখিতে পাইলাম না, দেখিতে চাহিলেও দেখাইল না, ওজর করিয়া কাটাইল। বোধ হয় ছোট ছোট অতি সামান্য চারিখানি হাত লুক্কায়িত থাকিতে পারে। দেবী গহ্বরবাসিনী নন; এক ক্ষুদ্র ও অনুচ্চ ঘরে থাকেন। তাহার চারি দিগে স্তম্ভময় নাটমন্দির সত্ত্বেও ঘরটী কিছু আঁধার বটে। কিন্তু খুব অন্ধকার নয়। ঘরের বাহিরে নাটমন্দির খুব বিশাল, চারি-দিগেই ভক্তজন নানা আরাধনার কাজে ও উপার্জ্জনের কাজে নিযুক্ত। নাটমন্দিরের নীচে পুষ্পফলাদি বিক্রেতা স্ত্রীলোক বিস্তর, বাটীর মধ্যেই নানা জিনিষের দোকান। বাটীর ভিতর দিয়াই গঙ্গার বাঁধাঘাটে যাইবার পথ। আমরা প্রথমে সেই পথ বাহিয়া ঘাটে গেলাম। পুরীর বাহিরে পথের দুধারে পুষ্প, পুষ্পমাল্য, গন্ধদ্রব্য। ভোগের মিষ্টান্ন, রুলি প্রভৃতির বিস্তর দোকান। মাটীর শিশীবৎ একটী পাত্রে এক পয়সার ফুলেল তৈল আনিয়া দিল, আমরা ঘাটের সুন্দর চাতালে রৌদ্রে বসিয়া তৈল মাখিয়া গঙ্গাস্নান করিলাম। তামাকও খাইলাম। পাষাণময় ঘরটী বড়ই পরিপাটি। ঘাটে যাইতে যেন গড়ানিয়া পাতালে নামিতে হয়, গঙ্গাগর্ভ হইতে তীরভূমি এত উচ্চ, স্নানান্তে সেই উচ্চভূমিতে উঠিয়া দর্শন পূজন সমাপনান্তে পুরীর বাহির হইলাম। পুরী হইতে সদর রাস্তা কিছু দূরে, গলিপথের দুই পার্শ্বে ইষ্টক, পাষাণ ও মৃত্তিকাময় খুব ঠেসাঠেসি বিস্তর বাড়ী। রাস্তায় আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া অচলবাসিনী অষ্টভুজা দর্শনে চলিলাম। পথের দুই পার্শ্বে উদ্যানের ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ আম্র, নিম্ব, মৌয়া (মধু) ও পলাশ বৃক্ষাদি সুসজ্জিত। স্থানগুলি অতি রম্য, শস্যক্ষেত্রও

আছে; তাহাতে যব, গম, শর্ষপাদি শোভা পাইতেছে। আমাদের দেশে এ সময় হরিৎ খন্দর শস্য কোন্ কালে গৃহজাত হইয়াছে, উত্তর পশ্চিমের সর্ব্বত্রই এখন সে সব শস্যের নবীন গাছ, বা সবে ফুলিতেছে। এদেশে ছোলা, গম; শর্ষপ, যব, নানাবিধ মটরাদি সকল খুব পাইব এবং বড় বড় বিশাল ক্ষেত্রে সেই সমস্ত শস্যে পুরিপূর্ণ। রাস্তার দুধারে মাঝে মাঝে পাথরের কারখানা, পাহাড় হইতে ছোট বড় রাশি রাশি পাথর আনিয়া কাটিয়া খোদিয়া নানা গড়ন (যথা জাঁতা, শীল, নোড়া চন্দনপীঁড়ি ইত্যাদি স্তূপাকারে) গড়িতেছে, পাথরের তক্তা চিরিতেছে, কড়ি বরগাদি করিতেছে। ইহা মৃজাপুরের বাহির হইতেই আরম্ভ। রাস্তার দুই পার্শ্বে ঐ সকল এবং কথায় কথায় ইঁদারা এবং দূরে পাহাড় ও বৃক্ষাদি ও পাষাণপুরী ও বাংলা প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে মহানন্দে গাড়িতে চলিলাম। অর্দ্ধক্রোশ বা কিঞ্চিদধিক পরেই পাহাড়ের নিম্নে একটী অতি রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটীর এক দিগে বিন্ধ্যাচল, অন্যদিগে প্রায়ই সমতল ভূমি, তদুপরি উদ্যানতুল্য ঐ সকল বড় বড় গাছ; তলদেশ অতি পরিষ্কার, অর্থাৎ জংলা ভাব নয়। দেখিয়া প্রাণ জুড়ায়। পাহাড়ের উপরিস্থিত দেবীস্থানের নিম্ন দেশে ঐপ্রকার বৃক্ষাদি পরিবৃত একটী দীর্ঘ সরোবর ও বৃহৎপুরী দৃষ্ট হইল। পুষ্করিণীর চারিধার পাষাণে গজ্জগিরি ও চতুর্দ্দিগেই উত্তম ঘাট। বিশেষতঃ পুরীর দিগের ঘাটটী যেমন সুন্দর, তদুপরি একটী মুক্ত চাতালও তেমনি বিশাল ও পরিচ্ছন্ন ; তাহাতে যে আলিসা আছে, তাহাও পরিপাটি। পুষ্করিণীর প্রায় চতুর্দ্দিগেই বড় বড় নানা জাতীয় বৃক্ষ কিন্তু খুব নিকটে নয়; কিছু দূরে দূরে থাকাতে ঝোপের মতন না দেখাইয়া অতি সুন্দর পরিষ্কৃত দৃশ্যই হইয়াছে। পুকুর ঝাঁপাইয়া তরুলতার অবস্থানটী আমি দুচক্ষে দেখিতে পারি না—পুকুর (চন্দ্র সূর্য্য পবনকে লইয়া) পুকুরের স্থলেই থাকিবে এবং বৃক্ষবল্লরী সকল (চন্দ্র সূর্য্য পবনকে লইয়া) উদ্যানের স্থলে থাকিবে, ইহা হইলেই দৃশ্যপক্ষে কি স্বাস্থ্যবিধান পক্ষে অতি উপাদেয় হয়। এস্থলে অবিকল তাহাই হওয়াতে আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। এখানে মনুষ্যকৃত ও প্রকৃতিকৃত সৌন্দর্য্য রাশি রাশি একত্রিত হইয়া নিস্তর্জনতার সহিত কি অপূর্ব্ব ক্রীড়াই করিতেছে! স্থানটী যে একবারেই নিস্তর্জন, তাহাও নয়। উপরে দেবীর স্থান থাকাতে তথাকার পাণ্ডারা আভির প্রভৃতি ঘর কতক নিম্নশ্রেণীর লোক নিম্নদেশে বসবাস করে। কিন্তু তাহাদের সেই ক্ষুদ্র, গ্রামখানি পুষ্করিণী হইতে একটু দূরে, তজ্জন্য নির্জ্জনতা ও নির্ম্মলতা অধিক পরিমাণে ঘটিয়া স্থানটী আরো মনোহর হইয়াছে। এক্ষণে ঐ পুরীর কথা। ঘাটের চাতালের কিছু পরে একটী ঝরণা বা পয়ঃপ্রণালীবৎ অল্প গভীর খাদের (স্বাভাবিক খাদের) পর ঐ পুরীটী সুনির্ম্মিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর অভিমুখেই তাহার প্রধান প্রবেশ দ্বার। প্রবেশদ্বার ও খাদের মধ্যে অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান আছে; তাহাতে পুষ্পবাটিকাদি উত্তম হইতে পারে— হয় তো তদ্রূপ কিছু ছিল। ঐ

দ্বিতল পুরী ঐরূপ সুরম্য স্থলে দেখিয়া তথায় বাসের জন্য মন কেমন করিতে লাগিল। সে ভাব ব্যক্ত করাতে আমার স্ত্রী হাসিয়া এবং নাক সিঁটকাইয়া বলিলেন, "কেন বনবাস কর্ত্তে হবে নাকি! জনপ্রাণীর সঙ্গে দেখা হওয়া ভার, ওমা, কেমন ক'রে এখানে প্রাণ টেকবে?" আমি বলিলাম, কথাটা কতক সত্য বটে—গ্রাম নগরবাসিনীদের পক্ষে (বিশেষতঃ বিলাসভোগ ও নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণপ্রিয় লোকের পক্ষে) এরূপ স্থান অসহ্য হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণের কথা যথার্থ বলিতেছি, এরূপ স্থান আমার বড় মনোরথ। এবং নিতান্ত জনশূন্যও নহে, পুরীর পশ্চাতে পাণ্ডাদিগের বাস, এবং আভির প্রভৃতি গো মহিষপালক ও কৃষক কয়েক ঘরও আছে। সেই ব্রাহ্মণ কন্যাগণ ও আহিরিণীগণ তোমার সখী হইবেন। সীতার অনুকরণ কি করিতে পারিবে না? আবার ভোগমায়ার সহর ও মূজাপুর সহর নিকটে, কাহারো সঙ্গে দেখা শুনার ইচ্ছা হইলে অনায়াসে যাতায়াত চলিতে পারে। গ্রন্থাদি রচনার পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান আর পাওয়া ভার। পাণ্ডাগণকে জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম; মূজাপুরস্থ কোনো ধনী মহাজনের এই পুরী, তাঁহারা সপ্তাহে প্রায়ই একবার করিয়া ভোগমায়া ও যোগমায়া দর্শনে আসিয়া এই পুরীতে অল্পবিস্তর অবস্থান করেন। অথবা, থাকিব শুনিলে মহা আহ্লাদের সহিত দুইটী উপরের ঘর প্রভৃতি ছাড়িয়া দিবেন, এক পয়সাও ভাড়া লইবেন না। স্থানের অপ্রতুল নাই, অনেক ঘর এবং বাড়ীটী এমনি পরিষ্কার, যেন হাসিতেছে। ঐ কথা যখন মূজাপুরে ফিরিয়া গিয়া রতিবাবুকে বলি, তখন তিনি বলেন যে, ও নিম্নদেশীয় বাড়ী কেন, আপনি পূর্ব্বাহ্নে লিখিয়া পাঠাইলে আপনাকে পাহাড়ের উপরিস্থিত সুন্দর বাংলা করিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমার তাহাতে বড় মন চায় না—এক তো পাহাড়ের উপর উঠা নামা কষ্টসাধ্য, তায় হাওয়ায় জোর বেশী, তায় অমন বৃক্ষাদি পরিবৃত নয়, তায় লোকজনের বাসস্থান হইতে অনেক দূরে। যাহা হউক, মনুষ্য অবস্থার দাস, নানা প্রকার অবস্থার বশে এতৎ সম্বন্ধে আমার মনের বাসনা যে কখনই সফল হইবে তাহা বোধ হইতেছে না। সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অধিক বাক্যব্যয় বৃথা।

ঐ পুরী ও ঐ মনোহর সরোবর শোভিত স্থানটী অতিক্রমণ করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম। উঠিবার সোপান আছে—পুণ্যপ্রার্থী ধনবান লোক তাহা করিয়া দিয়াছে। উপরে গিয়া দেবী ও মন্দিরাদি যাহা দেখিলাম তাহা অতি সামান্য। চিরকাল বিন্দুবাসিনী বা বিন্ধ্যবাসিনী বা যোগমায়ার নাম শুনিয়া আসিতেছি, ভাবিতাম পাহাড়ে কি অদ্ভুত কাণ্ডই বা দেখিতে পাইব। কিন্তু "বহুরূপ গ্রাহ্য করা কভু ভাল নয়!" অতি সামান্য প্রস্তরের সামান্য গৃহের সামান্য গঠনের এক দেবীমূর্ত্তি এবং আরো পাশে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণের উপার্জ্জন ভাণ্ডার স্বরূপ আরো কয়টী সামান্যতর গৃহ ও মূর্ত্তি আছে মাত্র। নাম অর্দ্ধভুজা, কিন্তু ভুজমাত্রই দেখিতে পাইলাম না, দেহ বস্ত্রাবৃত, মুখখানি যাহা বাহিরে তাহাও কুশিল্পীর গঠিত, হাত দেখিতে চাহিলেও দেখাইল না, উত্তরে কি যে বলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। পার্শ্বে এক

গুহের মধ্যে একটী গহ্বরবৎ স্থান আছে, তথায় এক সাধু বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। যাত্রীরা তাঁহাকে দর্শন দিয়া থাকে।

ঐ দেবীস্থান হইতে "কালী-খ" নামা এক গহ্বর বা গুহা অর্দ্ধক্রোশ দূরে আছে। আমরা পাহাড়িয়া পথে অনভ্যস্ত, পীড়া প্রযুক্ত দুর্ব্বল, সঙ্গে স্ত্রী ও বালক, বিশেষতঃ শুনিলাম সেই অর্দ্ধক্রোশ যাওয়া ভয়ানক কৃচ্ছ্রসাধ্য, সুতরাং যাইতে পারিলাম না। তবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া পাহাড়ের আরো এক উচ্চস্তর পর্য্যন্ত উঠিয়া চতুর্দ্দিগের অপূর্ব্ব শোভা অবলোকন করিয়া লইলাম। দেখিলাম, ঐ কালীঘাটের গুহায় যাইবার জন্য উত্তম সোপান কোনো ধনী সদাগরের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে। মিস্ত্রীরা চুন সুরকীর মসলা যোগে বড় বড় পাথর কাটিতেছে এবং দোকানের উপযোগী করিয়া পাহাড়ের গা কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পুরাইয়া লইতেছে। আমরা তাহারই উপর দিয়া উঠিলাম নামিলাম। সে স্থান ছাড়িয়া ও দেবীস্থান ছাড়িয়া যেমন আমরা নামিতে শুরু করিয়াছি; অমনি বরেন্দ্র "আমি আপনি নামিতে পারিব" বলিয়া আমার হাত ছাড়াইয়া নামিতে লাগিল। একটু নামিতে না নামিতে সহসা পদস্খলন হইয়া ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে সে আশ্চর্য্য সামলাইয়া গেল। ঠিক যেন মা ভগবতী অষ্টভুজা তাহাকে কোলে করিয়া রক্ষা করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিলাম ও পাণ্ডা ঠাকুর তাহাকে উঠাইয়া কোলে লইল। যদিও নামিবার উত্তম সোপান ছিল, তথাপি পাহাড়িয়া ধাপ, পড়িলে যে কি ঘটিত বলা যায় না। যাহা হউক ভগবান সে দিন রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম।

তথা হইতে আসিয়া পুনর্ব্বার রতিবাবুর বাটীতে আহারাদি হইল। আহারান্তে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ষ্টেশনে গিয়া মেল্ ট্রেনে এলাহাবাদ গমন হইল। সন্ধ্যার পর প্রয়াগ পৌঁছিয়া ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে "কর্ণেলগঞ্জ, ক্ষেত্র আদিত্য বাবুর বাড়ী" এই ঠিকানা (আর কিছু তখন জানিতাম না) বলিয়া গাড়ী চড়িলাম। গাড়োয়ান ঠিক জায়গায় লইয়া গেল। জিজ্ঞাসায় ক্ষেত্রবাবুর বাড়ী পাইলাম। খুব গলির ভিতর বাড়ীখানি ভাল করিয়াছেন; কিন্তু যাইবার গলি এত সংকীর্ণ যে অন্য দিগ হইতে অপর ব্যক্তি আইলে উভয়ের দেহকেই সংকুচিত না করিলে চলে না। রাস্তায় গাড়ী ও সঙ্গীগণকে রাখিয়া আমি বরেনকে লইয়া গেলাম। বরেন না গিয়া ছাড়িল না—সর্ব্বত্রই এইরূপ হয়। ক্ষেত্রবাবু তখন বাটীর মধ্যে আহারে বসিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া (আমার শ্যালক) নগেনের বাসায় গিয়া তাহাকে আনিয়া গাড়ীর সহিত আমাদের গ্রামবাসী এলাহাবাদ প্রবাসী বাবু গোপালচন্দ্র বসুর বাসাবাটীতে গেলাম। পথেই গোপালকে পাওয়া গেল। গোপাল খুব যত্নে আমাদিগকে গ্রহণ ও একটী উত্তম ঘর আমাদের বাসজন্য অর্পণ করিল।

এ স্থলে এক শোচনীয় ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। আমার আবাল্যবন্ধু দ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ জীবনের পরম মিত্র ও প্রবল সহায় বাবু বেণীমাধব রুদ্র। তিনি কার্য্যো-

পলকে ক সম্প্রতি বহু মাস ধরিয়া একবার করিয়া আসাম (তিস্তা বা ত্রিস্রোতা নদীর ধারে), একবার করিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করিতেছিলেন। আমি যখন পশ্চিমে আসি, তাহার ২/৩ দিন পূর্বে তিনি আসাম গিয়াছিলেন। সেই ত্রিস্রোতা নদীর ধারে তিস্তা নামক ষ্টেশনে এক জঘন্য পর্ণকুটিরে রাত্রি যাপন করাতে ভয়ানক পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন; এই সংবাদ কাশীত্যাগের পূর্ব দিনেই পাইয়া আসিয়াছি। ঐ আক্রমণ যে এককালে সাংঘাতিক আক্রমণ হইবে; তখন তাহা বুঝিতে পারি নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রাণাধিক প্রিয়বন্ধুবরের ঐ রোগ একবার হইয়া মুখের একদিগ বাঁকিয়াছিল, সুচিকিৎসাতে তাহা আরোগ্য হইয়াছিল। এই ভয়ানক রোগের দ্বিতীয় আক্রমণ যে প্রায়ই সাংঘাতিক হইয়া থাকে, আমি তাহা জানিয়াও ভালরূপে সেটা অনুধাবন করিতে পারি নাই। এলাহাবাদ আসিয়া বাটীর পত্রে তাহার অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তখন তাহা সম্পূর্ণ স্মরণে আইল। তখন হায় হায় করিয়া মরি আর দেশে ফিরিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য কিনা আন্দোলন করিতে থাকি। কাশী হইতেই আমার কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া উচিত ও আবশ্যক ছিল, তখন যখন তাহা করি নাই, এখন করা সুদূর পরাহত। ঐ রাত্রে গোপালের বাটী পেঁছিয়াই বাটী হইতে তাঁহার যে পত্র আসিয়াছে, তাহা পাঠে আরো ব্যাকুল হইলাম। গোপাল বেণীর মাসতুতো ভগ্নীর পুত্র—বেণীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল এবং তাহার পিতামাতা ভগ্নীদের বিস্তর আর্থিক সাহায্য করিত। এখন সেই উপকারী মাতুলের এমন নিদারুণ পীড়ার সংবাদে গোপাল ব্যাকুল হইয়া বাড়ী যাইতে প্রস্তুত। দেশে গোপাল নূতন কোটা বাড়ী করিয়াছে, এখনও সে বাড়ীতে পরিবার লইয়া তাহার একবারও যাওয়া হয় নাই; সুতরাং দেশে যাইবার অভিপ্রায় ছিল। এমন সময় মাতুলের ঐ পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া ১০ দিনের ছুটি পাইয়াছে। পরদিন প্রাতে ৯টার গাড়িতে স্ত্রী কন্যা ভগ্নী চাকর প্রভৃতিকে লইয়া গোপাল স্বদেশে যাইবে, ইহাই শুনিলাম। শুনিয়া সেই সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত মন প্রায় অস্থির হইল। আমার যদি বয়স আরো কিছু কম হইত, কি পূর্বের ন্যায় বল ও উৎসাহ থাকিত অথবা উদরাময় ও অজীর্ণতা রোগে না ভুগিতাম এবং পশ্চিমে আসা না ঘটিত এবং এখনও যদি সেই রোগ না থাকিত, তবে আমি অবিচার্য্যরূপে তৎক্ষণাৎ তাহাদের সঙ্গে (স্ত্রী ও নাতি ও ভৃত্যকে নরেনের কাছে রাখিয়া) বাড়ী চলিয়া যাইতাম। এখন ঐ সব নানা অবস্থার বিবেচনায় তাহা পারিলাম না। কেবল গোপালকে বলিয়া দিলাম যে "তুমি গিয়া তোমার মাতুলের অবস্থা কিরূপ দেখ, দেখিয়া এবং গ্রামস্থ বিজ্ঞ লোকের সহিত (বেণীকে দেখিতে গ্রামের সকলেই আসিতেছেন) পরামর্শ করিয়া আমার তথায় উপস্থিতি যদি খুব আবশ্যক বোধ কর, তবে টেলিগ্রাম করিবে, টেলিগ্রাম পাইবামাত্র আমি চলিয়া যাইব।" কিন্তু হায়! গোপাল কলিকাতায় গিয়া যাহা দেখিল এবং প্রিয়তম বন্ধুপ্রবরের দিন দিন যে অবস্থা ঘটিল, তাহাতে আমাকে কষ্ট দিয়া দেশে লইয়া যাওয়া আত্মীয়বর্গের মধ্যে কাহারো মতে যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। বন্ধুবর সেই যে তিস্তা

নদী-তীরে ভগ্ন পর্ণকুটীরে অজ্ঞান হইয়া দক্ষিণ অঙ্গ হারাইয়া পড়িয়াছিলেন, কলিকাতায় আনিয়া বড় বড় চিকিৎসকের সুচিকিৎসা ও পুত্রাদির অসীম যত্নে তদবস্থার কিছুই রূপান্তর হইল না। মধ্যে একটু ভালর খবর যেমন আইল, অমনি আমি ভবিষ্যদ্বক্তার ন্যায় আমার স্ত্রীকে বলিলাম "দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণে যেমন দপ্ করিয়া অধিক আলো করে, ইহাও দেখিতেছি তাই—Lightning before death"—আহা তাহাই হইল। গোপালের কলিকাতায় পেঁৗছিবার কয়েক দিবস পরেই দীপ নির্ব্বাপিত হইল।

২৫শে মাঘ মঙ্গলবার ১২৯৪। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮।

অদ্য প্রাতে গোপাল সপরিবারে কলিকাতায় গেলেন। ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি অনেকে সাক্ষাত করিতে আইলেন। মন বড় খারাপ ছিল, তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ আলাপাদিতে অনেক সুস্থ হইলাম। বহুবাজারের পুরাতন আলাপী বন্ধু (যিনি প্রসিদ্ধ অবৈতনিক নাট্যশালার রামাভিষেক নাটকাভিনয় মন্থরার পার্টে অত্যুত্তম অভিনয় করিয়াছিলেন এবং যাঁহার পিতা ৺গোবিন্দচন্দ্র সরকার উপার্জ্জনশীল ক্রিয়াবান রূপে জানিত লোক ছিলেন এবং পুত্র পৌত্রের নিমিত্ত যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন) বাবু ক্ষেত্রমোহন সরকারের পুত্র মন্মথনাথ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বহুক্ষণ অনেক, কথোপকথন করিয়া গেলেন। বৈকালে তাঁহাদের বাসায় গেলাম, সঙ্গে বরেন্দ্র। তাঁহারা স্বাস্থ্যনিমিত্ত এখন সপরিবারে এলাহাবাদে রহিয়াছেন, একখানা বাটীতে ধরে না বলিয়া দুখানা বাটী ভাড়া করিয়া আছেন। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে চন্দ্রাপুকুর গ্রামস্থ আলাহাবাদ প্রবাসী প্রসন্নদাদার পরম হিতৈষী বন্ধু এদেশে বিখ্যাতনামা বাবু যদুনাথ হালদারের বাটী গিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেক প্রিয় সম্ভাষণাদির পর পার্ক ভ্রমণ হইল। পার্ক নামক মিউনিসিপ্যাল উদ্যান ও পুষ্পবাটিকা ও লাইব্রেরি প্রভৃতি অতি সুরম্য স্থান। ভ্রমণে প্রাণ শীতল হইল। দূরে হইতে কলেজ বাটী টাউনহল প্রভৃতি সুদৃশ্য ভবনাবলী দেখিয়াও তৃপ্তি পাওয়া গেল। যদুবাবুর বাটীতে সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক ভ্রমণে ক্লান্তি বশতঃ বিশেষতঃ বরেন্দ্রের জন্যই তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না, এককালে বাসায় প্রত্যাবৃত হইলাম—নগেন্দ্রের দ্বারা যদুবাবুকে apoiogy করিয়া বলিয়া পাঠাইলাম।

২৬শে মাঘ বুধবার ১২৯৪। ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮।

বৈকালে ঐ ক্ষেত্র সরকারবাবুর সঙ্গে পাইওনিয়ার ছাপাখানা প্রভৃতি ইংরেজাধিষ্ঠিত পল্লীর সুন্দর রাস্তা সকল ভ্রমণ করা হইল—কিয়দ্দূরে আকবরী বাঁধ দেখা গেল—ঐ বাঁধ বাঁধিয়া যমুনার স্রোতকে ফিরাইয়া অভীষ্ট স্থানাভিমুখে লইয়া গিয়া তবে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থলে আকবর আলাহাবাদের অপূর্ব্ব দুর্গটি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কর্ণেলগঞ্জের অতি নিকটেই যমুনার স্রোত ছিল, এখন ঐ কারণে বহু দূরে (ক্রোশাধিক

দূরে প্রবহমান হইতেছে। ঐ দিন এক বাংলার পশ্চাতে ক্ষুদ্র এক উদ্যানে যাইয়া মালীর নিকট বাতাবিলেবু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনা হয়। প্রত্যাগমনকালে বাবু ক্ষেত্র আদিত্য ও যদুবাবুর বাটী হইয়া বাসায় আসা।

২৭শে, ২৮শে বৃহস্পতি ও শুক্র ১২৯৪। ৮ই, ৯ই ফেব্রু ১৮৮৮।

কয়দিন কেবল প্রাতে বৈকালে ভ্রমণ ও বাঙ্গালীবাবুদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়। কর্ণেলগঞ্জের যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন প্রায় সকলেই উত্তম লোক এবং প্রায় সকলেই পরিবার লইয়া বসবাস করিতেছেন। ইহার মধ্যে বাবু ক্ষেত্রমোহন আদিত্য ও তাঁহার ভ্রাতা অম্বিকাচরণ আদিত্য আমার পরম আত্মীয় ও অতি সজ্জন লোক। ক্ষেত্রবাবু এলাহাবাদে একজন প্রসিদ্ধ গণ্যমান্য মিউনিসিপ্যাল মেম্বার। কর্ণেলগঞ্জ ও ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট প্রভৃতির ভার তাঁহারই উপর। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি যেমন, এখানে তেমন নয়, ওয়ার্ড মেম্বারেরা একজিকিউটিভ কাজ আপন আপন ওয়ার্ডে নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই হেতু ও অন্যান্য অনেকগুণে ক্ষেত্রবাবুর প্রভুত্ব নিজপাড়ায় বিস্তর। বাবু যদুনাথ হালদার ও আমার আত্মীয়, তিনিও এলাহাবাদে বিশেষ গণ্যমান্য, তিনি রেলপুলিশের এসিস্ট্যান্ট শুপারিন্টেন্ডেন্ট; সাহেব লোক তাঁহাকে বিস্তর খাতির করে। শুক্রবার বৈকালে সেখানে যাওয়া হয়। দেখিলাম, এখানে বাণিজ্যকার্য প্রকৃতপ্রস্তাবে বহু নাই, কেবল স্থানীয় প্রয়োজনমত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় বিস্তর হইয়া থাকে। পণ্য দ্রব্যাদির জাঁকজমক বেশ, প্রায় সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্য, অধিক মহার্ঘও নয়। কলিকাতাবাসী হইয়া যে সহরেই যাওয়া যাউক, এ সকল বিষয়ে ন্যূনতা লক্ষিত যে হইয়া থাকে, তাহা স্বাভাবিক। আধুনিক ভারতে কলিকাতা রাজধানী, এবং ভূমণ্ডলের সর্বস্থানের সহিত তাহার বিপুল বাণিজ্য, সুতরাং কলিকাতার তুল্য আর কোনো স্থানই হইতে পারে না।

২৯শে মাঘ শনিবার ১২৯৪। ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮।

অদ্য প্রাতে তীর্থকার্য্য উদ্দেশে বেণীঘাটে যাওয়া হয়। আমরা চারিজন ব্যতীত নগেন্দ্র আমাদের সঙ্গে। গঙ্গা-যমুনা মিলনস্থলকেই বেণীঘাট বলে। বর্ষাকালে উভয় নদীই প্রবলা হইয়া বহু পরিসর স্থান ব্যাপিয়া স্রোতঃবাহিনী হইয়া থাকেন। এখন শুষ্ককাল, এখন বাঁধ হইতে অর্দ্ধক্রোশাধিক ভূমি ও বালি ভাঙ্গিয়া গেলে তবে তটিনীর নীর-তীরে উপস্থিত হওয়া যায়। আমি নগেন্দ্র ও বরেন্দ্র—আমরা যে একা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা বাঁধ পর্য্যন্ত। আলাহাবাদের বিখ্যাত কেল্লার বাহিরেই যে উচ্চভূমি তাহাকেই বাঁধ বলে। আর যে একাতে আমার স্ত্রী ও গোপালের বাটীর জনৈক বিধবা ও বাহিরে কুমেদ ছিল, সে একা জলকিনারা পর্য্যন্ত—সে একা যাতায়াতের। গঙ্গা যমুনার বিশাল চরভূমি জনতায় পূর্ণ—সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই সঙ্গম স্থলে বৃহৎ মেলা হয়; যে বার কুম্ভমেলা পড়ে, সে বারের তো

কথাই নাই; মাঘের সাধারণ মেলাও সামান্য নয়, বিশেষতঃ মেলার দরুণ এই স্থানটা এই মাসে ঠিক যেন বহুজনাকীর্ণ সহরবৎ হইয়া উঠে। এখানে এই এক মাস বিলক্ষণ একটী বাজারও বসিয়া থাকে। তাহাতে সুধু খাদ্য সামগ্রী নয়, নানা দেশের শিল্পজাত বসন-ভূষণ তৈজস অলংকার গৃহসজ্জা প্রভৃতি রাশি রাশি বিক্রীত হয়। অদ্য সংক্রান্তি, অদ্য জনতাও বহু, তবু নাকি কয় দিন হইতে মেলার ভাঙা দশা পড়িয়াছে। এখানে বাঁধা ঘাট নাই, বর্ষায় কয়মাস ডুবিয়া যায়, এইজন্যই বোধ হয় বাঁধাঘাট কেহই নির্ম্মাণ করেন না। কিন্তু শত শত পতাকা পত পত শব্দে আকাশ মার্গে উড়িতেছে। প্রত্যেক ধ্বজায় পৃথক চিহ্ন—জলচর, স্থলচর, বিমানচর প্রভৃতি আকৃতি। প্রথমে ভাব বুঝিতে পারি নাই; শেষে শুনিলাম ও দেখিলাম, পুণ্যপ্রার্থী যাত্রীরা অনেক টাকা খরচ করিয়া (অর্থাৎ পাণ্ডাকে দিয়া) পুণ্যের বা ধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়াছেন। যে পাণ্ডার যে চিহ্ন, তাহাই তাহার যাত্রীর ধ্বজার বস্ত্রে লাগানো হয়। সঙ্গমস্থান হইতে চতুর্দ্দিগে কি রমণীয় দৃশ্য। এক দিগে (এক কেন দুই দিগে) প্রস্তর দুর্গের দৃশ্য যেমন অপূর্ব্ব পরঁ পারে ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও গ্রামাদির দৃশ্যও তেমনি বিচিত্র। বিশেষতঃ কেল্লাটির নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে ও গঠনবৈচিত্র্যে সকলেরই দৃষ্টি, মন আকর্ষণ করে। এমন সঙ্গমস্থলে এমন কেল্লা এমন মহামহিমান্বিত বাদশাহার (আকবরের) উপযুক্তই হইয়াছে। কেল্লায় অভ্যন্তরস্থ যে সব রাজপুরী সদৃশ অট্টালিকাদি দৃষ্ট হয়, তাহাও অতি সুন্দর। দুঃখের বিষয়, এ যাত্রায় কেল্লার ভিতর যাওয়া ঘটিল না, সুতরাং তত্রত্য দৃশ্যাবলী ও অক্ষয়বট প্রভৃতি দেখা হইল না—প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখিবার ইচ্ছা রহিল।

দৃশ্যদর্শন ছাড়িয়া জনতার দিগে দৃষ্টি করিলেও এক অদ্ভুত ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। মনুষ্য ধর্ম্মবুদ্ধিতে না পারে এমন কাজই নাই। এই বেণীঘাটে চারিদিগে কত নাপিতই বসিয়াছে ও তাহাদের দালাল যাত্রী জুটাইয়া আনিতেছে। শুনিলাম যাত্রী প্রতি ১ এক টাকা লইয়া ক্ষৌর করে। মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত মায় সমস্ত গাত্রলোম কত উদ্ভ্রান্ত স্বর্গপ্রার্থীরা কামাইয়া থাকে। দেখিতে কি কদাকার। সুখের বিষয়, সে দলের সংখ্যা অত্যল্প কিন্তু মস্তক, ভুরু, গোঁপ দাড়ি কামানো সচরাচর। বিধবা স্ত্রীলোকগণের মস্তক মুণ্ডন দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কত সধবাও অধিক বয়সে শিরঃ মুণ্ডন করিয়া থাকে। আশ্চর্য্য ধর্ম্মসংস্কার! যাহার যত সংখ্যক কেশ ও লোম ঐ পবিত্র স্থলে পতিত হইবে, সে ব্যক্তির তত পরিমিত বর্ষ বা যুগ স্বর্গবাস ঘটিবে। কত পুরুষ ও স্ত্রীলোককে প্রতিবর্ষেই মস্তক মুড়াইয়া আসিতে দেখা যায়। প্রয়াগের নাপিতের ন্যায় ভাগ্যবর নাপিত ভূমণ্ডলে আর আছে কিনা সন্দেহ।

নগেন্দ্রের গুণে অতি অল্প ব্যয়েই আমার স্ত্রীর তীর্থকার্য্য সম্পন্ন হইল। স্ত্রীর অনুরোধে গাঁটছড়া বাঁধিয়া উভয়ে এককালে যুগপৎ ডুব দিয়া স্নান করিতে বাধ্য হইলাম। ঘাটের নিকটস্থ জলে সহস্র স্নানকারীর পদোত্থিত বালুকায় জল যেন ঘন বালুকাময় গাঢ় হইয়াছিল, এজন্য নৌকা করিয়া উভয় নদীর ঠিক সঙ্গমস্থলে

পুরোহিত সঙ্গে গিয়া আমরা মস্ত্র স্নানকার্য্য শেষ করিলাম। স্থলে আসিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিবার পর আমার স্ত্রী ও ভৃত্য কুমেদ কর্তৃক ভোজ্য উৎসর্গ হইল। তৎপরে আমাদের স্বদেশীস্থ কয় বিধবা স্ত্রীলোক (জগত্তারিণী প্রভৃতি) যেখানে কুটীরে কল্পবাস করিতে-ছিলেন, তথায় গেলাম। চর দিয়া যাইতে প্রায় অর্ধক্রোশ অতিক্রান্ত হইলে তবে সেই কুটীর সকল পাইলাম। কুটীরে কুটীরে স্থানটী যেন একখানি গ্রাম হইয়া উঠিয়াছে। যে বাটীতে আমাদের দেশস্থগণ ছিলেন, তাহারই অপর মহলে বহুবাজারস্থ ক্ষেত্র সরকার বাবুর মাতা খুড়া প্রভৃতি দানোৎসব করিতেছেন, ক্ষেত্রবাবুর পুত্র মন্মথ তথায় উপস্থিত। সেই কুটীরবাসে জলযোগ ও আলাপ সম্ভাষণের পর আমরা বাসায় ফিরিয়া আইলাম। পথে ডাহিন দিকে দারাগঞ্জ রহিল। তথায় যাইবার মানস ছিল, কেননা এলাহাবাদের দারাগঞ্জই গঙ্গার ধারে, উহা পুরাতন স্থান। কিন্তু বেলা অধিক হওয়াতে ও সঙ্গে বালক থাকাতে যাওয়া ঘটিল না। কেল্লার ভিতর ও দারাগঞ্জ দেখা বাকী রহিল।

এলাহাবাদ সহরটী নানা বিচ্ছিন্ন ভাগে বিভক্ত। একভাগ হইতে অন্যভাগের মধ্যে ক্ষেত্র উদ্যান প্রভৃতি থাকাতে যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া বোধ হয়। এমন বিচ্ছিন্ন বসতি আর কোনো প্রধান নগরেই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু তজ্জন্য সহরের অধিকাংশ স্থলেই সুপরিষ্কার ও সূর্য্যকর এবং বায়ু যাতায়াতের উত্তম সুবিধা। কেবল যেখানে চক, ও যে স্থানকে প্রকৃত সহর বলে তন্মধ্যে সংকীর্ণতা ও অবস্থাময় নোংরা-কাণ্ড বিরাজমান। নতুবা আর সবস্থানে বড় বড় পরিষ্কার রাস্তা ঘাট, ও বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে তরুশ্রেণী রাজিত শকটযোগে বা পদব্রজে বেড়াইতে পরম সুখ। বিশেষ কর্ণেলগঞ্জে লেঃ গবর্ণরের বাড়ী, পার্ক উদ্যান, কলেজ বাটী টাউনহল প্রভৃতি অতি উত্তম স্থান। যেন স্বর্গোপম। কলেজের বাহ্যদৃশ্য যেমন, অভ্যন্তরও তেমনি চমৎকার। তাহার বৃহৎ হলটী অতি অপূর্ব্ব গৃহ, তাহার উপরে উঠিবার সোপান খুব প্রশস্ত ও সুনির্ম্মিত। উপরের বারাণ্ডা হইতে হলের ভিতরদিগে মুখ রাখিয়া যে সব শব্দ উচ্চারণ করা যায়,—মধ্যে তাহার যেন প্রতিধ্বনি হয়, এমনি গম্ভীর হইয়া উঠে। বারাণ্ডার বাহিরে দুই কোণে দুই উচ্চ স্তম্ভ আছে। তাহাতে উঠিলে চতুর্দ্দিগের শোভা অপরিসীম। হলে কলেজ নির্ম্মাণ জন্য সাহায্য দাতাগণের ছবি আছে। অনেক স্বাধীন অধীন রাজারাজড়ার প্রতিমূর্ত্তি এই একস্থলে দেখা যায়। তন্মধ্যে অনেক প্রধান বাঙ্গালীকে দেখিয়া সুখী হইলাম।

১লা ফাল্গুন রবিবার ১২৯৪। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮।

অদ্য বৈকালে নৌকাযোগে যমুনা ভ্রমণ করিলাম। সঙ্গে বহুবাজারস্থ ক্ষেত্রবাবু ও তাঁহার একটি ছোটপুত্র ও একজন আলাপী লোক ও শ্যালক এবং আমার সঙ্গে নগেন্দ্র ও বরেন্দ্র। ঐ ক্ষেত্রবাবুরাই এই ভ্রমণের উদ্যোগী ও প্রস্তাবক। নৌকা ভ্রমণে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু কাশীর গঙ্গায় নৌকা করিয়া বেড়াইয়া ও দেখিয়া শুনিয়া যে বিমল

সুখলাভ করিয়াছিলাম, ইহাতে তাহার কিছুই হইল না। তেমন ঘাট, তেমন অপূর্ব সৌধমালা তেমন নহবৎখানা তেমন বংশীবাদ্য, তেমন গভীর নয়, স্থলও তেমন শোভাময় নয়। যেন সামান্য জনপদের সামান্য নদীতে ভ্রমণ করিতেছি, এই পর্য্যন্ত। আলাহাবাদের বিচ্ছিন্ন বসতিই এই সৌন্দর্য্য অভাবের প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক্ পরপারে স্বভাবের ও কৃষকের হস্ত উদ্ভূত ক্ষেত্র বৃক্ষাদি নানা রম্য দৃশ্য দেখিয়াও কতক তৃপ্তি জন্মিল।

প্রায় সন্ধ্যার সময় নৌকা হইতে তীরে আবার উঠা হইল। তথা হইতে কর্ণেলগঞ্জ অনেক দূরে, সুতরাং একার প্রয়োজন ছিল। রাস্তার উপর রেলওয়ের একটী পুল আছে, তাহা পার হইয়াই দুখানা একা পাওয়া গেল। আসিবার সময় দুখানাতেই আসা গিয়াছে; সুতরাং দুখানাই যথেষ্ট কিন্তু একখানি যেমন উত্তম, অপরখানি তেমনি অধম—সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ও—বসিবার স্থান অতি কদর্য্য, পর্দ্দাদিও অতি জঘন্য।

একথার উল্লেখ করিতেছি কেন, তাহা এখনই প্রকাশ পাইবে। ক্ষেত্রবাবু তাড়াতাড়ি স্বপুত্র ও শ্যালক সহিত সেই ভাল একাখানিতে গিয়া উঠিলেন। মন্দ গাড়ীখানি আমাদের জন্য রাখিলেন। তিনি ও তাঁহার শ্যালক এবং ৮।৯ বৎসরের পুত্র মাত্র আরোহী। আমরা তিন মরদ এবং এক পঞ্চমবর্ষীয় বালক। বিশেষ তিনি জানেন, বরেন্দ্র ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে, শীঘ্র যে গাড়ী যাইতে পারে, এমন গাড়ীই আমার দরকার। আবার তাঁহার গাড়িখানিতে এত পরিসর স্থান যে সচ্ছন্দে আর একজন লোক লইলে অক্লেশে যাইতে পারিতেন। আমাদের গাড়িতে বরেনকে উঠাইয়া যেমন গাড়ির দাণ্ডা বা খুঁটী ধরিয়া উঠিতে যাইব; অমনি বাত্তির সহিত খুঁটি হেলিয়া পড়িল। অতি কষ্টে চারিজনের বসা হইলে দেখা গেল যে ক্ষণ পরেই যখন দৌড়াইবে (যদি সে মরণাপন্ন পক্ষীরাজ দৌড়ানো কাহাকে বলে, জানে) অমনি হয়তো গাড়ির সহিত আমরাও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ হইব। ভাগ্যবলে এত দূরেও যদি না ঘটে, তবু ঠ্যাকস্ ঠ্যাকস্ করিয়া অনেক রাত্রি নৈলে বাসস্থানে পৌঁছিতে পারিব না। যাহা হউক গাড়ি চলিল, অথবা শকটচালক চালাইবার পুনঃ পুনঃ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কষাঘাতে কষাঘাতে ঘোটকের অবশিষ্ট অস্থি ভাঙ্গিবার জো করিল—মিথ্যা বলিব না, গাড়ি চলিল, কিন্তু সে চলা যে কি চলা, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরের সম্পূর্ণ বুঝিবার জো নাই। কি বলিয়া যে এমন বিকলেন্দ্রিয় যন্ত্রকে গাড়ী নাম দিয়া মিউনিসিপ্যালিটি তাহাকে চলিতে দেয় বলিতে পারি না। চড়িবামাত্রই তো আমার মনে এই একটা মহা অভিমান জন্মিল যে এলাহাবাদে তিনি পুরাতন হইয়াছেন এবং আমি নূতন সঙ্গ নিয়াছি বলিয়া তিনি আমার প্রদর্শক ও পরিচালক হইবেন বলিয়া সর্ব্বদা আভাষ দিয়া থাকেন, তজ্জন্যই কয় দিন বলিতেছেন, "শ্রীবৃন্দাবনে আপনারা আর স্বতন্ত্র যাইবেন কেন, আমিও যখন কয়দিন পরেই সপরিবারে যাইতেছি, তখন একত্রে দুই পরিবার একীভূত হইয়াই যাওয়া উচিত।" সে প্রস্তাবে আমি প্রথমতঃ সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যকার

এই মহা স্বার্থময় ব্যবহার দর্শনে মনে মনে মহা অভিমানী ও দুঃখিত হইয়া এমন স্বার্থপরের সঙ্গী হইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। সামান্য সূত্রে ও অতি সামান্য ব্যবহারেই মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি চেনা যায়। আমার গাড়িতে (ক্ষেত্রবাবুরই আনীত ও তাঁহারই আলাপী) যে ভদ্র যুবকটী ছিলেন, তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া মনের আবেগ মিটাইলাম। বলিলাম "এ যদি আমি বা বন্ধুবান্ধব হইত, অর্থাৎ আমরা যদি কোনো ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ করিয়া এরূপ সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে আসিতাম, তবে অগ্রে তাঁহার সুবিধা না করিয়া দিয়া কদাচ নিজের সুবিধা খুঁজিতাম না, ইহাতে ক্ষেত্রবাবুর স্বভাব পরীক্ষিত হইল—আপনি ইচ্ছা করিলে একথা তাঁহাকে বলিতে পারেন।" ইতি ভাবের গোটাকত বকিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। অপর গাড়ী হইতে ক্ষেত্রবাবু ও তাঁহার শ্যালক ডাকিয়া কহিলেন, "কেন; কেন, নামা হইল কেন?" আমি সরোষে উত্তর দিলাম, "আপনাদের কি চক্ষু নাই? উঠিবার পূর্বেই কি এরূপ ঘটনা একটা হইবে তাহা কি বুঝিতে পারেন নাই?" তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, বালক সঙ্গে কিরূপ হাঁটিয়া যাইবেন। আমি বলিলাম, এখনই অন্য গাড়ী পাইব, না হয় যা হয় হইবে, আপনারা চলিয়া যাউন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ গাড়ী ছাড়িতে নিষেধ করিলেন, যেহেতু এ পাড়ায় আর গাড়ি পাইবেন না। আমরা সে অনুরোধ না শুনিয়া পদব্রজেই চলাতে তখন বলিলেন, "না হয়; আমাদের এই গাড়ীতে উঠুন, আমরা আপনাদের গাড়ী লই।" আমি উত্তর দিলাম, "আপনার সৌজন্য জন্য বাধিত হইলাম। কিন্তু আপনাদিগকে নামাইয়া আমি কি উঠিতে পারি? একথা যদি প্রথমে বিচার হইত, তবে যাহা হয় হইত, এখন আর উপায় নাই, আপনারা যাউন; আমরা এখনই গাড়ী পাইব।" কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই চলতি ভাল একা একখানা আমরা পাইলাম, সকল গোল চুকিয়া গেল। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর প্রতি আমার এত অভক্তি ও অবিশ্বাস জন্মিল যে আর তাঁহাদের সঙ্গে দূর দেশ যাইতে সম্মত হইলাম না। ভাবিলাম; এরূপ বন্ধু হইতে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল। এরূপ লোকের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করিলে শেষে পরিতাপের সীমা থাকে না।

২রা ফাল্গুন, সোমবার ১২৯৪। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮।

অদ্য বৈকালে সপরিবার সভৃত্য একা করিয়া চকে যাওয়া হয়। প্রথম যে দিন চকে যাই, কালীপ্রসন্ন বিশ্বাসের পিসতুতা ভাগ্নীর পুত্র (দীন ও হরি) গণকে, আমার স্ত্রীকে তাঁহাদের বাটীতে আনিব বলিয়া কহিয়া আসি। তন্মধ্যেতু এবং বিজয় বাবাজীর ভায়রা ভাইদের দুবাটীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ মানসে অদ্য চকে যাওয়া। প্রথমে ঐ দীন ও হরির বাটীতে যাওয়া, আমার স্ত্রীকে ও কুমেদকে তথায় রাখিয়া বরেন্দ্রর সহিত তাঁহাদের ডাক্তারখানায় আসা। তাঁহাদের বাটী ঐ ডাক্তারখানার পার্শ্বস্থ গলির ভিতর অনেকটা দূরে গিয়া। ডাক্তারখানা প্রকাশ্য রাস্তার ধারে। এখানে যেমন

পরিষ্কার ঝরিষ্কার, গলির ভিতর অর্থাৎ পাড়ার মধ্যে তেমন নয়—এ প্রকার সহরে এ প্রকার পল্লীগুলি প্রায়ই যেমন নোংরা হইয়া থাকে, এখানেও তাই দেখিলাম। ডাক্তারখানায় আমাদের গ্রামবাসী জ্ঞাতি ৺কাশীনাথ বসুর পুত্র শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বসুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার নাতি হয়, তদুপযুক্ত প্রণাম সম্ভাষণ হর্ষ ইত্যাদি হইল। তাহাকে সঙ্গে লইয়া ডাক্তারখানার পাশেই (উক্ত গলিমুখের পরেই) বিজয়ের ভায়রাভাই মতিলাল ঘটকের বাটীতে গেলাম। মতিলাল ঘটকের পিতা ৺মাধবচন্দ্র ঘটক এ অঞ্চলে ভাল কর্ম্মে বরাবর নিযুক্ত থাকিয়া বহু অর্থ ও নাম যশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার মামার বাড়ী নিশ্চিন্তপুর (যশোহর জিলায়) গ্রামের অতি নিকট দীঘড়া নামক গ্রামবাসী। উহাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ব্বতন অনেক কুটুম্বিতা ছিল। এক্ষণে সাবেক ধরণ গিয়াছে, কুটুম্বগণের সংবাদ পরস্পর কেহই প্রায় রাখে না, তাহাতে আবার তাঁহাদের বংশের সাবেক লোক তাবতেই প্রায় মরিয়া গিয়াছেন। কেবল নব্যতন্ত্র যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রায় এলাহাবাদে এবং পুরাতনের তত্ত্ব তত রাখেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা ঐ মতিলালের সহোদর বা পিতৃসহোদর বংশীয় নহেন। বিজয়ের দরুণ হালিকুটুম্বিতা যাহা হইয়াছে, তাঁহারা তাহা জানেন বটে, কিন্তু ঐ দিন মতিলাল বাটী না থাকাতে অথবা লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে তখন লক্ষ্ণৌ যাওয়াতে যে কয়জন জ্ঞাতি বাটী ছিলেন তাহারা অল্পবয়স্ক, তথাপি আমাকে দুই একবার বসিতে বলিল, আমি না বসিয়া প্রশস্ত উঠানেই পদচারণ পূর্ব্বক তামকূটের ধূম্রপান করিলাম। আমার আসিবার পূর্ব্বেই আমার স্ত্রী কুমেদের সঙ্গে দীনহরিদের বাটী হইতে একা করিয়া আসিয়া মতিবাবুর বাটীর মধ্যে গিয়া তখন তাঁহার দুই স্ত্রীর সহিত আলাপ সম্ভাষণে নিযুক্তা ছিলেন। বিজয়ের শালী কয়মাস পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তখন আমাদের বাটীতে যাওয়াতে আমার স্ত্রীর সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয়ই ছিল। তাঁহারা দুই সতীনে বড় ভাল, দুজনে বড় প্রণয়ে কাল কাটাইয়া থাকেন—সতীনে সতীনে এরূপ প্রায় ঘটনা অনেকের নিকট ইহা একপ্রকার অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু ইহার একটী বিশেষ শোচনীয় কারণ আছে। তাঁহাদের স্বামী মতিবাবু বড় লোকের ছেলে হইয়াও কাল-ধর্ম্মে কুসঙ্গে পড়িয়া কতিপয় ঘোর দুষ্য নেশায়, চণ্ডু পর্য্যন্ত পাপ নেশায় অভ্যস্ত হইয়া চাকরী মাত্র গোচেগাচে যাহা করেন; নচেৎ অন্যান্য বিষয়ে অতি অপদার্থ ও দৈহিক সম্বন্ধেও নাকি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা আমার শুনা কথা, তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই, সত্য হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। ঈশ্বর মতির মতিগতির পরিবর্ত্তন করেন তবেই মঙ্গল, নচেৎ যা শুনিতে পাই, তাহাতে তাঁহার অকালেই ইহদেহ ত্যাগের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ঐ দুই সতিনী স্বামী সৌভাগ্যে তুল্যাধিকারিণী অর্থাৎ স্বামীর চরণ সেবন দূরে থাকুক, দর্শনলাভেও তাঁহারা নাকি বঞ্চিতা। মতিবাবু নাকি বাহিরেই শয়ন ভোজন অবস্থান করেন, কদাচিৎ অন্তঃপুরে ক্ষণেকের নিমিত্ত যান কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি অল্পদিন হইল;

তাঁহার মাতৃ বিয়োগ ঘটিয়াছে, এখন যদি কদভ্যাসের সংশোধন ও সুনীতির কতক পুনর্জীবন হয় তো সুখের কথা। মাতৃশ্রাদ্ধের পর নাকি বাটীর মধ্যে যাওয়া আসা শোওয়া বসা, আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক ঐ কারণে সমান দুর্ভাগ্যবশতঃই দুই সতীনে দুই ভগ্নীর ন্যায় খুব মিলজুল প্রণয়ে, কিন্তু বিষাদে কাল হরণ করিতেছে। ফলতঃ এখানে বলিয়া নয়, কোনো কোনো অবস্থায় সতীনে সতীনে মিলজুল আমরা দেখিয়াছি। একের সন্তান হইয়াছে, অন্যের হয় নাই, এরূপ অবস্থায় কোনো কোনো সংসারে মিল দেখা গিয়াছে। বাটীর মধ্যে আমার স্ত্রীর অনেক বিলম্ব হওয়াতে তথায় কুমেদকে রাখিয়া বেণীমাধবের সঙ্গে আমি বিজয়ের অপর ভায়রাভাই রামপ্রসন্ন দত্তের বাটীতে পদব্রজে গেলাম। সে বাটী কিছু দূরে। সেখানে গিয়া অন্যান্য ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল এবং কিছুক্ষণ তথায় বসিবার পর আমার স্ত্রীর গাড়ী আইল। রামপ্রসন্ন বাটী ছিলেন না, একটু পরেই আইলেন, তাঁহার দাদাদের সঙ্গেও দেখা হইল না। কিন্তু তাঁহার ভাইপো ও ভাগিনেয় কয়টীর দ্বারা তাঁহার আসিবার পূর্বে এবং তিনি আইলে তাঁহার দ্বারা প্রচুর খাতির যত্ন পাইলাম। কিছু জলযোগও আমার ও বরেন্দ্রের হইল। ইঁহারা অতি উত্তম লোক, যথার্থ পুরাতন বংশের ন্যায় লোকের খাতির যত্ন জানেন। বাটীর ভিতরেও আমার স্ত্রী তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া আইলেন। রাম পূর্বে কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সুতরাং আমার সঙ্গে আলাপ ছিল এবং পূর্ব দিন আমার কর্ণেলগঞ্জের বাসায় গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছিলেন। নিবাধুইয়ের ভুবনমোহন মিত্র পূর্বদিন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। অদ্যও রামবাবুর বাটীতে তিনি আইলেন ও অন্তঃপুরে তাঁহার স্ত্রী আসিয়া আমার স্ত্রীর সহিত দেখা করিলেন। তাঁহার বাসা রামপ্রসন্নের বাসার অতিনিকট। এখানে রাত্রি হওয়াতে অম্বিকা ঘোষের কন্যা ও শ্যামাচরণ বসুর কন্যা প্রভৃতি আরো কয়জন আত্মীয়ের বাটীতে আর যাওয়া হইল না। সে সব বাটী নিকটেও নয়, অতএব এক্কা চড়িয়া আমরা বাসায় রাত্রি ৮টার সময় ফিরিয়া আইলাম।

৩রা ও ৪ঠা ফাঃ মঙ্গল, বুধ, ১২৯৪। ১২ ও ১৬ই ফেঃ ১৮৮৮।

প্রিয়ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণাধিক শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার বসু বাবাজীর অনেকগুলি কন্যার পর পাঁচ মাস হইল একটী সুন্দর নবকুমার হইয়াছিল। তাহাতে মনের কত যে আনন্দ জন্মিয়াছিল, বলা যায় না। কিন্তু ইহ সংসারে কোনো বিষয়েই সম্পূর্ণ সুখ হইবার নয়; অথবা এ বৎসর না জানি কি কারণে আমাদের বড়ই দুর্বৎসর চলিতেছে, তাই ঐ প্রাণের শিশু জন্মিয়া অবধি ভয়ঙ্কর লিভার বা যকৃৎ রোগে ভুগিতেছিল। প্রথমে বারুইপুরে পরে কলিকাতার বাটীতে আনিয়া কতই চিকিৎসা করা হইল; কিছুতেই উপকার দর্শিল না। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তাহার মন্দ অবস্থাই দেখিয়া আসিয়াছিলাম— জীবনের আশা ভরসা বুদ্ধি মানিতে চাহিত না; কেবল নির্ব্বোধ প্রাণ আপন জনের

বেলা বুঝিয়াও বুঝে না, এই জন্যেই ভাবিতাম, যদি কোনো সূত্রে ভালো হয়। আহা সে দারুণ ভ্রম (সকল ভ্রান্তির ন্যায়) শরতের মেঘের ন্যায় অপগত হইয়াছে, সে প্রাণধন শিশুটী আর নাই—সে কুসংবাদ আসিয়াছে; একে সে জ্বালায় দুই এক দিন জ্বলিতেছি, তদুপরি আজ অবার এক মর্ম্মান্তিক কুসংবাদ প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধু বেণীমাধব রুদ্র গতাসু হইয়াছেন। কাশী ছাড়িবার পূর্ব্ব দিনেই বাটীর চিঠিতে জানিয়াছিলাম তিনি আসাম হইতে মহা ভয়ঙ্কর পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। সে কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। অদ্য সেই দারুণ রোগের ও তাহার ইহমায়িক দেহের লীলাখেলার অবসানের নিদারুণ সংবাদ পাইয়া আমার অন্তরাত্মা যে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে এবং মনের মধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা আর লিপিবদ্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা পাইব না। কিছু লিখিতে পড়িতে ভালও লাগে না। দুই একদিন না গেলেও তাঁহার দুর্ভাগা পুত্রগণকে পত্রাদি লিখিতেও সমর্থ হইব না। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় অধীনতা স্বীকার ভিন্ন অন্যগতি কি ?

জগত্তারিণী প্রভৃতি দেশস্থ স্ত্রীলোকেরা বেণীঘাটে একমাস কল্পবাসের পর ১লা ফাঃ আমাদের বাসায় আসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা বৃন্দাবন যাইবেন, আমার সঙ্গেই যান ইহা তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু নানা কারণে আমি তাহাতে সম্মত নই। তাঁহারা ২।৩ জন খুব আপনার জন হইলেও যাহা হয় হয়তো তাঁহাদের সঙ্গে বারাসত প্রভৃতি গ্রামস্থা অনেক মেয়ে; সুতরাং কিরূপে সে প্রস্তাবে সম্মত হই। তবে তাঁহাদের গম্য স্থানাদির রেলওয়ের টেবিল সাহায্যে সময় স্থান ভাড়াদি বিষয়ে বিস্তর পরিশ্রমে একটা তালিকা তৈয়ার করিয়া দিলাম। তাঁহারা স্বায়ংকালে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। বরেন্দ্র ষ্টেশনে সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আইল—ইহা ৩রা ফাল্গুনের ঘটনা।

৬ই ভাদ্র রবিবার, সন ১৩০৫ সাল। ২১শে আগষ্ট ১৮৯৮।

আবার দৈনিক লিপি (বহু বৎসরের পর) লিখিতে খেয়াল হইল। "খেয়াল" বলার তাৎপর্য্য এই যে জীবনে বহু বহুবার এ বাসনা উদিত ও কার্য্যে পরিণত হইয়াও নানা ব্যাঘাতে (এবং কতকটা আলস্যেও বটে) সুসিদ্ধ হয় নাই। যাহা হউক, এই বৃদ্ধ (৬৮ বৎসর) বয়সে পূর্ব্বাপেক্ষা মতিস্থৈর্য্যের সম্ভাবনা; দেখি এখনও যদি সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারি।

গত বৃহস্পতির ৩রা ভাদ্রে আমার পৌত্রী শ্রীমতী প্রভার জ্বর হইয়া শুক্রবার মন্দ ছিল না। নাড়ীতে একটু অল্প মাত্র জ্বর থাকিলেও কাতর হয় নাই, কেবল কাশীতে কষ্ট পাইয়াছে। এই কাশী ১০।১২ দিন পূর্ব্ব হইতেই বহু কষ্টকর ছিল। শুক্রবার বৈকালে জ্বর বাড়িয়া আর বিরাম হয় নাই, তদবধি কম বেশী ভাবে একজ্বরী অবস্থা ও কাশী ও কোষ্ট না হওয়াতে উদরের কাঠিন্য দেখিয়া অদ্য মহা ভাবিত আছি। তাহার পিতার ঔদাস্যে হরনাথ ডাক্তার না আসাতে ঔষধ পাইল না।

সোমবার, ৭ই ভাদ্র ১৩০৫।

শ্রীমতী প্রভার খুব জ্বর। ডাঃ হরনাথ আসিয়া ঔষধ দিলেন।

কুমারটুলির রামদাস মেন্দাদিং ফারমের ইটওয়ালারা না-বলা না-কওয়া ইটের দরুণ বাকী পাওনা বলিয়া ষোল টাকা কয় আনার দাবিতে ছোট আদালতের এক শমন দিয়া গেল। আশ্চর্য্য হইলাম। প্রায় এক বৎসর দেখা নাই; তাগাদা নাই, খামাকা এই ব্যাভার। পূর্ব্বে যখন চাহিয়াছিল, আমি বলিয়াছিলাম, শেষে তোমরা ২নং স্থলে ৩নং ইট দিয়া ঠকাইয়াছ, সেই জন্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র ইট লইয়াছি। অতএব বাকী কয় টাকা আর চাহিও না।

মঙ্গলবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩০৫।

শ্রীমতী প্রভার খুব জ্বর, এলোমেলো বকা, তবে পূর্ব্ব রাত্রে ও অদ্য কয়েকবার দাস্ত হওয়া এবং কাশী কম পড়াতে কিছু আশ্বস্ত হওয়া গেল। কিন্তু খুব কাহিল।

অদ্য কুমারটুলিতে ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীমান, বিজয় বাবাজী গিয়া ইটওয়ালাদের সঙ্গে ১৪ টাকায় রফা করিয়া টাকা দিয়া শমনের পৃষ্ঠে রসিদ লিখাইয়া আনিলেন।

বুধবার, ৯ই ভাদ্র, সন ১৩০৫।

প্রাতে ৺উমেশচন্দ্র রুদ্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রুদ্রকে দেখিতে যাই—কল্য রাত্রেও গিয়াছিলাম, তাহার মাতার অনুরোধে তাহার আত্মীয় বাবু রামচন্দ্র মিত্র (যিনি vactination-এর supdt,) সহিত পরামর্শ করিলাম। পুরাতন জ্বর, প্লীহা, মধ্যে দ্বোকালীন জ্বর হইয়াছিল, গোপী কবিরাজের চিকিৎসায় কমিয়া এককালীন ও অল্প জ্বর হইয়া আবার কয়দিন খুব বাড়িয়াছে। রোগী বড় জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহার অরুচি খুব। বাঁচিবার সম্ভাবনা খুব কম। অন্য বিজ্ঞ কবিরাজকে আনাইয়া গোপীর সহিত পরামর্শ দ্বারা চিকিৎসার মত ধার্য্য হইল।

শ্রীমতী প্রভার জ্বর খুব, দুর্ব্বলও খুব, কাশী প্রায় নাই। ডাঃ হরনাথ আসিয়া নতুন ঔষধ লিখিয়া দিয়া গেলেন। কিন্তু ঔষধাদি প্রায় পেটে থাকিতেছে না। বড়ই ভাবিত হইয়াছি।

১০ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩০৫।

আমার কয় বৎসর পূর্ব্বে রচিত "সীতার পাতাল প্রবেশ" নাটক ঘরে পড়িয়াছিল। সংস্কার ও শেষ গর্ভাঙ্ক বাকী। পীতাম্বর পাইনের দলের জন্য তাহা শোধিত আকারে সম্পূর্ণ করিয়া দিবার অনুরোধ গত পরশ্ব প্রিয়বন্ধু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় করিয়াছিলেন। অদ্য প্রাতে তিনি আসিয়া পাঠ করিয়া ও কতক আমায় নিজের পাঠ শুনিয়া মঞ্জুর করিয়াগেলেন। আর আর কথা তিনি কল্য প্রাতে আসিলে বন্দোবস্ত হইবে।

শ্রীমতী প্রভার রোগের গতিক দেখিয়া ভীত ও কাতর হইয়াছি। ঔষধ পথ্য কিছু মাত্র পেটে রহে না দেখিয়া এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ত্যাগ পূর্ব্বক বৈকালে শ্রীমান অতুলবাবাজীকে আনাইয়া হোমিওপ্যাথিক আরম্ভ করা গেল। জগদীশ্বরের কৃপাতেই নির্ভর। এ নাটক পাঠ জন্য প্রাতে এবং ঐ পীড়া বৃদ্ধির জন্য বৈকালে লাইব্রেরীতে যাইতে পারি নাই। মন বড় ব্যাকুল।

১১ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩০৫।

যে আশঙ্কা ছিল, তাহা অদ্য অপরাহ্ন ৪½ টার সময় ঘটিল—দুর্জ্জয় নিষ্ঠুর কাল আমার গলার হার কাড়িয়া লইল। এই কয়দিন যাহার নামের পূর্ব্বে "শ্রীমতী" ব্যবহার করিতেছিলাম—যেন "শ্রীমতী" না লিখিলে সে বাঁচিবে না, এম্নি একটা কুসংস্কারে চালিত হইয়াই উহা লিখিতেছিলাম। হায়! তবু নিদারুণ কৃতান্ত আমার বুকের ধন লইতে বিমুখ হইল না—তার দয়া নাই—লেশমাত্র দয়া থাকিলে অন্ততঃ আমার প্রভার সঙ্গে আমাকেও লইয়া যাইত। বোধ হয়, সে নিষ্পাপা সরলা বালাকে যে স্বর্গে লইয়া যাইবে এ আমারই পাপাত্মাকে সে যোগ্য ধামে লইবে কেন? বিশেষতঃ পূর্ব্বকর্ম্ম ফলের এখনও ভোগের বুঝি অনেক বাকী—কতই শোক, তাপ, দুঃখ, ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া গেল। আহা আমার হৃদয়-ধন প্রভাবতী ১২৯৫ সালের ফাল্গুন মাসে তাহার মাতামহ ৺সুরেন্দ্রনাথ সোমের শ্যামবাজারের বাটীতে জন্মগ্রহণ করে, অতি বালিকা কালে (৪।৫ বৎসর বয়সে) মাতৃহীনা হয়, তাহার পূর্ব্ব হইতেই বিশেষতঃ তদবধি সে এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণাধিক শ্রীমান্ ফণীন্দ্রকৃষ্ণ যথার্থ আমার হৃদয়ের হার স্বরূপ হইয়াছিল। আহা! "দাদাবাবু" বৈ জগতে আর কারোকেই জানিত না—তত ভালবাসা আর কারোকেই বুঝি দেখায় নাই—তাহার পিতাকেও না! হায়! হায়! আজ আমার হৃদয়-বেদনা যে কত অসীম, তাহা আমার অন্তরাত্মা ভিন্ন অন্য কেহই বুঝিতে পারিবে না। প্রভাধনে হারা হব, স্বপ্নের অগোচর! আহা! কি তীক্ষ্ম বুদ্ধি। কি মিষ্ট কথা! এই অল্প বয়সেই কিরূপ ব্যথার ব্যথী! আহা-হা কি প্রফুল্ল মুখ! আহা! মধুর বহুভাষিতা! যত মনে করি, হৃদয় বিদীর্ণ হয়! বুঝি এই দারুণ মনস্তাপে শীঘ্রই আমার প্রভার কাছে আমাকে যাইতে হয়! হইলেই ভাল! যাইবার প্রার্থনা করিতে নাই—তাই করিতেছি না—কেবল বলিতেছি, অধিক বয়স হইয়াছে, ঘটিলেই ভাল হয়—তাহার কাছে গিয়া জুড়াই! আজ আমি কি বকিতেছি অর্থাৎ লিখিতেছি; তাহা বুঝিতেছি না—হৃদয় পাগল—সুতরাং সুসম্বদ্ধ বাক্য বিন্যাশ আজ সম্ভবে না। জগদীশ্বর সব তোমার ইচ্ছা।

১২ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩০৫।

অন্তরের মধ্যে রহিয়া রহিয়া শোকাগ্নি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠা—বিশেষতঃ রাত্রে লাইব্রেরী হইতে প্রত্যাগমনের পর যখন বিরল বাস, তখন ভয়ানক কষ্ট। সারা দিন

লোকজনের সহবাসে ও কথোপকথনে কতকটা চাপা ছিল, রাত্রে একাকী থাকাতে হৃদয়-তাপ বড়ই প্রবল হয়। তবু "সীতার পাতাল গমন" নাটকের জন্য একটি তোটকচ্ছন্দে কবিতা লিখিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাই—মন কিন্তু ভুলিয়াও ভুলে না। সে কবিতা সংশোধনান্তে পরে লিখিত হইল। এ রাত্রে যদিও নিদ্রা মন্দ হয় নাই। তবু সে এক রকম—প্রাণ যেন কি এক অমূল্য রত্নের অভাবে অতি কাতর।

ঐ দিন উল্লেখযোগ্য অন্য কিছুই ঘটে নাই।

রবিবার, ১৩ই ভাদ্র, ১৩০৫।

রাত্রে লাইব্রেরী হইতে বাটী (৭৩/৩ গ্রে ষ্ট্রীট) আসিয়া জলযোগের পর বসিয়া বড়ই মন ব্যাকুল। তাই নিম্নলিখিত গানটী রচনা করিলাম। যথা ঃ—

রাগিনী বেহাগ। তাল জলদ তেতালা
(স্পষ্ট হসন্ত যে শব্দে নাই সে অজন্ত)

কোথা গেল সে রতন, জীবন, নাহি দরশন্
কেন হলোরে এমন্।
প্রভা ভিন্ন, হৃদয় শূন্য, শূন্য নিকেতন্!

১

কি অমূল্য হৃদয় নিধি, দিয়ে হ'রে নিল বিধি ;
দহে তবু নহে হৃদি, কেন বিদারণ ?

২

কি মধুর নাম্ প্রভাবতী, কি প্রভাময় দেহ-জ্যোতি
কিবা প্রফুল্ল দিবা রাত্রি, সে চন্দ্র বদন্ ?
আসিতাম্ যবে নিবাসে, পদ-পদ্ম বেদ কি উল্লাসে,
ছুটে এসে, মধুর ভাষে, জুড়াত জীবন্।

৩

শৈশবে জননী হীনা, জানিত না আমা বিনা,
তাই আরো কণ্ঠে লীনা, মণিহার্ যেমন।
দাদাবাবু অন্তে প্রাণ, প্রভা অন্ত দাদার মন যেন এ জীবন।
স্বগুণে সর্ব্ব রঞ্জন, ছিল সর্ব্বক্ষণ্।

৪

অল্পকালে সুখে সুখী, ব্যথার ব্যথী দুখে দুখী ;
কোথাও এমন নাহি দেখি বালিকা বদন্।
নবমে দশমে হেন, গৌরী গুণময়ী ধন,
ফাঁকি দিবে বলে যেন, এই অঘটন্ ;

৫

শেষ্ দেখিতে কাছে গেলাম্, কেমন আছ শুধাইলাম্,
উত্তরে হাসি হেরিলাম্—না স্ফুরিল বচন।
অন্তোত সুখী আমায় দেখে, তাই যেন হাসিল সুখে;
তের শত পঞ্চ সাল্ কাল হ'য়ে তা রৈল বুকে, যতদিন্ জীবন রবে।

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই ভাদ্র, ১৩০৫।
সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার।

এই চারিদিন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। কেবল দৈনিক কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করা মাত্র। ১৭ই ভাদ্র তর্পণ আরম্ভ—তাহা ঘরে বসিয়া করিয়া থাকি। যদিও যুক্তি মতে তর্পণাদি বিশ্বাসযোগ্য নহে, তথাপি এই উপলক্ষে পরমারাধ্য পিতা পিতামহাদি ও মাতৃদেবী ও পিতামহী মাতামহী প্রভৃতি গুরুজন এবং আত্মীয় আত্মীয়া যাঁহারা স্বর্গগত, তাঁহাদিগের নাম স্মরণ ও তাঁহাদিগের উদ্দেশে—সমর্পণে মনে এক প্রকার শোক মিশ্রিত আনন্দ অনুভব করা যায়। ভাবিয়া দেখিলে তর্পণের মধ্যে অতি মহানুভবতা ও নির্ব্বান্ধব প্রভৃতির প্রতি মৈত্রতা বা পরদুঃখকাতরতা শিক্ষালাভ হয়। "নরকেষু সমস্তেষু যাতবাসুচ যে স্থিতাঃ" এবং "যে বান্ধববান্ধব মেহন্য জন্মনি বান্ধবাঃ" ইত্যাদি তাহার প্রমাণ।

১১ শে ভাদ্র, শনিবার, ১৩০৫।

অদ্য অপরাহ্ন ৫৷৷-টার সময় রাজবাটীতে "সাহিত্য পরিষৎ" সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে যাই।

রাত্রি ৮টার সময় বাটী আসিয়া দেখি পৌত্র শ্রীমান্ বরেন্দ্রকৃষ্ণ ৺কীর্ত্তি মিত্রের পাড়াতে ফুটবল খেলিতে গিয়া পড়িয়া হাতের কব্জার হাড় ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। খেলার সঙ্গী বালক ঐ দুর্ঘটনার পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া হাতীর বাগানের চৌমাথায় আনিয়া বরফ কিনিয়া আহত স্থানে দিয়াছিল। তাহার পর আর্নিকা আরক চারি আনায় কিনিয়া লাগাইয়াছে। আমার জন্য অপেক্ষা হইতেছিল এবং আমি যে রাজবাটীতে গিয়াছিলাম না জানাতে লাইব্রেরীতে লোক যাইতেছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় অক্ষয় ও বিজয়কে সঙ্গে লইয়া বরেন্দ্রকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গাড়ী করিয়া যাইয়া জানিলাম যে Simple fracture হইয়াছে। তাহার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিল। রাত্রি দশটার সময় গাড়ী ধরিয়া বাটী আসিলাম। বরেন্দ্রকে লঘু আহার পাঁউরুটি দুধ দিলাম।

২৭শে ভাদ্র, ১৩০৫ সাল। রবিবার। ১১।৯।৯৮

অদ্য অপরাহ্ন ৫৷৷-টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে যাই; সভায় অন্যান্য কাজের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী M.A. মহাশয় উপসর্গ

সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা রমেশবাবু দ্বারা পঠিত হইল। সভায় কালীবর বেদান্তবাগীশ, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, কামাক্ষানাথ ন্যায়বাগীশ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ প্রভৃতি মহা পণ্ডিতগণ উপস্থিত ছিলেন ; তাঁহাদের বিবেচনায় 'উপসর্গ" লইয়া যে আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পন্ডশ্রম মাত্র।

অপ্রকাশিত গান।

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ
জয়তি।

গানের পুস্তক।
অর্থাৎ
স্বেচ্ছাতে বা পরের ইচ্ছাতে যখন যে গান রচনা করি,
তাহার লিপি

[সন ১২৯৮ সাল ১৪ই পৌষ স্ত্রী বিয়োগ রূপ নিদারুণ ঘটনা
হইবার কয়দিন পরে নিম্নস্থ গান স্বেচ্ছায় হয়।]

(স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ভিন্ন সব অজন্ত)

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল ঠেকা।

কোথা গেলে, (আমায়) একা ফেলে, সংসার[১] তুফানে ঘোরে!
বিলম্ব ক'রো না প্রিয়ে, সাথে নে যেতে আমারে[২]!

১

তোমা ভিন্ন শূন্য দেহে রহিতে এই শূন্য গেহে[৩],
কিছুতে প্রাণ না চাহে,[৪] পুত্র-স্নেহে কিবা করে[৫]?

২

(আভোগ)

জীবনে চির জড়িতা, তমালে মাধবী যথা,
ছিন্ন করি সেই লতা, বিধাতা দহিল[৬] মোরে।
হৃদয় জুড়িয়া ছিলে, শূন্য করি পলাইলে,
যে পাথারে ভাসাইলে, পার তার দেখি না রে॥

৩

সংসার বন্ধন তুমি, তুমি হ'লে অগ্রগামী,
কি বন্ধনে (আর) রব আমি, বাঁধে কিরে ছিন্ন ডোরে?
স্মরণ করিতে গুণ, সনাগুণ শতগুণ
রাবণের চিতাগুন[৭] (বা, যেন) জ্বলিল জীবন[৮] তরে?

৪

পতি পুত্র নাতি ফেলে, পুণ্য ধামে গেলে চ'লে, ধন্য ধন্য পুণ্যবতী ব'লে
লোকে তাই গৌরব করে।
কিন্তু সেই যশ গানে, কাণে যেন বজ্র হানে, যে জ্বালা এ বৃদ্ধ
প্রাণে, তারাকি বুঝিতে পারে ?

৫

ভুলিতে যতন যত, যাতনা প্রবল তত,
চিত্ত নিতান্ত ব্যথিত, আশা-হত একেবারে !
গুমরে পরাণ কাঁদে, ফুটিতে শরমে বাঁধে[৯]
এত জ্বালা[১০] এ বিচ্ছেদে, কভু[১১] ভাবিনি অন্তরে।

৬

পতিহারা সতী যারা, নয়নে গলিত ধারা, ফুকুরে কাঁদিয়ে
তারা, তবু তো জুড়াতে পারে।
অভাগা পুরুষ জাতি, দহিতেছে দিবা রাতি, তথাপি নাহি
শকতি, ডুকুরে ডাকিতে তোরে॥

৭

জুড়াতে আর্ নাহি স্থান, সব শ্মশান সমান[১২]
এ দুখের পরিমাণ, অন্যে কি করিতে পারে ?
কারে কই আর্ মনের কথা, কে বুঝিবে প্রাণের্ ব্যথা ?
অথবা পাল্‌টা (কারে কব মনের কথা, কে আরো বুঝিবে ব্যথা ?)
তুমি যথা, আমি তথা, যে ভাব গেল রে দূরে[১৩] ?

৮

তীর্থে তীর্থে[১৪] ভ্রমি যবে, কি আনন্দ আহা তবে,
খাটি সুখ সম্ভবে ভবে, ভাবিত মন্ হর্ষ ভরে ?
গ্রন্থি বাঁধা* তীর্থ নীরে, কি রসতায়্ ক'রেছি রে ?
তেমনি ক'রে আবার্ ফিরে, যাবার্ সাধ্ যম নিল হ'রে[১৫]।

৯

ডুবিয়ে রোগ সাগরে, জর জর কলেবরে,
পড়িয়ে ছিলে যে ঘরে, তবু জুড়াতে আমারে ?
কে তোর সে সুধা-স্বরে, সে পবিত্র প্রেম ভরে,
অভাগা তোয়্ এলে ঘরে, সম্ভাষিবে তেমন্ ক'রে !

১০

নিতান্ত কাতরা নিজে, (আহা কি যাতনা সে যে,)
তবু পতি সেবা কাজে, ভার দিতে সকলেরে ?
হয় যাতে সব পরিপাটি, কিছুতে না ঘটে ত্রুটি;
যে সব কথা খুঁটি নাটি, সুধাতে বুঝাতে ধীরে !

১১

যা কিছু সাজায়ে ঘরে, রেখে গেছ থরে থরে,
দেখে কেবল মরি ঝুরে, সব আমারি সুখের তরে ॥
তোমার নিজ সুখের মতন, কিছুই তো তায় নাই আয়োজন,
যে নিঃস্বার্থ প্রাণের যতন আর কি পাব সংসারে ?

১২

এত যে প্রাণের নিধি, উভয়ে অভিন্ন হৃদি.
নিদয় হ'য়ে কেন বিধি, সে অভিন্ন ভিন্ন করে ?
এই ছিল এই নাই, আর না দেখিতে পাই
কোথা গেল ভাবি গো তাই, মিলিবে কি দেহান্তরে ।

১৩

সে কথা কেউ বলে যদি, তবু তো পরাণ বাঁধি,
আশা ভরে ভব নদী পারের তরে রই এ পারে !
কিন্তু তা যে কেউ বলে না,
সবাই বলে আর পাবে না,
হুতাশে প্রাণ বাঁচে না—
নিরাশে হৃদয় দগ্ধ করে ।

১৪

ভেবে তাই বুঝেছি সার, সে যদি না হ'লো আমার,
বিচ্ছেদ ভয় নাই প্রণয়ে যার তারেই এবার রব ধরে !
দয়াময় দেও পদে-ছায়া, ঘুচাও সব অনিত্য মায়া,
তুমিই পুত্র, পতি জায়া, মন যেন মোর মনে করে !

[উহারই কিছুদিন পরে ঐ বিষয়ে—বাটীতে সরস্বতী প্রতিমা পূজার দিনে নিম্ন গান রচিত।]

রাগিণী

তাল—ঠেকা বা ঢিমা তেতালা

(পুরাতন গান—দুর্গা নাম জপ ওরে রসনা আমার। দুর্গমে শ্রীদুর্গাবিনা কে করে নিস্তার ?—এই সুরে)

শ্রীপঞ্চমী এবার্ আমার্ শ্রীহীনা হ'য়েছে।
স্বর্গের দেবী এলেন ঘরে, ঘরের দেবী স্বর্গে গেছে।
বসন্ত পঞ্চমী এবার কি কাল্ আমার হ'লো ?
সরস্বতী এলেন, ঘরের সরস্বতী কোথায় গেলে—ঘরের
সরস্বতী আমার, গুণবতী কোথায় গেল—সতী
গুণবতী; ঘরের্ সরস্বতী কোথায় গেল ?

১

বর্ষে বর্ষে কতই হর্ষে, পুষ্পাঞ্জলি পরে[১৬]
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, (আমি) পূজিতাম্ তাহারে[১৭] ?
হৃদয়-মন্দিরে আমার্, সে পুষ্প রয়েছে ;
পুণ্য বেদী ! শূণ্য হৃদি। কারে আর্ পূজিব বল[১৮]।

২

প্রতিমা পূজা আরতি, নাতি পুতি ল'য়ে ,
সকাল হ'লো, তবু যেন, (এবার) সকল্ গেছে বিকল্ হ'য়ে !
লোটা বেগুন গোটা সিমে, কি আমোদ হয়ে ছিল ?
বিধির বাদে, সে সব্ সাধে, বিষাদের বিষ্ মিশাইল[১৯]।

৩

সাল আটানব্বই, পৌষ চ'ব্বিই, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী
শশী বারে, খসি গেল, আমার হৃদয় শশী ?
(পালটা) আমার সেই হৃদয়ের শশী।
সন্ধ্যা কালে, করাল্ কালে বিকট হ'য়ে এলা[২০] !
আমায়্ ছেড়ে, আমার্ হৃদয়মণি কেড়ে নিয়ে গেছে ?

৪

সে মনে·বিনা অবনী; (আমার) আঁধার হ'য়ে গেছে ?
সেই দিন হ'তে আমাতে কি পদার্থ আর্ আছে ?

খাই পরি—যা করি, যেন, আর্ কে ক'রে গেল[২১]।
কষ্ট হাসি মুখে, কিন্তু বুকে বাজে শক্তি শেল[২২]।

৫

ছেলে আছে, বউ আছে, (আছে) নাতি নাত্নী কাছে।
কিন্তু সে আনন্দ-ফল্ আর, ফলে না মোর ভাগ্য-গাছে
একে শূণ্য দিলে দশ, সেই এক্ ফেল মুছে
তাতে যা হয়্, আমার ভাগ্যে সেই অংকপাত্ রয়ে গেছে !

[তাহার কিছু দিন পরে রাত্রে এক ঘুমের পর উঠিয়া বারাণ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ এই গানটি হইল।]

রাগিনী—বেহাগ ॥ তাল—জলদ তেতালা।

ছি ছি রে, স্মরণ্ ! তোর্ স্বভাব কেমন !
দোষ নাহি ধর, শুধু গুণ তার, কর হৃদে উদ্দীপন্ ?

১

তুমি বল দোষ কৈ ?—আমি বলি দোষ তো ঐ,
অন্য দোষ পেলে কি হই, এরূপে শোকে মগন্ !

২

(আভোগ)

সাথী রেখে[২৩] পলাইল, ইথে কি দোষ্ না হইল ?
কারে সঁপে দিয়ে গেল, যারে বলিত আপন্ ?
তেজিবে মন্ ছিল যদি, তবে কেন বাল্যাবধি,
নিরবধি প্রেম-নিধি, দিয়ে করিলে যতন্[২৪] ?

৩

সে কি সামান্য পীরিতি, যাহে মুগ্ধ হ'য়ে পতি,
তেজি কুমতি কুগতি, তারেই সঁপে দিল মন ?
সে কি সামান্য প্রণয়, যাহাতে পতি-হৃদয়-ত্যজি
তন্ময় হ'য়ে সমর্পিল মন !
সে পতিরে এ অকালে, কি ব'লে সে গেল ফেলে;
সাথে নিয়ে যেতে চ'লে, ভার কি হ'লো এমন্ ?

৪

কাঁদিয়া কাটাই নিশা; দিবসে হারাই দিশা,
শান্তি, শক্তি, বুদ্ধি কৃপা, জীবনে যেন মরণ

বটে নিজ কর্ম্ম ফলে, এ অনলে মর্ম্ম জ্বলে,
কিন্তু তার ধর্ম্ম বলে, করে না কেন মোচন।
করে না কেন মোচন[২৫] ?

ঐ সময়। Same Subject

রাগিণী

তাল—আড়া খেম্‌টা।

(হ'লো) এক্ অভাবে কি দশা মোর্, দেখ্‌না যমরাজা
আমায় রেখে, তোরে ডেকে, কেন, দিলি এমন্ দারুণ্ সাজা ?

কারে দিয়েছি মনস্তাপ[২৬]
কে দিলে এ নিদারুণ পাপ ?
কি এমন পাপ ক'রেছি বাপ[২৭]—
অশ্বথ ক'ল্লে বেজায় ভাজা ॥
চিত্র গুপ্তের গুপ্ত খাতায়[২৮]
দেখ্‌বো রে বাপ্[২৯] কি লেখা তায় ?
কায়েত্ হ'য়ে কায়েত্ জ্বালায়
ঠিকে মিলায় না তো দিয়ে গোঁজা[৩০] ?

শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত বাবু শারদাপ্রসাদ ঘোষের বাটীতে ৺দোলোৎসবে হাফ্ আখড়াই সুরে হরি-গান বাঁধিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে পাকা দলে রাস্তায় গাওয়া হয়। আমার দ্বারা তাঁহারা নিম্নলিখিত গান বাঁধাইয়া লয়েন।

সন ১২৯৮ সাল। ফাল্গুন বা চৈত্রের প্রথম।

মহড়া

ল'য়ে ব্রজরাজ, হরি খেলিব আজ্ তোরা
সাজ্ গো সাজ সজনি।
মিলে গোপিণী সকলে; শ্রীদোল-মণ্ডলে,
[এই টুকু লেখার পর আর লেখেননি]

ইং ১৯০৬ সাল। বাং ১৩১৩ সাল।

যে সময়ে মনোমোহন বাবু তাঁহার স্ত্রী পৌত্র বরেন্দ্রকৃষ্ণের সহিত তীর্থ যাত্রায় বাহির হন। ১২৯৫ সালের মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত।

গ্রহণ দিবসে কাশী পোঁহুছিয়া অষ্টাহকাল পরে কাশী ছাড়িবার সময় এই গান।

রাগিনী— তাল—

এই অষ্টাহ কাল পরে তোরে ত্যজিলাম কাশী।
পরে তোরে যেন ভাল ক'রে; দেখি আবার্ ফিরে আসি।

(১)

আমার আসা হ'ল এই চতুর্থ,
তবু আসা আস্‌তে আবার
বুঝি সস্ত্রীক আসার ফল এবার যেন
আরো বিমল সুখে ভাসি।

(২)

গ্রহণ কালে কাশী তীর্থে ধন্য
হেথায় মুক্তি স্নানে হয় মহাপুণ্য
পত্নী পৌত্র ভৃত্য লয়ে সেই
গ্রহণ দিন আগেই এলাম বারাণসী।

(৩)

ভগ্নী বিন্দু ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণ ভাই
হেথায় তাদের গুণের অবধি নাই
তাদের যুগল্ বিধুমুখে সদাই
কিবা সরল্ মধুর আদর হাসী।

(৩॥০)

ভাগ্নে ভাগ্নীদেরো তেমনি যতন্
প্রাণের রতন তারা হৃদয়ের্ ধন্
তাদের ছেড়ে যেতে চায় না তো মন
কিন্তু না গেলে নয় তাই আজ যাই।

(৪)

চ'ল্লেম যাত্রা ক'রে আজ বিন্ধ্যাচলে,
(তারপর) প্রয়াগ মথুরা গোকুলে,
দিল্লী, জয়পুর, হরিদ্বার অঞ্চলে,
আগ্রা সাবিত্রী পুষ্কর প্রয়াসী।

(৫)

দেখো সিদ্ধি দাতা গণেশ দাদা !
(যেন) পথে না হয় কোন বিঘ্ন বাধা,
তোমার (আপনার) যেমন পেট্‌টী নাদা,
তেমনি বরেণের হয় বর প্রত্যাশী ।

(৬)

ফিরে, অযোধ্যার সরযূ জলে;
যেন স্নান করি কুতূহলে,
মধু গয়া সারি শেষ কালে,
দেশে ফিরে যেতে অভিলাসী ॥

তীর্থভ্রমণের দ্বিতীয় গান ।—

রাগিণী— তাল—

কাশী ছাড়ি, কলের গাড়ি চড়ি, তীর্থপথে যাই !
গিয়ে মির্জাপুরে রতিকান্ত ডাক্তার গৃহে রাত কাটাই—

(১)

প্রাতে পরদিন যাই বিন্ধ্যাচলে;
যোগ মায়া ভোগ মায়ার স্থানে
অবগাহন করি গঙ্গাজলে,
পূজা দিয়ে ফিরিলাম সবাই ।

(২)

বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন, হয়নি তখন,
করলেম মির্জাপুর তাই প্রতিগমন;
সহর আর দেবী স্থান নিকট কেমন;
যেমন, কালীঘাট আর কলিকাতাতেই ।

(৩)

ফিরে ডাক্তার ঘরে করি ভোজন
হ'ল অপরাহ্নে প্রয়াগ গমন,
শ্যালক নগেনের তথায় যতন;
আহা জন্মে তাহা ভুলবো নাই !

(৪)

সাথে পত্নী পৌত্র বরেন কুমেদ্ ভৃত্য
সবাই দেশভ্রমণে হর্ষচিত্ত
যথা যাই তথা তাই আমোদ নিত্য
কোন সুখ সুবিধা অভাব নাই ;

(৫)

মহা প্রয়াগ্ মেলা তখন, সেই মাঘ মাসে,
ছিলেন স্বজন কজন্ সে মাস কল্পবাসে—
সাক্ষাৎ কল্লেম গিয়ে তাঁদের কুটীর বাসে,
তেমন হাজার ২ কুঁড়ে তথায় দেখ্‌তে পাই।

(৫॥)

পুণ্যময় বেণী ঘাট তীরে চড়ায়
কেশ মুন্ডন কান্ড অসংখ্য তায়
সংগম স্নানে রত সেদিন লক্ষ লোক প্রায়,
ধন্য হ'লেম আমরা ও স্নান ক'রে ভাই ?

(৬)

স্নানে কষ্ট একে যুতকায় সেই শীত কালে,
আবার বস্ত্রে টান কে দিলে জলে,
দেখি আমার কোঁচায় আর তাঁর অঞ্চলে,
গিন্নি গাঁট্‌ছড়া এক, বাঁধছেন তথাই।

(৭)

দেখে বল্লেম, ডেকে "ওগো হায় কি করো—
একবার বন্ধনে এই সংসার কিংকারো
নবীন ডোরে জোরে আবার বাঁধলে আরো
বৃদ্ধকালে কি সে নিস্তার্ পাই।"

(৮)

বল্লেন "বুড়ো হ'লে তবু রং ছাড়না
সামনে ছেলে পিলে, ছি ছি তাও মান না,
তীর্থে কর্ত্তে হয়্ যা, আজো তাও জান না,
গুরুজন, উপদেশ বাঁধছি তাই।"

(৯)

শুনে বল্লেম "ভুলে গিছলেম্ বটে
যুগলভাবে তীর্থ কাজে অধিক্ পুণ্য ঘটে
ক্ষমা ভিক্ষা চাই তাই করপুটে"
...দম্পতি বাদ তায় ঘুচলো বালাই।

(১০)

গঙ্গা যমুনার মিলন্ কি শোভা।
তীরে মহাকেল্লা, তার জেল্লা কিবা,
কামান্ গোলার স্বাদ রাজ শক্তি নিজ,
নিশান্ পতো পতোতায় উড়্ছে সদাই।

(১১)

কভু পান্সী ক'রে ঘুরে ফিরে,
বেড়াই যমুনায় আনন্দ ভরে;
কিবা মনোলোভা শোভা দুপারে
কত রম্য দৃশ্য দেখি কত ঠাঁই!

(১২)

তেরো দিন পরে সেই প্রয়াগ ছাড়ি
সুখে চড়ি আবার বাষ্প গাড়ি,
সারা দিন রাত ভুগে তার ঘড় ঘড়ি (বা) হড় হড়ি,
পরদিন্ মধ্যাহ্নে আগ্রা পাই।

(১৩)

দূরে দেখি তিন গম্বুজ বিখ্যাত,
কিবা শ্বেত মর্ম্মরে সুনির্ম্মিত
যেন বিশ্বকর্ম্মা বিরচিত
রোজা তাজমহল নাম কীর্তি বাদশাই।

(১৩॥)

আগ্রার বন্ধুর ভাই গিয়ে ষ্টেশনে
তাঁদের বাসায় আন্লেন কি যতনে
ভোজনেতেই যাই সব অনুমানে
তাজমহল দেখতেই সব আসছে ভাই?

(১৪)

কাছে গিয়ে আরো হই আশ্চর্য্য
মরি কি অদ্ভুত শিল্প চাতুর্য্য
নানা মণিরত্নে তার কারুকার্য্য
এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই।

(১৫)

দুর্ল্লভ নানা বর্ণের যত শিলা দিয়ে,
ধ্যানে লতাপাতা ফুল গাঁথিয়ে,
যেন রেখেছে ছবি আঁকিয়ে,
দেখ্‌তে ঠিক স্বাভাবিক, তুল্য তার নাই।

(১৬)

কবি কালীদাস বই তার বর্ণনা
অন্য সামান্য জন কেউ পারে না,
সূক্ষ্ম শিল্পময় সেরূপ যোজনা,
গল্প কাব্যের কল্পনাতেও না পাই।

(১৭)

সে যে যমুনার তটিনী তটে,
যেন বিচিত্র এক চিত্র পটে,
আবার আগ্রা তার কিছু নিকটে
দেখে বিস্ময়ে আত্ম হারাই !

(১৮)

কিবা সে দুর্গ নিম্মাণ প্রতিভা,
রক্ত প্রস্তরময়, তার উজ্জ্বল বিভা,
শোভা সর্ব্বমতে চিত্ত লোভা—
দেখে ধন্য মোগল ব'লতে চাই।

(১৯)

আগ্রা ত্যজি যাই মধু মথুরা
দেখি তথাও যমুনা প্রখরা,
ঘাটে ঘাটে জলে এত কূর্ম্ম ভরা
একটু স্নান করবার স্থান পাবার যো নাই।

(২০)

শ্যামের নব যৌবন লীলার অংশ
দুষ্ট মাতুল কংস করি ধ্বংস
উদ্ধার কল্লেন মা বাপ যদুবংশ
ব্রজের সেই রাখাল দুভাই—কানাই; বলাই !

(২১)

শুনে কংস শ্বশুর জরাসন্ধ,
হ'য়ে শোকে তাপে কোপে অন্ধ;
ল'য়ে অগণ্য সৈন্য প্রবন্ধ,
ক্রমে আবার বার আক্রমে তথাই !

(২২)

সেই উৎপাত নিবারিতে হরি
সাধের মধু ভুবন পরিহরি
সিন্ধু মাঝে এক অপূর্ব্ব পুরি
(পালটা) সিন্ধু মাঝে শ্রীদ্বারকা পুরি
নির্ম্মাণ ক'ল্লেন যার উপমা নাই !

(২৩)

সেই হ'তে মথুরা মহাতীর্থ
কত সাধক ভক্ত হয় সিদ্ধার্থ
তেম্নি অর্থভুক বণিক কৃতার্থ
তাদের বিভব ব্যবসার অন্ত নাই !

(২৪)

তথায় শেঠ বংশের সুকীর্ত্তি সুনাম।
বহু বিগ্রহ সেবার নাই বিরাম
আজো মল্লভূম সেই মথুরা ধাম
ইংরাজ রাজশাসন স্থান নাম জিলা তাই।

(২৫)

দেশী ভাস্কর কার্য্য তথায় কি আশ্চর্য্য
বালক প্রহ্লাদ মূর্ত্তির কি মাধুর্য্য !

বৃন্দা দূতির ভাবে কি সৌন্দর্য্য !
প্রভু গৌরাং দেখে প্রাণ জুড়াই !

(২৬)

ত্যজি মথুরা যাই শ্রীবৃন্দাবন,
রাধা কৃষ্ণের নিত্য লীলা ভুবন
(ছিল) কৃষ্ণ প্রেমময় গোপ গোপীর জীবন
তেমন অনন্ত প্রেম বিশ্বে আর নাই !

(২৭)

কিন্তু দর্শন্ ক'রে নিরাশ হ'লেম্—
মথুর্ সেই বৃন্দাবন্ নাহি পেলেম
আছে নাম্ ব্রজধাম্ কেবল্ দেখ্‌লেম্
অগ্নি নিবে রয়্ ছাই বুঝ্‌লেম্ তাই !

(২৮)

মহা কবীন্দ্র ব্যাসদেবের চিত্র
কবি জয়দেবী ছবি বিচিত্র
কীর্ত্তন গানের যে সব লীলাক্ষেত্রে,
আসল যে সকল্ স্থল্ খুঁজে না পাই !

(২৯)

দেখায় প্রাচীর ঘেরা যে নিধুবন,
সে তো আধুনিক উদ্যানের মতন !
কোথায় মধুময়্ সে সব কুঞ্জ কানন্
দেখে দুধের সাধ হায় ঘোলে মিটাই !

(৩০)

একটি তমাল গাছে কি দাগ্ দেখায়্,
প্রভুর পদ চিহ্ন ব'লে জানায়্
অবোধ সরল প্রাণ সব যাত্রী ভুলায়—
নবীন দেখিয়ে বুঝায়্ প্রাচীন তাই !

(৩১)

(ফেলে) একটি নব্য সহরকে কয় সেই বৃন্দাবন,
বৈষ্ণব বাসা বাড়ীর নাম কুঞ্জ এখন !
দেউল মন্দির বিভব মণি কাঞ্চন,
পূজা আরতির ধূম তায় ত্রুটি নাই !

(৩২)

দেখ্‌বার যোগ্য আছে একটি মন্দির
নন্দের কালের না হক, বহুকালের তা স্থির
দেখে উদয় হয় ভাব মনে গভীর
তেমনি শিল্পী কেন দেশে আর নাই !

(৩৩)

যেমন উচ্চ তেম্‌নি সুন্দর গঠন,
পাষাণ খোদাইয়ের নৈপুণ্য তেমন
ছিল গোবিন্দজীর পূর্ব্ব ভবন,
এখন চৈতন্য দেব স্থিত তথাই !

(৩৪)

উচ্চ চূড়ার আলো তার আগ্রা হ'তে
দুষ্ট আরঙ্‌জেব পেয়ে দেখিতে
হিন্দু দ্বেষে হুকুম দিলে ভাঙ্‌তে,
দেব্‌তার বৈরী দৈত্য কবে তাই নয় ভাই ?

(৩৫)

তবু এমনি শক্ত গাথুনি তার,
মস্তক (চূড়া) ভিন্ন ভাঙ্‌তে পারেনি আর
দেহ অটুট্ আছে কি চমৎকার !
আর্য্য শিল্প কার্য্য আশ্চর্য্য ভাই !

(৩৬)

ব্রজপুর হ'তে যাই আজমীর নগর;
তিন চার ক্রোশ দূরে তার তীর্থ পুষ্কর,
তথা যেতে পথে এক শৈল সুন্দর—
গিরিশৃঙ্কট পথ সংকীর্ণ তথাই !

(৩৭)

যেন প্রকৃতি সেই পর্ব্বত চিরে;
তারে রেখেছেন দ্বিখণ্ড ক'রে
মরুপথ তাদের অভ্যন্তরে
একা গাড়ী যায় আর স্থান পাশে নাই।

(৩৮)

অতি উচ্চ দ্যাল্ পথের দুধারে,
যেন ঘাড়ে পড়ে এই শঙ্কা করে,
আবার যেতে হয় তায় প্রায় আঁধারে,
ভেবে দেখ তাতে কি কষ্ট ভাই !

স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ব্যতীত আর সব অজন্ত
হরিদ্বারে ১২৯৪ সালে নিম্নলিখিত গানটি প্রস্তুত হয়।

(১)

হরিদ্বার পুর প্রবাহিনী (এমনি গন্ধে সুরধনী)
কিবা সুশীতল তথা বিমল তরঙ্গ শ্রেণী।
শিলাময় বুঝি তল, তাই এত নিরমল;
তাই এত স্নিগ্ধ জল, হিমশীলা স্বরূপিণী,

(২)

কিবা কল কল রবে, অতি দ্রুতগতি ভাব,
নিরখি অনন্তভাবে, নিতান্ত বিস্ময় মানি !
তরঙ্গোপরে তরঙ্গ, তিনেক নাহি হেরি ভঙ্গ,
এ অশ্রান্ত স্রোতরঙ্গ, নিত্য কোথা পাও জননী।

(৩)

নীলেশ্বর বিলেশ্বর, দুকূলে দুটি ভূধর,
মধ্যে প্রবাহ সুন্দর, মর্ত্তে যেন মন্দাকিনী।
ধবল শিবমন্দির, শোভিত দুই গিরিশির,
নীলাঙ্গে শ্বেত শেখর, দূরে হতে অনুমানি॥

(৪)

যে ঘাটে প্রতিমা তব; মৎস্যরঙ্গ অসম্ভব;
কেহনা হিংসে যে সব, তব 'প্রিয় প্রাণী জানে,
যাত্রী দত্ত খাদ্য পেয়ে, (তোরা) দলে দলে আসে ধেয়ে;
হাতে হ'তে কি নির্ভয়ে, কাড়ি ল'য়ে যায় টানি !

(৫)

যে ঘাটে অবগাহনে, পাড়ে পড়ে মৎস্যগণে
এত মৎস্য একস্থানে, কোথাও না দেখি শুনে !
দীপমালা সন্ধ্যাকালে, ভক্তগণ্ ভাষায় সলিলে,
অমনি ডুবায়ে ফেলে, লম্ফে ঝম্ফে পুষ্প হাসি ।

(৬)

দেখিতে কৌতুক বটে, যাত্রী আর মৎস্যর হর্ষে,
জলে কিন্তু কাদা উঠে, করে মস্ত দধি খানি,
সে ঘাটে স্নান্ মহাপুণ্য, ভক্ত ভিন্ন কিন্তু অন্য
বারি হেরি হ'য়ে ক্ষুণ্ন, অন্য ঘাটে যায় তখনি ॥

(৭)

দক্ষিণে কন্‌খল গ্রাম, মহাতীর্থ দক্ষধাম,
সতী দেহ ত্যাগস্থান. দক্ষে স্বশূলপানি,
(এই) উভ তীর্থ মধ্যে স্থিত, শ্বেতাঙ্গশিল্পী নির্ম্মিত
গঙ্গা খাল নামে খ্যাত, বিশাল নহর খানি ।

(৮)

বৈজ্ঞানিক বিদ্যাবলে, বিচিত্র যন্ত্র কৌশলে,
মা গঙ্গার অবহেলে, (সেই) গঙ্গাখালে আনে টানি ।
বারি হীন কত দেশ, উর্ব্বর করি অশেষ,
কানপুরে মিলালে শেষ, (যেই) কাটিগঙ্গা গঙ্গায় আনি ॥

(৯)

আদি স্রোত তাহে ক্ষুন্ন, বর্ষা ভিন্ন অতি শীর্ণ
মা যেন হায় জরাজীর্ণ, সামান্য এক নির্ঝরিণী—;
কোথা বাসে উর্ম্মিলীলা উত্তাল তরঙ্গমালা,
কোথা জল জন্তু খেলা, কোথা বাণিজ্য তানী ॥

(১০)

উত্তরে ক্রমে উন্নত, পর্ব্বতোপারপর্ব্বত;
গোমুখী কেদার পথ, তব পিতৃরাজধানী,—
অগণ্য শৈলকানন, বিস্তীর্ণ অতি ভীষণ,
ভেদি কর আগমন, ধন্য, করিতে ধরণী ॥

(১১)

লক্ষ্মণঝোলা তীর্থপথে, কত কষ্ট পার হতে,
বসাইয়ে রজ্জু ঝোলাতে, পারে লয়ে যেত টানি।
যে কষ্ট মোচন হেতু, তব বক্ষে বান্ধি সেতু,
স্থাপিয়াছে কীর্তিকেতু কীর্ত্তিমন্ত এক ধনী॥

(১২)

অগম্য গুহা বন্দর, তুষারময় শেখর,
তোমার সূতিকাগার, কোথা কিরূপ কি জানে,
সবে মাত্র এই জানে, তুমি পাষাণ নন্দিনী,
তবু মঙ্গলরূপিণী,—সর্ব্বত্র শুভদায়িনী,—॥

(১৩)

জন্ম মত (তব) কর্ম্ম নয়, কর্ম্ম, দয়া ধর্ম্ম ময়,
যথা যাও, সংহতি রয়, কল্যাণ পুত্র আপনি,
কতশত নির্ঝরিণী, কতশত স্রোতস্বিনী
তাদেরো করি সঙ্গিণী, সাগর অভিসারিণী॥
(অথবা হ'ও সিন্ধু গামিনী)

(১৪)

পথে যত রাজ্য ভূমি যাও গো মা অতিক্রমি,
তাদেরো করো মা তুমি, পুণ্য ফল প্রসবিনী,
সবচেয়ে হরিদ্বার, প্রিয় স্থান মা তোমারো,
স্বর্গদ্বার নামে তার, পুরাণ তাই যশঃ ধনী—॥

ডায়েরিতে গানগুলি লিখতে গিয়ে অনেকস্থলে মনোমোহন সংযোগ বিয়োগ করেছেন। আমরা এখানে শুদ্ধ রূপটিই গ্রহণ করেছি। যে অংশগুলি বর্জন করেছেন তার উদ্ধারের প্রয়োজন আছে। কবি মনের খেয়াল অথবা গানের সুরের সঙ্গে তালের সামঞ্জস্য ঘটাতে হয়তো এ ছাড়া উপায় ছিল না। এখানে বর্জিত অংশগুলি (গানের মধ্যে ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী) উদ্ধার করা হলো।

১. এ ভব
২. ডেকে নিতে মোরে
৩. রহিতে না পারি গেহে
৪. সহস্র সন্তান স্নেহে

৫. সান্ত্বনা কি দিতে পারে !

৬. বাঁধিল

৭. চিতা যেন

৮. জনম

৯. প্রকাশিতে লাজে বাঁধে

১০. যে হয়

১১. কভু লাল কালিতে কেটে 'স্বপ্নে' লিখে
আবার কেটে দিয়েছেন ।

১২. যথা যাই যেন শ্মশান

১৩. রব যথা রবে তথা, সেকথা কি রাখিল রে ?

১৪. দোঁহে

১৫. ৮নং গানের পর নিম্নলিখিত অংশটি বর্জন করেছেন ঃ

৭

পতিপুত্র নাতি কোলে, পুণ্যধামে গেলে চ'লে,
ধন্য রবে তাই সকলে; পুণ্যবতী কয় তোমারে !
কিন্তু সে প্রবোধ বচনে; কানে যেন বজ্র হানে,
বিরহ কি যুক্তি মানে ? ধৈর্য্য বুদ্ধি উত্তাল হলে !

৮

যত কিছু দেখি ঘরে—যা রেখে গেছ থরে থরে,
আমারি সুখেরি তরে, তোমার সুখের কিছুই নয় রে ?
কিবা মধুরতা-ময়, যত্ন চিহ্ন সমুদয়,
হেন নিঃস্বার্থ-হৃদয়, পাব কি আর এ সংসারে ?

৯

ডুবিয়ে রোগ সাগরে, জর জর কলেবরে,
পাড়িয়ে ছিলে ঘরে, তবু জুড়াতে অন্তরে !
কে আর সে সুধা-স্বরে, সে পবিত্র প্রেম-ভরে
অভাগা তোর পতিরে, জুড়াবে তেমন করে ?

১৬. দেবী পূজা পরে

১৭. দিতাম, সে দিত আমারে

১৮. অঞ্জলি আর কারে দিব—শূন্য বেদী পরে আছে ।

১৯. মিশায়েছে

২০. এসে

২১. তা করিছে

২২. মুখে কষ্ট হাসি, বুকে শক্তি শেল বিঁধে রয়েছে।

২৩. শেল হানি

২৪. সেবন

২৫. (পাল্টা) সতীত্ব ধরম বলে,

২৬. কি পাপে এ মোর্ মনস্তাপ্

২৭. 'কি এমন পাপ করেছি বাপ' এই লাইনের পর এই দুটো লাইন কেটে দিয়েছেন—

হেথায়্ বল্‌তে না পারিস বাপ
(তবে) দূত্ পাঠিয়ে সেথায় নে যা ॥

২৮. খাতার পাতায়

২৯. কি লেখা হায় বল্‌না আমায়।

৩০. সাঁচা লেখায়্ কিসে মিলায় গোঁজা

সপরিবারে মনোমোহন

পরিশিষ্ট

সমাজচিত্র

(পূর্ব ও বর্তমান)

অথবা কেঁড়েলের জীবন

মুখবন্ধ

"সকল কর্ম্মের ওস্তাদ আমি, সাকরেদ কারো নই !"

আমি কে, কোন্ বংশে জন্মিয়াছি, আমার নিবাস কোথায়; সে কথায় কাজ কি? আমার জীবন-বৃত্তান্ত লইয়াই কাজ। কেন? আমার জীবনে এমন অসাধারণত্ব কি আছে, যে আমার জীবন বিবরণ সমাজের কোনো কাজে লাগিবে? আমি কি রণজিৎ সিং না শিবাজী? তা হব সাধ্য কি? তা হলে আপনার জীবন আপনাকে লিখিতে হইত না! আমি কি চৈতন্য না রামমোহন রায়? তা দূরে থা'ক্, আমি কি ঈশ্বর দোষ না কেশব সেনের ন্যায় কোনো ধর্ম্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক? আমি তাও নই। তবে আমি কি কৃষ্ণপান্তি, রামদুলাল সরকার বা মতিলাল শীল? তাও নই। দ্বারকানাথ ঠাকুর কি রামগোপাল ঘোষ? তাও নই। গোপাল ভাঁড় বা ল'কে কাণা? তাও নই। মহারাজা, রাজা বা রায়বাহাদুর? তাও নই। তবে আমি কি ছাই, যে, আমার জীবনে সাধারণে আদর করিবে, লোকে চমৎকৃত হইবে, সমাজের উপকার দর্শিবে?

যদিও আমি ওসব কিছুই নই, যদিও নই; কুলাচার্য্যের পূজ্য গোষ্ঠীপতি নই; পরান্নভোজী সামান্য সরকার বা বোতলের দোকানদার হইতে অথবা মাথায় করিয়া পান বেচিতে বেচিতে কমলার বরে ক্রোরপতি হই নাই; সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক নই; বাঙ্গালীর মধ্যে বীর নই; অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলশালী মহিমান্বিত পুরুষ নই; অথবা অসম্ভব হাস্যরসোদ্দীপক উপস্থিত বক্তাদি কিছুই নই—যদিও আমার দীর্ঘ জীবনে কোনো গুণে অসামান্যত্ব আছে কিনা সন্দেহ, তথাপি আমি এক জন!

কিসে এক জন? কেঁড়েলিতে অদ্বিতীয় একজন! এই জন্য আমার নাম কেঁড়েল। এ নাম আমি আপনি গ্রহণ করি নাই, অথবা এখনকার কোনো কোনো জমীদার প্রভৃতি বড় মানুষেরা যেমন বড় বড় সাহেবদের খোসামোদ করিয়া কিম্বা লোক দেখা'নে, সংবাদপত্রে ছাপানে, জজ-মাজিষ্ট্রেট-কমিশ্যনর-ভুলা'নে, গবর্ণমেন্ট ঠকানে স্বদেশ-হিতৈষীর সং সাজিয়া, ছটাক পাঁচ ছয় কাঁচা রাস্তা বাঁধিয়া; মোসাহেব মাষ্টার ও খোসামুদে ডাক্তার দ্বারা স্কুল ও ডাক্তারখানার ভড়ং খুলিয়া, সাহেব হাকিমকে ভেট ও খানা দিয়া, সাহেবদের অনুষ্ঠিত সাধারণ কাজে-চাঁদা সই করিয়া, পরের লেখা মুখস্থ দ্বারা সভায় গিয়া বক্তৃতা করিয়া, ভিতরে যা হউক উপরে সুচরিত্রের রং মাখিয়া "রাজা"

খেতাব লাভ করেন; তেমন জাল করিয়া আমি এই মহার্ঘ কেঁড়েল নামটী পাই নাই—ইটী আমার বিনা চেষ্টায়, বিনা ইচ্ছায়, ভাল ভাল বিজ্ঞ লোকে এক প্রকার আমার গায় ফেলিয়া দিয়াছেন—ইটী অযত্নলব্ধ রত্নস্বরূপ ভাগ্য আমায় দান করিয়াছেন। কেঁড়েলের অর্থ কি এ নাম কোন্ গুণের পুরস্কার, এ উচ্চ উপাধি কেমন ব্যক্তি ধারণ করিতে যোগ্য তাহা শ্রবণ করুন। যিনি পাঁচ বৎসরে হাতে খড়ি দিয়া পিতা ভ্রাতা শিক্ষকাদির বহু যত্নে ও আপনার আত্যন্তিক পরিশ্রমে রীতিমত বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া যশস্বী ও উপার্জ্জনক্ষম হয়েন, এ উপাধি, তাহার নহে। যিনি এক বৎসর, কি বড় জোর দেড় বৎসর বয়সে—স্পষ্ট স্পষ্ট কাটা কাটা—গোটা গোটা বোল বলিয়াছেন; আধ আধ কথা মোটে যাঁহার বদন কখনো নিঃসরণ করে নাই, একবারেই "আম" না বলিয়া "রাম" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন; যিনি হাতে খড়ির পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন; যিনি তৎপরে যখন বিদ্যালয়ে ছাত্রের পদে স্থিত হন, তখন পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যভ্যাসে মনোযোগী থাকুন বা না থাকুন, পড়া বলিতে পারুন বা নাই পারুন, কিন্তু অন্যবিধ উপায়ে অন্য বহুবিধ উপায় জ্ঞান দখল করিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণ মধ্যে, এমন কি স্থবির সমাজেও সেই অল্প বয়সে পাকা পাকা কথা কহিতে পারেন, অথচ নিন্দাভাজন হন না, কিম্বা বিরক্তি উৎপাদন করেন না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ জ্যেঠামি করেন, অথচ লোকে জ্যেঠা বলিয়া ঘৃণা ভাব দেখায় না; যিনি সেই সময় হইতেই কুট্‌কুটে বক্র শ্লেষে পটু; সাদা বুদ্ধি গাধা (যাহারা জানে ও জানায় যে তাহারা বড় বুদ্ধিমান) যিনি এমন সুবোধাভিমানী নির্ব্বোধদিগের যম; যিনি যৌবনের পূর্ব্ব হইতে গৃহবন্ধনী, উপার্জ্জন-বন্ধনী এবং "পরে আমার কি হইবে" সেরূপ চিন্তা-বন্ধনীর নিগড় হইতে মুক্ত থাকিয়া আত্ম-কাজ-বিস্মৃত, আমোদ আহ্লাদে মত্ত, পরের কাজে ও মিছা কাজে ব্যস্ত এবং দেশ পর্য্যটনে রত; যিনি বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানাপেক্ষা বৈধ কাজের বিধিদানে নিরলস এবং সাধারণতঃ কার্য্য করণাপেক্ষা আশু-রঞ্জন লিখন পঠন বচন প্রয়োগে উৎসাহী, যিনি কথাটী পড়িবামাত্র তন্মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রায় সকল বিষয়ই তলিয়া বুঝিতে ও তলিয়া বুঝাইতে প্রকৃষ্টরূপে সমর্থ; যিনি অল্প স্থলেই বাক্যে পরাস্ত হন; যিনি এই সমস্ত ও তদ্বিধ আরো কত কি করিতে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত ও অভ্যস্ত অর্থাৎ যিনি অল্প বয়স হইতেই বহু দর্শন, বহু শ্রবণ, বহু ভ্রমণ, বহু বর্ণন, বহু ভাব গঠন, বহু পরিবর্ত্তন, এবং লোক-রঞ্জন লিখন পঠন বচনের শক্তি ধারণ পূর্ব্বক বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখাইতে পারেন; বিশেষতঃ কথোপকথন কালে যাঁহার স্বাভাবিক শ্লেষাত্মক বক্র ভাবের এক প্রকার আশ্চর্য্য কার্য্য দেখা যায় তিনিই এই ভয়ানক কেঁড়েল নামের যোগ্য।

ইহা বলাতে এমন বুঝাইতে পারে না, যে কেঁড়েল হইলেই পূর্ব্ববর্ণিত সমস্ত দোষ গুণই তাহাতে থাকিবে। শূল রোগের যত লক্ষণ নিদান শাস্ত্রে লেখা আছে, শূল রোগী মাত্রকেই তৎসমুদায় কি ভোগ করিতে হয়? কোনো রোগী সিকি, কোনো রোগী

আধা, কোনো রোগী বা ষোল আনার অধিকারী। অতএব যখন উক্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরা আমাকে এই উপাধিটী দিয়াছিলেন, তখন কেঁড়েলের গুণমালার মধ্যে সমস্ত কি গোটাকতক আমাতে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তখন তো আমার অল্প বয়স, হয়তো সকল ভাব তখন পরিস্ফুট হয় নাই, এখন সেই কুঁড়িগুলি ফুটিয়া থাকিবে।

যাহা হউক আমার যত গুলি গুণেই থাকুক, নিঃসন্দেহ—আমি কেঁড়েল। আমার পিতৃ-মাতৃ-গুণদত্ত ডাক্ ও রাশ নাম আপনারা জানিতে চাহিবেন না। চাহিলেও পাইবেন না। কেননা, সে সব নাম সমাজচিত্রকরের যোগ্যই নয়!

এক্ষণে উপসংহার আবশ্যক। উপরে যে এত কথা বলা হইল, কি জন্য? কেবল বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য। কিসের বিশ্বাস? এই বিশ্বাস আমি যে গুরু কার্য্যের ভার লইলাম তৎসাধনোপযোগী উপকরণও সাধ্য আমার আছে কিনা, তাহা পাঠকগণ বিচার করিতে পারিবেন। ফলতঃ বিশেষরূপে তাঁহাদের বিশ্বাসোৎপাদনের নিমিত্ত আরো জানাইতে বাধ্য হইতেছি, যে আমি পল্লীগ্রাম ও শহরে বাস করিয়াছি, বঙ্গদেশের বহু স্থানে ও উ! প! অঞ্চলেও গিয়াছি; ডিঙ্গি, নৌকা, বোট, ষ্টিমার প্রভৃতি জলযান, বয়েল গাড়ী, বুলকট্রেন, সিকরাম, মেলকার্ট ও ইনল্যান্ড ট্রানসিট কোম্পানির ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্থল যানে চড়িয়াছি, পদব্রজের তো কথাই নাই।

ভারতবর্ষে যত জাতীয় মনুষ্য আছে, অন্ততঃ তাহার বহু শ্রেণীর সহিত ন্যূনাতিরেকে আলাপ করিয়াছি—তাহাদের রীতি চরিত্র দেখিয়াছি। কিন্তু এই চিত্রে অতদূর বিদ্যার প্রয়োজন নাই। যেহেতু বঙ্গীয় সমাজ চিত্র করাই অভিপ্রায়। তজ্জন্য এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, আমি দীনবন্ধুবাবুর মুক্তিমণ্ডপ হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাতাল বাবুদের ব্রান্ডি-ছত্র; কর্ত্তাভজার চত্বর হইতে ব্রাহ্মমন্দির; ঘেঁটুপূজা হইতে দুর্গোৎসব, মেয়েদের মধ্যে বসিয়া মণিহরণের পুঁথিপড়া হইতে কথক ঠাকুরের কথকতা; দলাদলির ঘোট হইতে রাজধানীর বড় বড় প্রকাশ্য সভা, আঁচান কাওরা হইতে মহারাজ মহাতাপচন্দ্; মাছ ধরার ছিপ চাঁচা, জাল বোনা, পাখীর খাঁচা বোনা, ফড়িং ধরা ও ধান কাটা হইতে (জুতা সেলাই ও গোচারণ পারি নাই) সদর-মেটীগিরি (মুচ্ছুদ্দিগিরি ঘটে নাই) ও গ্রন্থ রচনা, সুলভ সম্পাদকের অপাঠ্য গ্রন্থ হইতে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম (বাইবেলও); জমাদারের বাঙ্গালা বাহারদানেস হইতে মেঘনাদবধ-কাব্য; (নাম ক'র্ব্বোনা) সেই জ্যোৎস্নার কাগজ হইতে বঙ্গদর্শন; গুরুমহাশয় হইতে কাপ্তেন পামরের নিকট অধ্যয়ন ইত্যাদি বহু বিষয়ের অত্যধম হইতে এ দেশপ্রাপ্য অত্যুত্তম পর্য্যন্ত সকলেতেই আমি ছিলাম ও আছি—সকলই করিয়াছিলাম ও করিতেছি। ইহাতেও যদি এ কার্য্যের নিমিত্ত আমার প্রতি আপনাদের বিশ্বাস না জন্মায় তবে আমার দুরদৃষ্ট—তবে ফলেন পরিচীয়তে!

ফলে আমি যে সব চিত্র করিব, তাহার এক একখানি পট তুলিয়াভাল করিয়া

দেখিলেই আপনারা আমার কথার প্রমাণ পাইবেন। আর কোনো গুণ না থাকুক; যাহা বলিব তাহা সকলই সত্য; সত্য ভিন্ন মিথ্যা বড় পাইবেন না—যে জীবন চিত্র করিব তাহা সত্যকার জীবন—যে সমাজ চিত্র করিব, তাহা তখনকার ও এখনকার সত্যকার সমাজ এই আমার স্পর্ধা, ইহাতে অদ্ভুত কিছু পান বা না পান। না পান, সে সত্যের দোষ—আমার নয় !!

প্রথম পট—জন্মাবধি চতুর্থ বর্ষ

সপ্তদশ ত্রিপঞ্চাশৎ শকাব্দাঃ, আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমী, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রথম বিমান যাত্রার দুই দিবসান্তে, ঘোরা, গভীরা, জলধর পটলাবৃতা, তাহাতে যেন তিমিরাবগুণ্ঠন-ধারিণী যামিনী ঠাকুরাণী প্রথম দশদণ্ড পতিসোহাগিনী থাকিবার পর এক্ষণে বিরহিণী, সুতরাং নিতান্ত বিষাদিনী হইয়া মুখ আঁধার করিয়া রহিয়াছেন; হেনকালে টিপ্‌টিপ্‌নি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল, তিনি যেন অশ্রুপাত করিলেন! তাঁহার অন্তরের তাপ জানিতে পারিয়া অনুচর বাদুড় ভায়া তিন্তিড়ী শাখা ছাড়িয়া বিশাল দুটী পাখা নাড়িয়া বাতাস করিতে লাগিল, তাঁহার চিত্ত বিনোদনার্থ চির-সখা পেচক মহাশয় মধুর স্বরে গান যুড়িয়া দিলেন; সানায়ের যুড়ি যেমন বিরাম ব্যতীত এক ঘেয়ে 'পোঁ' শব্দ ছাড়িতে থাকে, গায়ক প্রধান পেচকের সঙ্গে ঝিল্লিও তেমনি অবিশ্রান্ত অক্লান্ত স্বর সংযোগ করিল! গ্রাম্য চোর, চৌকীদারের সহিত ভাগের বন্দোবস্ত করিয়া সচকিত অতি ত্রস্ত সন্ধি-শলাকা (সিঁধকাটী) হস্তে আস্তে আস্তে গৃহস্থের গবাক্ষ নীচে দাগ দিতেছে, সেই শুভ লগ্নে নিশ্চিন্তপুর গ্রামে মাতামহ ভবনে কর্কট রাশিতে আমি (কেঁদুেল) ধরণী পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া 'ট্যাঁ ট্যাঁ' করিয়া কাঁদিয়াছিলাম। আমি চতুর্থ গর্ভের সন্তান। এই আমার জন্মবৃত্তান্ত বা জন্মকোষ্ঠী!

আমি কুলীন কায়স্থ-কুল-সম্ভূত। মাতামহ মহাশয়ও কুলীন। তিনি কলিকাতা জেনারাল পোষ্ট আফিসের খাজাঞ্চী এবং আমার পিতা মহাশয় কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত কোম্পানির ডাকের ঠিকাদার ছিলেন। তাঁহা হইতেই ডাকের ঠিকাগ্রহণ প্রথার প্রথম সূত্রপাত হয়। সে ঠিকা একাংশে ইজারার মত, একাংশে নয়। ডাকের মাসিক ব্যয় তাঁহার সহিত গবর্নমেন্টের চুক্তি থাকিত, সেই নির্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে তিনি পাইতেন; যত ডাক-মুন্সি, তত্ত্বাবধায়ক, হরকরা ও বাঙ্গী প্রভৃতি লোকজন এবং অশ্বশকটাদি সমস্তই তাঁহার দ্বারা মনোনীত, নিযুক্ত বা অবসৃত হইতে পারিত। কিন্তু চিঠি ও পুলিন্দা প্রভৃতির যত মাশুল, তাহা সরকারী তহবিলে জমা দিতে হইত।

তিনি আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে এদেশের সমস্ত রাজবর্ত্মই তাঁহার ঠিকা-ভুক্ত হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ কাল তাহা শুনিল না—অকালেই পিতাকে হরণ করিয়া লইল? সে শোচনীয় ঘটনা নিশ্চিন্তপুরে নয়, আমাদের

নিজ বাটীতেই ঘটে। ঘটনার স্বরূপাবস্থা আমার ঠিক মনে হয় না; কেবল পিতা যখন অত্যন্ত পীড়িত, তখনকার একটী দিনের একমাত্র অবস্থা পরিষ্কাররূপে স্মরণ হয়। তিনবর্ষ বয়সের স্মরণ ভাবী জীবনে কিরূপ ভাব ধারণ করে; সুধু সেইটী জানাইবার উদ্দেশ্যেই এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। সেটি এই ঃ—

পিতা সংকটাপন্ন জ্বর-বিকারে যে ঘরের মেঝায় শয্যোপরি শয়ান ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বের গৃহদ্বারের এক বাইল ভেজান, এক বাইল অল্প খোলা, তথায় বাটীর স্ত্রীলোকেরা কেহ কেহ দেখিতেছিলেন। আমি তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহাদের অঞ্চল বা জানু-বস্ত্র ধরিয়া তাঁহাদিগেরই ন্যায় উঁকি মারিয়া দেখিতেছিলাম। কি দেখিতেছিলাম? আমাদের এবাড়ী ওবাড়ীর অত্যন্ত নিকট জ্ঞাতি এবং গ্রামের অন্যান্য আত্মীয় মহাশয়েরা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার শয্যায়, কেহ কেহ ইতস্ততঃ; কেহ কেহ তাঁহার গৃহদ্বারে, কতক বসিয়া, কতক দাঁড়াইয়া অতি গম্ভীর এবং যৎপরোনাস্তি বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতেছেন; প্রবীণ মহাশয়েরা চুপি চুপি কথাও কহিতেছেন; কেহবা আসনোপবিষ্ট কবিরাজ মহাশয়কে অনুচ্চস্বরে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কবিরাজ ঘাড় নাড়িতেছেন; যেন অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অথবা নৈরাশ্যের মধ্যেও ভরসা বাঁধিয়া ঔষধের ডিবা খুলিয়া ছোট ছোট বড়ি কয়েকটী বাহির করিতেছেন; আমার জ্যেষ্ঠতাত (আমার পিতার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র) মহাশয়ের চক্ষুদ্বয়ে হঠাৎ অশ্রুবিন্দুসমূহ ধারাকারে পতিত হইতেছে; তদ্দর্শনে আমার পিতামহী ঠাকুরাণী আমার পশ্চাৎ হইতে ছিন্নমূল কদলী তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—বিনা মেঘে আচম্বিতে বজ্রধ্বনি হইলে আমরা তখন যেমন ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিতাম, ঠাকুরমার ক্রন্দন শব্দেও তেমনি বুক ধড়্ ধড়্ করিতে লাগিল!

তাঁহাকে স্ত্রীলোকেরা কেহই ধরিল না; কেহই কিছু বুঝাইবার চেষ্টা পাইল না, তাহাতে আমি কিছু বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, ইঁহারা ঠাকুরমাকে থামাইতেছেন না কেন? এই ভাবিয়া একে একে যাঁহার মুখ পানে চাই, দেখি তিনিই ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতেছেন? দেখিয়া প্রাণ কেমন করিতে লাগিল; মাকে দেখিবার জন্য বড় ব্যাকুল হইলাম, এদিক ওদিক চাহিয়া তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না, ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। পিসীমা আমাকে কোলে করিয়া মার কাছে লইয়া গেলেন—মা সেই ঘরেরই এক পার্শ্বে সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকিয়া মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। আমি তাঁহার বুকে গিয়া পড়িলাম; তিনি আমাকে বুকে টানিয়া লইলেন; আমি তাঁহার অঞ্চল লইয়া তাঁহার মুখ পুছিতে পুছিতে কহিলাম "মা! চুপ কর, মা! চুপ কর! হ্যাঁগা মা বাবার কি—" এই পর্য্যন্ত বলিতে না বলিতে মা আরো কাঁদিতে লাগিলেন—তাঁহার বুকের উপর পড়িয়াছিলাম, বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার বুক যেন তোলপাড় হইতেছে—ফাটিয়া যায় ফাটিয়া যায় এমনি ভাব!

পিতার একটা বড় অসুখ হইয়াছে, আমি কেবল ইহাই বুঝিয়াছিলাম। আমাদেরও

তো অসুখ হয়; তাহাতে বাটী সুদ্ধ সকলেই "আহা" বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু এমন ধারা তো করে না! আজ সকলে কেন যে এমন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, যার কাছে যাই; কেউ ভাল নাই, কেউ ভাল কথা কয় না, কেউ ভালরূপে চাহিয়া দেখে না, দেখে শুনে আমার আর সয় না, বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল! "এরা কেন এমন করে?" ইহাই আমার প্রশ্ন—ইহাতেই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে আমার বাবাকে যে আর দেখিতে পাইব না, তিনি যে জন্মের মত অনাথ করিয়া চলিলেন এবং মৃত্যু বলিয়া চিরবিচ্ছেদঘটক কোনো একটী বিষয় যে জগতে আছে, সে সব তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমার এই পর্য্যন্ত স্মরণ হয়, তাহাও উপরের বর্ণনানুযায়ী সকল সুস্পষ্ট নহে, কতক বা অত্যল্প অংশ কল্পনায় পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু মূল বিষয়ের এক বর্ণও মিথ্যা নহে।

কি আশ্চর্য্য! শুনিতে পাই, প্রায় এক পক্ষ কাল পিতা উক্ত সাংঘাতিক রোগে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু ঐ দিবসের ঐ-সময়কার ঐ ঘটনাটী ব্যতীত অন্য কোনো দিনের কোনো সময়ের কোনো ঘটনা; কোন কার্য্য বা কোনো কথার তিলার্দ্ধও আমার মনে পড়ে না! যদি বলেন; হয়তো সেই সময় হইতেই স্মরণশক্তি ধারণক্ষম হইয়া আসিয়াছে। তাহাই বা কৈ? ঐ ঘটনার কত পরে—সেই দিন, কি তাঁহার পরদিন; কি অন্য কোনু দিন পিতার পরলোক হয়, কিম্বা তদানুষঙ্গিক অন্য কোনো বিষয়ের এক বর্ণও মনে পড়ে না। অর্থাৎ ঐ দণ্ডের ঘটনাবলী ব্যতীত তাহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কোনো কিছুই স্মরণ-পথে উপস্থিত হয় না। এমন কি, যে পিতার ক্রোড়ে দিবারাত্রি এত ক্রীড়া করিয়াছি; সেই পিতার মুখশ্রীও মনে পড়ে না—কেবল রোমাবলীবিশিষ্ট তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলের গঠন ভিন্ন (বহু চেষ্টাতেও) আর কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিরূপ স্মরণ করিতে পারি না। ইহাও আর এক আশ্চর্য্য!

পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, এই সব সামান্য কথা এত করিয়া কেন লিখিতেছি? তদুত্তরে নিবেদন, স্মরণশক্তির ঐ আশ্চর্য্য তত্ত্ব আমার মনে অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় বলিয়া বোধগম্য আছে। অতএব মানব প্রকৃতি—তত্ত্বজ্ঞ মহাশয়দিগের নিকট ইহার সদুত্তর পাইবার প্রত্যাশাতেই এত করিয়া লেখা!

অপিচ, শৈশবে শোকের যাতনা হয় কিনা? যদি হয় কিরূপ? তাহার পরিমাণ ও শক্তি কত? বহু চেষ্টাতেও এখন তাহা স্মরণ করিতে পারি না;—পারিলে অভিনব তত্ত্বাবিষ্কর্ত্তার ন্যায় কৃতার্থ হইতাম! অনুভব করি, অবশ্যই তাহা হয়;- পালিত পশু-পক্ষী প্রভুর বিরহে ব্যাকুল; যিনি জন্মদাতা, পালয়িতা সাক্ষাৎ স্নেহের মূর্ত্তি জনক—যাঁহার বাড়া নাই, বাপ, তাঁহার বিয়োগ-ব্যথা নর-শিশুর হৃদয়কে দলিত করিবে না, এও কি কথা!

ফলতঃ আমার মনের ভাব তখন যাহাই হউক; পিতার পরলোকে সংসার সুদ্ধ যে মহাশোকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন, তাহা আর বলিয়া জানাইতে হইবে না। হায়!

আমার অভাগিনী জননী, একে পুত্রশোকে দহিতেছিলেন, তাঁহার উপর এই! এ দুর্ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে আমার সর্ব্বাগ্রজ একাদশ বর্ষ বয়সে ইহ সংসার পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক জনক জননীর বক্ষে শেল হানিয়া গিয়াছেন। হায়! তিনি অধ্যয়ন জন্য কলিকাতায় এলেন, আর ফিরিয়া গেলেন না! তাঁহাকে আমার মনে পড়ে না; তাঁহার নাম ভুবনমোহন। শুনিয়াছি রূপে গুণে সেই ভুবনমোহন যথার্থই ভুবনমোহন ছিলেন! হায়! তাঁহার শোকেই হয়তো পিতা দেহত্যাগ করিলেন! হায়! উভয়ের নিদারুণ বিয়োগ দুঃখে জননী আমার, আর কখনো শরীরগত কি মনোগত ভাল থাকিতে পারেন নাই। এখনকার তরুণ লোক শুনিলে বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু তখনকার পুরন্ধ্রীগণের এত লজ্জা সরম ছিল যে, মা আমার লোকলজ্জায় চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারেন নাই, গুমরিয়া গুমরিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহাতেই সর্ব্বনেশে গুল্মশূলে—বিশেষতঃ দুশ্চিকিৎসা শিরঃপীড়ায় আমরণ কত যন্ত্রনাই ভোগ করিয়া গিয়াছেন? এখন তিনি পার্থিব সকল যাতনা হইতেই মুক্ত; কিন্তু সে বেশী দিন হয় নাই, সে কথা পরে বলিব। এই সব আত্ম-মর্ম্মান্তিক কথা অন্যের ভাল লাগিবে না, জানিয়াও মনোবেগ নিবারণে সমর্থ হইলাম না!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি মায়ের চতুর্থ গর্ভের সন্তান। সর্ব্বাগ্রজ, যাঁহার কথা পূর্ব্বে বলিলাম, তিনি তো বাল্যকালেই গতাসু। পিতৃবিয়োগের পর পূর্ব্ব দ্বিতীয় তখন সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ এবং পূর্ব্ব তৃতীয় তখন মধ্যম ভ্রাতা হইলেন, আমি যে কনিষ্ঠ সেই সর্ব্ব কনিষ্ঠই রহিলাম। পিতৃব্য ছিলেন, তিনিই পিতৃস্থানীয় হইলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে এখনও তাহাই আছেন। এই শোচনীয় ঘটনার সময় তাঁহার বয়স অধিক নয়—ষোড়শ কি সপ্তদশ বৎসর-বয়স্ক পঠদ্দশার যুবক।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতামহ মহাশয় উক্ত হৃদয়-ভেদক সংবাদ পাইবামাত্র অবিলম্বে আমাদের বাটীতে গিয়া তাঁহার প্রবীণ বয়সোচিত প্রাজ্ঞবৎ বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা আমার পিতামহী ও মাতাঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা দান দ্বারা প্রবুদ্ধা করিয়া খুল্লতাত মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিলেন।

তখনকার সাহেব প্রভু এখনকার মত এদেশীয় অধীনের প্রতি হতস্নেহ ছিলেন না। দেওয়ান কি কেরাণী দূরে থাকুক, মুহুরী অথবা অন্য কোনো নিকৃষ্ট আমলারও পীড়া হইলে তাহার বাটীতে পর্য্যন্ত দেখিতে যাইতেন—স্বয়ং তাহাদের বিপদে মাথা দিয়া উদ্ধার করিতেন, অন্ততঃ সমবেদনা জানাইয়া তাহাদের গুরু ভারকে লঘু করিয়া দিতেন। যথার্থ খ্রীষ্টানের ধর্ম্মানুসারে সেই সমস্ত অধীন ভৃত্যবর্গকে ভ্রাতা বা পুত্রের ন্যায় দেখিতেন; এখনকার মত স্বশ্রেণী ব্যতীত অন্য জাতীয় মানুষকে পশু জ্ঞান করিতেন না! হায়! হায়! সে দিন কি আর আসিবে? কোম্পানি বাহাদুরের সিবিলিয়ান প্রভুর ন্যায় এদেশীয় ভৃত্যের মা বাপ—এদেশীয় প্রজার মা বাপ আর কি কভু পাওয়া যাইবে? সেই কোম্পানীর সোনার রাজ্যে আর কি আমরা বাস করিতে পাইব?

উপরের এই কয়েকটি কথা শুনিতে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমার মাতামহ ঠাকুরকে ডাকঘরের সাহেবরা ভাল বাসিতেন; তাঁহারই জন্য আমার পিতা-ঠাকুর এত প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু সমাচারে তাঁহারা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ও তাঁহার কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই জন্যই মাতামহ মহাশয় খুড়ামহাশয়কে লইয়া গিয়া সাহেবদের নিকট উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট লইয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমার পিতাঠাকুরের কার্য্যভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই খুড়ামহাশয় ঢাকা রাস্তার ঠিকা লইতে সমর্থ হইলেন। এই সময়েই আমার কেঁড়েলির প্রথম স্ফূর্ত্তি? পরবর্ত্তী পটে তাহা দেখিতে পাইবেন!

দ্বিতীয় পট—কেঁড়েলির নবাঙ্কুর

আমি বলিয়াছি, "এই সময়েই আমার কেঁড়েলির প্রথম স্ফূর্ত্তি!" কোন্ সময়? তিন বৎসর বয়সের সময় পিতার পরলোক হয়, বোধ করি তাহারই কিছুকাল পরে।

ফলতঃ "উঠন্ত মুলো পত্তনেই চেনা যায়" এই প্রবাদ আমার বেলা এত খাটিয়াছে, যে, যাঁহারা স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারা ইহা পড়িয়া ভাবিতে পারেন, আমি মিছা করিয়া কিম্বা বাড়াইয়া ঘুচাইয়া আপনার বাহাদুরী জানাইতেছি, কিন্তু—Truth is sometimes more strange than fiction.

কখনো কখনো উপন্যাস অপেক্ষাও সত্য অধিক আশ্চর্য্য হইয়া থাকে। জ্ঞানী লোকের এই বাক্য তাঁহারা যেন স্মরণ করেন। প্রত্যুত, যিনি যাহা ভাবুন, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়া রাখিতেছি, যে, সমাজ-চিত্রের অনুরোধে কোনো কোনো স্থলে কোনো কোনো বিষয়, (যাহা অন্যত্র ঘটিয়াছে) সন্নিবেশিত হইতে পারে, কিন্তু আমার জীবনের মূল বৃত্তান্ত সমূহ সত্য ভিন্ন এক বর্ণও মিথ্যা হইবে না। এই প্রতিজ্ঞার পর এক্ষণে শ্রবণ করুন ঃ—

মা ও পিসিমা বলিতেন, আমি ৫।৬ মাসেই বসিতে, ৭ মাসেই হামাগুড়ি দিতে, ১০।১১ মাসেই দাঁড়াইতে এবং এক বৎসরের পরেই চলিতে পারিয়াছিলাম। কার্য্য-তৎপরতার কথা এই, বাগিন্দ্রিয়ের তৎপরতার কথা কি বলিব! তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি, আমি সূতিকাগারে 'শেযা মাসেই' হাসিয়াছিলাম; ষষ্ঠ মাসেই "বা, বা, মা, মা" বোল ধরিয়াছিলাম; অষ্টম মাসেই আমার বাক্য স্ফুটন এবং বৎসর পূর্ণ না হইতেই বাক্ পরিষ্কার হয়। আমি আধআধ ভাঙা চোরা বোল প্রায় কখনই বলি নাই, অল্পেই আমার মুখে গোটা গোটা বোল বাহির হইয়াছিল। দুই তিন বৎসরের শিশুর মুখে পাকা পাকা কথা শুনিয়া সকলে অবাক্ হইতেন।

তৎকালে সমস্ত বঙ্গদেশ-মধ্যে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে এই প্রথা ছিল, যে, পুত্র সন্তান পঞ্চম বর্ষীয় হইলে ভাল একটা দিন দেখিয়া হাতে খড়ি দেওয়া হইত। যে যে স্থলে

আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই; তত্তৎস্থলে অদ্যাপি—এই রীতি অখণ্ড আছে।

হাতে খড়ি বড় সামান্য ব্যাপার নয়। পুরোহিত বা টোলের ভট্টাচার্য্য কিম্বা পঞ্জিকাবিৎ কোনো বিজ্ঞ দৈবজ্ঞ বা কর্ত্তা ব্যক্তির দ্বারা বিদ্যারম্ভের শুভক্ষণ অবধারণ করাইয়া লওয়া হইত। সেইদিন প্রাতে বালককে স্নান করাইয়া (কুত্রাপি পূর্ব্বদিন তাহাকে নিরামিষ খাওয়াইয়া শুচি রাখার প্রথাও ছিল) নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেবগৃহে-প্রণাম করাইয়া পবিত্র স্থলে পবিত্রাসনে বসাইত। তখন হয় গুরুমহাশয়, নয় পুরোহিত, নয় কোনো গুরুতর ব্যক্তি বালকের হস্তে একখানি রামখড়ি দিয়া নিজ হস্তে তাহার হস্ত ধরিয়া মৃত্তিকাতে সঞ্চালন পূর্ব্বক কয়টী বর্ণ অঙ্কিত করিয়া দিতেন। তৎপরে দেবী সরস্বতীর উদ্দেশে প্রণাম। সঙ্গতিমানের পুত্র হইলে গুরু মহাশয় বা পুরোহিত নববস্ত্র ও দক্ষিণার "কাঞ্চন মূল্য" স্বরূপ কিছু পয়সা পাইয়া থাকেন। বিশেষ বড় মানুষের ছেলে হইলেও এক টাকার বেশী দক্ষিণা শুনা যায় নাই। গরিবের ছেলে হইলে এক পয়সা হইতে এক আনা এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইলে খড়িদাতার এক সাজ ভোজ!

কিন্তু এই ব্যয় হইতে আমার খুল্লতাত মহাশয়কে আমি বাঁচাইয়া দিয়াছিলাম। কেননা যৎকালে আমার হাতে খড়ি হইবার বয়স, আমি তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বর্ণমালা প্রভৃতি লেখা পড়া ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলাম। আমার বেস মনে পড়ে, আমার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে আমাদের বাটীস্থ গুরুমহাশয় আমাকে উলঙ্গ করিয়া আমার পরিধেয় ধূতিখানি আমার মস্তকে জড়াইয়া গাছ রামায়ণ গায়কের ন্যায় পাকড়ী বাঁধিয়া দিতেন। পাঠশালার সকল ছাত্রকে সারি দিয়া দাঁড় করাইয়া আমাকে ঘোষাইতে কহিতেন।

ঘোষানো কাহাকে বলে? তাহা এখনকার বাবুদিগকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। সারি দিয়া উক্ত প্রণালীতে সকল ছেলে দাঁড়াইলে এক ছাত্র (কখনো কখনো দুইজন) তাহাদের সম্মুখে তাহাদিগের দিগে মুখ রাখিয়া ক, খ, আঙ্ক; আঙ্ক; সিদ্ধিবস্তু; অ আ ই ঈ; কড়ানে, শতিকা শেট্‌কো গণ্ডাকো; প্রভৃতি, নামতা; সইয়ে; দেড়ায়ে; আড়ায়ে; তৎপরে শুভঙ্করের আরিজা যথা—

"কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ।
দশ বিশ গণ্ডা কাঠায় যান॥
তিন কড়া দুই ক্রান্তি।
ব'লে গেছেন ধূলো দন্তি॥"

ইত্যাকারের বহু আরিজা সেয়া বন্দি এবং চাণক্য শ্লোক প্রভৃতি সুর করিয়া এক এক নিশ্বাসের উপযুক্ত চরণ ভেদ করাইয়া পড়াইত; তাবৎ বালক তদনুসরণে পড়িত। বড় বড় পড়ুয়া পালামত পড়াইবার ভার পাইত। সে বলিল 'ক' তাবৎ বালক যুগপৎ বলিল 'ক'। সে বলিল 'আশী তিলে কড়া হয়', তাবৎ বালক যুগপৎ বলিল 'আশী

তিলে কড়া হয়'। গুরু মহাশয় বেত্র হস্তে দন্ডপাণি শমন সদৃশ চতুর্দ্দিগে পাদচারণ করিতেছেন এবং গৃধিনীর দৃষ্টিতে, কে পড়ে না পড়ে, কে ফাকি দেয় না দেয়, কে অন্যমনস্ক হয় না হয়, ইহাই দেখিতেছেন। বালস্বভাব বশতঃ যদি কেহ ক্রীড়াসক্ত হয়; অমনি আচম্বিতে বেত্রাঘাতে তাহার পৃষ্ঠে চর্ম্ম ছেদিত হইয়া শোণিত দেখা দেয়। সর্ব্বশেষে সরস্বতীর প্রণাম ঃ—

গলায় গজমতি মুকুতার হার।
দেও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার॥
ইত্যাদি।

গুরু মহাশয় সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের পাঠশালার বিষয়ে আর যে সব বক্তব্য আছে, তাহা স্বতন্ত্র পটে দৃষ্ট হইবে! আপাততঃ আত্ম ইতিহাস এই, যে,' গুরুমহাশয় আমাকে ঐরূপ ঘোষাইতে নিযুক্ত করিতেন। যে বয়সে অন্য বালকের হাতে খড়িও হয় না, সেই অত্যল্প বয়ঃক্রমে আমি ঘোষাইতে পারিতাম; একশত আটটী চাণক্য শ্লোক আমার মুখস্থ; অনেক প্রাচীন মহাশয়েরা আমোদ করিয়া তাহা শুনিতেন এবং গুরুমহাশয়ের আদেশে আমি যখন তাহা বালকদিগকে পাড়াইতাম; তখন ভদ্রাভদ্র, স্ত্রী পুরুষ অনেকেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেন; যথার্থ বলিতে ভয় কি; কোনো কোনো অপরিচিত ব্যক্তিও তচ্ছ্রবনে তুষ্ট হইয়া সহসা আমায় কোলে লইয়া বদনে চুম্বন দান করিতেন।

সুদ্ধ ইহা নহে, তখন আমি দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা ও প্রহ্লাদ চরিত্র পুথি অবলীলা· ক্রমে পড়িতাম। পুনঃ পুনঃ পড়াতে অল্প দিনে সে তিনখানি পুরাতন হইয়া আর তাহা ভাল লাগে না, এজন্য নূতন কিছু পড়িবার প্রয়াসে অন্তঃকরণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইল।

এই সময় খুল্লতাত মহাশয়ের অত্যন্ত বোলবোলা। যৎকালে তিনি বাটী থাকিতেন, তখন কয় দিবস ধরিয়া চ'ডীম'ডপে লোকে লোকারণ্য! ডাকমুন্সি, সরবরাহকার, পেয়াদা, হরকরা এবং অনুগত সমবয়স্ক প্রভৃতি বিস্তর ব্যক্তি যাতায়াত করিতেন। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ সজ্জন, অধ্যাপক প্রভৃতিও আসিতেন। সন্ধ্যার পর গান বাদ্যের ব্যাপারও হইত। ঐরূপ শত লোক আসিতেন, তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে (তাহাদের সংখ্যাও অল্প নয়) লেখা পড়ার পরীক্ষা দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম। কেহ পুথি বা পত্র পড়াইতেন; কেহ বা চাণক্য শ্লোক মুখস্থ বলাইতেন, কেহ বা ধারাপাতের ডাক জিজ্ঞাসা করিতেন, কেহ বা হস্তাক্ষর দেখিতেই মহা মহা আমোদী হইতেন। সকলেই বলিতেন, "এ ছেলে বাঁচিলে হয়।"

আমি বলিয়াছি, গুরুদক্ষিণাদির অপেক্ষা কোনো নূতন ও উচ্চ অঙ্গের পুস্তক পাঠে আমার বড় স্পৃহা জন্মিয়াছিল। ইহা শুনিতে পাইয়া আমার মাতামহ মহাশয় একখানি গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ও একখানি লঙ্কাকান্ড পাঠাইলেন। আমি নিমগ্ন চিত্তে তাহা পড়িতে লাগিলাম। কতক বা বুঝি, কতক বা বুঝি না। বারবার পড়িয়া এক প্রকার

মর্ম্মজ্ঞ হইলাম ; তথাপি কাহাকেও জিজ্ঞাসিয়া অর্থগ্রহ করিতে আমার প্রবৃত্তি হইত না। এই সময় আমার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত (পিতার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র) মহাশয়ের ঘরে দৈবাধীন কয়েকখানি হস্তাক্ষর পুথি দেখিতে পাইলাম। সে পুথি কাপড় জড়ানো কাষ্ঠের মলাট মধ্যে অতি যত্নে রক্ষিত ; তিনি কাহাকেও তাহা দিতেন না। তিনি পীড়িতাবস্থায় উপরের ঘরেই সর্ব্বদা থাকিতেন। কখনো কখনো বৈকালে ঐ পুথি খুলিয়া একাকী পড়িতেন। আমি সেই সময় তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার ত্যক্ত পাতাটী অবহিত চিত্তে দেখিতাম। তিনি কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কি দেখ্‌ছো জ্যেঠা মশাই ! তিনি আমাকে আদর করিয়া জ্যেঠা মহাশয় ভিন্ন অন্য নামে কদাচ ডাকিতেন না। পড়িতেন আর মধ্যে মধ্যে বলিতেন "তুমি কি প'ড়তে পার, যে খেলাধুলো ছেড়ে এক মনে পুথি দেখছো ?" আমি লজ্জায় মাথা হে'ট করিয়া থাকিতাম। কেননা, আমার যত দোষ থাকুক এবং এখন আমি আত্মকথা যতই কেন বলিনা, কিন্তু বাল্যাবধি কখনোই আমি অহংকার রিপুর প্রিয় শিষ্য নহি—কখনই ঔদ্ধত্যরূপ মত্ততার শাসন গ্রাহ্য করি নাই। তাহা বলিয়া আমি যে প্রশংসা ভালবাসিনা, কি তাহার অভিলাষে বেড়াই না, অথবা কেহ ভাল বলিলে মনে মনে আহ্লাদে ফাটি না, এমত নহে। তবে কিনা প্রশংসার লালসাকে চাপিয়া রাখিতে পারি এবং প্রশংসার আহ্লাদে একবারে ফাটিয়া চটিয়া আটখানা হইয়া পড়ি না !

সে যাহা হউক, মেজ জ্যেঠা মহাশয় একদিন আমাকে সেই পুথির একপাত পড়িতে দিলেন। আমি পড়িয়া ফেলিলাম। তিনি ক্ষণকাল অবাক হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, আমি অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়া পাতাখানি রাখিলাম। ভাবিলাম হয়তো পড়া ভাল হয় নাই, তাহাতেই অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি কথা কহিতেছেন না। কিন্তু তিনি তাকিয়াতে ঠেস দিয়া অর্দ্ধশয়নভাবে থাকিয়া বলিলেন "রাখিলে কেন ? পড় না ?" আমি জড়সড় হইয়া পুনর্ব্বার সাবধানে পড়িতে লাগিলাম। সেই দিন অবধি তিনি আর আপনি পড়িতেন না, আমাকে দিয়াই পড়াইতেন। এবং আমার পিতামহীকে বলিতেন 'খুড়ি !' আমার ভাল লাগে না, এ ছেলে বাঁচুলে হয় !'

ক্রমে আমার পুথি পড়ার খ্যাতি পাড়ায় বড় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে আমাদের দর দালানে বৈকাল বেলা পাড়ার যত প্রাচীনা, প্রৌঢ়া ও দুই একজন নব্যাও আমাকে মধ্যে রাখিয়া মণ্ডলাকারে বসিতে লাগিলেন। আমি স্বীয় প্রবৃত্তি, তাঁহাদের অনুরোধ ও মাতৃআজ্ঞাতে প্রত্যহ তাঁহাদিগকে পুথি পড়াইয়া শুনাইতাম। ক্রমে আমাদের দরদালান নৈমিষারণ্য, পাড়ার মেয়েরা ঋষি মণ্ডলী এবং আমি সাক্ষাৎ উগ্রশ্রবা হইলাম—ক্রমশঃই কাশীদাসের মহাভারত চলিতে লাগিল ! তাহাতে আমার পাঠশালায় যাওয়া একপ্রকার বন্ধ হইল—রীতিমত লেখা পড়া শেখা কিছুই হইল না—কেবল জ্যেঠামী ও কে'ড়েলিতে পরিপক্ক হইয়া উঠিলাম। মা আমাকে পাঠশালায় পাঠাইতে চাহিলে বাটীর ও পাড়ার সকলে বলিত "ও আবার পাঠশালে যাবে কিরা ? ওর কাছে

গুরুমশাই শিখে যেতে পারে!" গুরুমহাশয়ও আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং সকলের সাক্ষাতেই সর্ব্বদা বলিতেন "আমি ওরে শেখাব কি, ও আমাকে শেখাতে পারে। এ ছেলে বাঁচ্‌লে হয়!"

এই সকল ল্যাজ-ফুলানে কথাই আমার পাকামো অগ্নিতে ফুৎকার স্বরূপ হইয়া উঠিল—তাহাতেই আমার ভাবী জীবনের সর্ব্বনাশ ঘটাইল। ফলতঃ ক খ অবধি এই সব পুঁথি পড়া পর্য্যন্ত আমি কাহারো নিকট শিখিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার মনে হয় না এবং আমার আত্মীয় পক্ষের কেহই তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। অবশ্যই প্রথমে কেহ কেহ কিছু শিখাইয়া থাকিবেন, কিন্তু অধিকাংশ আমি শুনিয়া শুনিয়া একপ্রকার কুড়াইয়া আনিয়া সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার আপনার কথাই বলা হইল, ধৰ্ম্মমণি প্রভৃতি দুই একটী সঙ্গীদের বিষয়েও যাহা কিছু বলিবার প্রয়োজন আছে তাহা বিবৃত না করিলে পরের অনেক কথা বুঝাইতে কষ্ট হইবে, এজন্য তাহা বলা চাই। কিন্তু তদ্বর্ণনের পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের পটখানি আপনাদের দেখা আবশ্যক, অতএব পরপটে তাহাই চিত্রিত হউক।

তৃতীয় পট—গুরুমহাশয়

আমাদের নিজ বাটীতেই পাঠশালা ছিল, তাহাতেই লিখিতাম পড়িতাম। গুরু-মহাশয় বড় ভাল লোক ছিলেন, আমাকে এবং আমার মধ্যম দাদাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার নাম হরিশচন্দ্র বসু, নিবাস গজঘণ্টা। রাঢ় দেশ হইতেই প্রায় সকল গুরুর আমদানি। অতি অল্প সংখ্যক মহাশয় অন্যত্র হইতে আসিতেন ও আসিয়া থাকেন। হরিশ গুরুমহাশয় সেই অল্প সংখ্যার একজন। যে হেতু গজঘণ্টা গ্রাম রাঢ়ে নয়, ত্রিবেণীর নিকট। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশের উপর, পঞ্চাশের মধ্যে। অধিকাংশ গুরুমহাশয় বলিষ্ঠ হন, তিনি তাহা ছিলেন না। ইঁহার শরীর অতি কৃশ ও দুর্ব্বল ছিল। সাধারণতঃ গুরুমহাশয়দিগের যেরূপ মস্তকে স্ত্রীলোকের চুলের সম্পূর্ণ না হউক অর্দ্ধ পরিমাণে দীর্ঘ শিক্ষা বা শিখা দেখা যায়, ইঁহার তেমন ছিল না; ইঁহার বেড়ি কপালের উপরেই ছিল এবং শিক্ষা বা শিখাতে অত দীর্ঘ চুল ছিল না; অথচ নিতান্ত ক্ষুদ্রও নয়। বিশেষতঃ কেশজাল অত্যন্ত ঘন ও খাজা থাকাতে কিছু বুনো বুনো রকম দেখাইত। তিনি বেশী তৈল মাখিতেন, তথাপি অন্যান্য মহাশয়দিগের ন্যায় তাঁহার চৰ্ম্ম ও চুল তেল-চুকচুকে ছিল না। তাঁহার হস্তদ্বয়ের কোনোটী না কোনোটী সর্ব্বদা স্বীয় মস্তকে সংলগ্ন থাকিত—আপনা আপনি বিলি কাটিয়া উকুন ধরিতেন। কিন্তু যদি কোনো প্রিয়ছাত্র নিকটে থাকিত, তবে আর তাঁহার নিজ মস্তকে সেই কীটশীকারে প্রবৃত্ত হইতেন না—ঐ শিষ্যের মাথার উকুন তুলিয়াই সেই মৃগয়া-প্রবৃত্তির কৃতার্থতা সাধন করিতেন। ফলতঃ হয় আপনার, নয় অপরের মস্তকে বিলি না কাটিয়া তিনি

এককালে থাকিতেই পারিতেন না। অন্ততঃ উহাই তাঁহার প্রিয়তম অভ্যাস ছিল। বাল্যকালে আমার মাথায় অত্যন্ত উকুন জন্মিত; এজন্য গুরুমহাশয় সর্ব্বদাই কাছে ডাকিতেন; কি দিবা, কি রাত্রি, অবকাশ পাইলেই আমার মস্তকে বিলি কাটিতেন, শীকারের প্রাচুর্য্য থাকায় এবং যত্ন-সাফল্য ঘটিয়া মহা আহ্লাদিত হইতেন, হয় তো সে আহ্লাদ উকুনকে বা আমাকে অত ভাল বাসিতেন বলিয়া। আমিও তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতাম—অন্য গুরুমহাশয়ের হস্তে পড়ুয়ারা ইচ্ছাপূর্ব্বক দেহ সমর্পণ করিতে পারে না, হরিশ গুরুমহাশয়ের হস্তে অঙ্গ ঢালিয়া কি আরামই হইত।

বস্তুতঃ অন্য গুরুর ন্যায় ইনি কঠোরহস্ত ও কঠোরহৃদয় ছিলেন না; বিশেষ দোষ না পাইলে প্রায় কাহাকেও মারিতেন না। ইনি কথায় কথায় বলিতেন "প'ড়ো আর ছেলে তফাত কি? যদি ছুতায়-নাতায় তাদের মা'র্ব্বো তবে আর স্নেহ করা হলো কৈ?" তিনি আরো বলিতেন "মেরে মেরে কিলুদেগুড়ো ক'ল্লে সে ছেলে লেখাপড়া শিক্‌তে পারে না।" তাঁহার এই ব্যবহারে ছাত্রগণের পিতা ভ্রাতা রক্ষক প্রভৃতি বড় অসন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁহার বড় অনুরাগ করিতেন। আমি অনেক দিন স্বকর্ণে শুনিয়াছি, অনেক রক্ষক মহাশয় পাঠশালায় আসিয়া হরিশ গুরুমহাশয়কে এই বলিয়া তিরস্কার করিতেন, "সরকার! তোমার কেমন পড়ানো? বাড়ীতে আমার অমুক এত দৌরাত্ম্য করে, তুমি কিছুই বলো না? তুমি যদি ভাল ক'রে শাসন না ক'র্ত্তে পার, তবে তোমার কাছে ছেলে দেব না" ইত্যাদি। তিনি তদুত্তরে বলিতেন "আমি পারিনে মশাই, মা'র্ত্তে আমার প্রাণ কেমন করে" ইত্যাদি। তাঁহার এই দোষে কর্ত্তৃপক্ষ এত বিরক্ত ও ছেলের ভবিষ্যতের জন্য এত উদ্বিগ্ন হইলেন, যে, অনেকে তাঁহার পাঠশালা হইতে ছেলে ছাড়াইয়া রেঢ়ো গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যে আমাদের নিজ বাটীর ৬।৭-টী বালক ও অপরাপর ২।৩-টী ভিন্ন তাঁহার আর অধিক ছাত্র রহিল না।

তাঁহার আর এক দোষ ছিল, তিনি বড় খোসামোদ করিতে পারিতেন না। প্রতিবাসী কর্ত্তাদলের প্রত্যেকের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করা, গল্প করা, চালাকি দেখানো, ফরমাইশ খাটা, হাট বাজার করিয়া দেওয়া, স্থান বিশেষে তামাকু সাজিয়া দেওয়া এবং যখন যে দিগে জল পড়ে সেই দিগে ছাতি ধরা, ইত্যাদি কাজের অধিকাংশতেই তিনি অক্ষম ছিলেন। যদিও হাটগণ্ডি, তামাকচাঁদা; সিধা তোলা এবং মাহিয়ানা আদায় প্রভৃতি লভ্যাংশের কাজে তিনি (গুরু মহাশয়দিগের রীতির বিরুদ্ধে) নিতান্তই উদাসীন ছিলেন; যে যাহা অনুগ্রহ করিয়া দিত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, ইহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিকট প্রিয় হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু উপরোল্লিখিত দুইটী মহদ্দোষ, বেত্রাঘাত ও তোষামোদ বিদ্যায় অক্ষমতা প্রযুক্ত তাঁহার সকল গুণ ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইয়া গেল।

লেখাপড়ায় তিনি উচ্চ নন, মধ্যবিধ ছিলেন। সচরাচর প্রচলিত অঙ্ক ও অরিজা

ভিন্ন সপকালি, পুকুরে কালি, ইটকালি, দেওয়ালকালি, অস্থিত পঙ্ক, বড় বড় আরিজা, জমীদারী নথি ইত্যাদি তখনকার উচ্চ অঙ্কের অধ্যাপনায় তিনি বড় পটু ছিলেন না। কিন্তু চাণক্যশ্লোক, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্র এবং বাপ পিতোমোর নাম টাম বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইত। তাঁহার হস্তাক্ষর কোনো মতেই প্রসংশার যোগ্য বলা যায় না।

তিনি অমায়িক ছিলেন। বাবা, দাদা, মা, দিদি, বাক্য তাঁহার মুখে সর্ব্বদা শুনা যাইত। তিনি ক্ষীণবপু হইয়াও ভোজনে "ছিটে বেড়া" ছিলেন? অন্যান্য গুরুমহাশয়-দিগের ন্যায় কোপাগ্নিতে বঞ্চিত হইয়াও জঠরাগ্নিতে তাঁহাদের অপেক্ষা তিল মাত্র ন্যূনকল্প ছিলেন না, তাঁহার ন্যায় মাংসলোলুপ হিন্দু আর দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। তিনি বলিতেন "আধ পালি চা'লের ভাত রেঁধে ঢেলে দেও, তরকারি দিও না, কেবল একটা পাঁটা এনে সুমুকে বেঁধে রাখ, মাঝে মাঝে তারে মার সেটা ভ্যা ভ্যা করুক, দেখ আমি সব ভাত উঠাতে পারি কি না?"

এই হরিশ গুরুমহাশয়ের নিকট আমার প্রথম শিক্ষা। তখন আমার বয়স সাড়ে তিন কি চারি বৎসর হইবে। আমি তাঁহার "আদুরে প'ড়ো" ছিলাম, কোলে উঠিতাম, কাঁধে উঠিতাম, যখন যাহা বলিতাম তাহাই পাইতাম। তাঁহার কাছে যেমন সুখে এবং মনোযোগে পড়িয়াছি, এমন আর কোনো শিক্ষকের নিকট হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু পুথি পড়া তাঁহার নিকট নহে, তাহা যে কোথা হইতে কবে শিখিয়াছিলাম, কিছুই ঠিক করিতে পারি না। তিনি কেবল ঘোষাইতে ও লিখিতেই শিখাইয়াছিলেন। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়, আমার পরিধেয় ধুতি খুলিয়া তিনি আমার মস্তকে বাঁধিয়া দিতেন, শ্রেণীবদ্ধ সকল বালকের সম্মুখে আমাকে উলঙ্গ দাঁড় করাইয়া ঘোষাইতে কহিতেন, আমি তাহা করিতাম। কিন্তু সকল বিষয় পারিতাম না; সন্ধ্যার পর তাঁহার কোলে বসিয়া ধারাপাতের যত দূর শিখিয়াছিলাম, তাঁহাই পড়াইতাম। অনেক লোকে দাঁড়াইয়া দেখিত, তাহাতে তাঁহার স্পর্দ্ধা হইত, যে, দেখ এতটুকু ন্যাংটো ছেলেকেও কেমন শিখাইয়াছি?

যাহা হউক, পাঁচ বৎসর বয়স হইতে না হইতে আমি অমন স্নেহবান্ শিক্ষক হারাইলাম। পূর্ব্বে যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, অথবা অন্য কোনো হেতু, যাহা এখন মনে না হইতে পারে, যে কারণেই হউক আমাদের হরিশ গুরুমহাশয় ছাড়িয়া গেলেন। দক্ষিণ পাড়ায় আমাদিগের এক ঘর জ্ঞাতির বাটী অপর একটী পাঠশালা ছিল, আমরা তথায় যাইতে বাধিত হইলাম। সদরে সদরে যাইতে হইলে সে বাটী অনেক দূর; কিন্তু খিড়কির পথে অতি নিকট। সুতরাং দূরতার জন্য বিশেষ কষ্ট হইল না, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এখন বিস্তর অসুবিধা।

আমাদের বাটীর পাঠশালায় অল্প ছাত্র ছিল, গুরুমহাশয় আমাদিগকে শিখাইতে বিস্তর সময় পাইতেন; বিশেষ আমরা বাটীর পাঠশালায়; বাটীর সরকারের নিকট

পড়া; অবশ্যই সমধিক যত্নের পাত্র ছিলাম, এখন সে সমস্ততেই সম্পূর্ণ বিপরীত। গুরুদ্বয়ের আকৃতি, প্রকৃতি, রীতি, নীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, সকল বিষয়েও বিপরীত। তিনি ছিলেন ত্রিবেণী অঞ্চলের লোক—দিশি; ইনি আসল রাঢ়ের লোক—জাত্ গুরু। তিনি ছিলেন ঢেঙ্গা, কাহিল, হাস্যমুখ; ইনি বেঁটে, দোহারা (অল্পভুঁড়ে) ভয়ঙ্কর। তিনি 'বাবা, ভাই, বাপু, বাছা" বলিতেন; ইনি "ওরে, হ্যাঁরে, ড্যাক্‌রা, ছোঁড়া বেটা ফেটা" পর্য্যন্তও বলেন। তিনি প্রায় কাহাকেও মারিতেন না, ইনি সর্ব্বদাই বেত্র হস্তে বিভীষণ মূর্ত্তিতে প্রায় সকলকেই (অল্প দোষে কি বিনা দোষেও) ঠেঙ্গাইতেছেন। প্রথম দিন গিয়াই কয়েকটী বালকের নাড়ুগোপাল, ঘাড়ে ঝিঁক্‌রে, এক পায় খাড়া, জল বিছুটি, ঘোড়দৌড় (মরু ছাই সকল মনেও আসে না।) ইত্যাদি বহু প্রকার দেখিলাম। তদ্ভিন্ন চটাচট্ শব্দ তো হইতেছে।

গুরু মহাশয় তেলির হিসাব করিতেছেন, পাঠশালা সুদ্ধ মহা গণ্ডগোল বাঁধাইয়াছে; দুষ্ট বালকদিগের কিছুতেই লজ্জা নাই, যতবিধ দুষ্টামি, নষ্টামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি হইতে পারে সকলই চলিতেছে; কোনো ছোট বালক বা ঘুমে ঢলিয়া পড়িতেছে, দুই তিন জন তাঁহার মুখে, গোঁফে, গণ্ডে, কপালে কালী দিয়া সং সাজাইতেছে; তদ্দর্শনে খিল্ খিল্ করিয়া ভয়ংকর হাসি পড়িয়া গেল। গুরু মহাশয়ের চমক হইল, অমনি বেত্র হস্তে উঠিয়া "র'স্ বেটারা র'স্" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া নির্ব্বাচন ব্যতীত এলো মেলো গোবেড়েন! আমরা নূতন, আমাদের বড় হইল না, কিন্তু দেখিয়া আত্মাপুরুষ যে কোথায় উড়িয়া গেল তাহার ঠায় ঠিকানা পাইলাম না। মহাভারতে যমালয়ের বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, মনে হইল এই বুঝি সেই খানেই আসিয়াছি, ভয়ে আমি ভ্যাক করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। অনেক বালক কাঁদিতেছিল, সে সব ফোপাইয়া, আমার রোদনধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইল—সপ্তম বাজিল—"কেয়্যা" বলিয়া যেমন গুরু মহাশয় ফিরিয়া দেখিয়াছেন অমনি নেত্রজল শুকাইয়া মূত্রজলে পুঁথি ভাসিয়া গেল। নিকটের ছোঁড়ারা মহাশয়কে বলিয়া দিল। মহাশয় যাহা মুখে আইল তাহাই বলিয়া গালি দিয়া আমার মধ্যম দাদাকে দিয়া স্থানটা গোময় দিয়া সুদ্ধ করাইয়া তাঁহার সহিত আমাকে বাটী পাঠাইয়াদিলেন।

আমি বাটী আসিয়া মার কোলে উঠিয়া গলা ধরিয়া একবার তো মনের খেদ মিটাইয়া কাঁদিয়া লইলাম। বাটী সুদ্ধ স্ত্রীলোক জড় হইয়া "কেন, কেন? কি হয়েছে, কি হয়েছে?" বলিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে মধ্যম দাদা সমস্ত বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিলাম, "মা! আমি ঘরে ব'সে সব শিখবো, দেখো আমি পারি কিনা, আমায় আর সেই যমালয়ে পাঠিও না।" মা তখন "তাই হবে" বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা করিলেন। তাহার পর আমি কয়েক দিন ঘরেই লিখিতে লাগিলাম। কিন্তু কথা মাজার জন্য আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় চিন্তিত হইয়া ঐ গুরু মহাশয়কে (তাঁহার নাম মদন গুরু) ডাকাইয়া বলিলেন "দেখ মদন, আমার ভাইপোরা তেমন ছেলে নয়; তুমি

যদি এদের না মারার এমন কড়ার কণ্ঠে পার তবে তাদের পাঠাই।" মদন গুরু তাহাতেই সম্মত হইয়া দুই তিন দিন আসিয়া আমাকে বিস্তর আশ্বাস দিয়া ভুলাইয়া লইয়া গেলেন; আমিও প্রায় বৎসরাবধি তাঁহার নিকট শিখিয়াছিলাম।

তন্মধ্যে একটী দিন ব্যতীত দৈহিক দণ্ড পাইতে হয় নাই। তাহাও লেখা পড়ার ঔদাস্য বা অপরাগতা জন্য নহে। কুসঙ্গী সঙ্গে পরের বাগানে লিখিবার কলাপাত কাটিয়া আনিয়াছিলাম, বাগানের কর্ত্তা আসিয়া বলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মা'র খাওয়াইয়া গেলেন।

মদনগুরুর পাঠশালার কতক বলা হইয়াছে, আরো কিছু বলিব। শুদ্ধ মদন গুরু বলিয়া নহে, যাহা বলিতেছি তাহা প্রায় গুরু পাঠশালা মাত্রেরই প্রকৃতি ছিল এবং অদ্যাপিও কোনো কোনো পল্লীগ্রামে এবং এই রাজধানীতেও আছে। কিন্তু এক্ষণে তত্তাবৎ সমুদায়ই প্রবল আছে কি না ঠিক বলিতে পারিনা, তখন যে সর্ব্বত্র অটুট ছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

শীতকালে পাঠশালা বসিবার যে রীতি ছিল, তাহা প্রাতরুত্থানের পক্ষে অত্যাশ্চর্য্য অদ্বিতীয় সদুপায়। সেই উপায়ের নাম "হাতছড়ি।" অতি প্রত্যুষে সকল ছাত্রকে আসিতে হইবে, ইহাই নিময়। সেই নিয়ম সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইবে বলিয়াই হাতছড়ি রূপ প্রতিযোগিতা, উৎসাহ ও দণ্ড ব্যবস্থাপিত ছিল। ছাত্রেরা পর পর যেমন আসিবে, সেই পর্য্যায়ে প্রত্যেকের নাম একখণ্ড বড় কদলীপত্রে লিখিত হইত। যে বালক সর্ব্বাগ্রে আইসে তাহার নামের দক্ষিণে ১ এক, পরবর্ত্তী বালকের নামে ২ দুই, পরে ৩ তিন, ইত্যাকারে লিখিয়া রাখা হইত। হয় তো গুরুমহাশয় তখন উঠেন নাই, কি উঠিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন কি উপস্থিতই বা আছেন। তাঁহার অভাবে যে কোনো ছাত্র হউক ঐ হাতছড়ি লিখিয়া রাখিত। প্রথমে যদি অতি শিশু ছাত্রেরা আইসে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনো বড় বালক না আসিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ শিশু ছাত্রেরা কে শূন্য, কে এক, কে দুই, কে তিন, তাহা মনে করিয়া রাখিবে। যখন সকল পড়ুয়া উপস্থিত, যখন প্রাতঃকালের লেখা পড়া কতক কতক হইয়া গিয়াছে, যখন বেলা হইয়া পড়িয়াছে, তখন সেই হাতছড়ির কাগজ বা পাতা লইয়া গুরুমহাশয় একে একে নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যে শূন্য, তাহার হস্ত-তালুতে বেতের একটী সামান্য গোঁজা দেওয়া হইল ; যে এক, তাহার পাতিত হস্তে সামান্য এক ঘা মারা হইল ; দুয়ের অর্থাৎ তৃতীয় উপস্থিত ছাত্রের হস্তে দুই ঘা, তিনের হস্তে তিন ঘা, চারের হস্তে চারি ঘা, এইরূপে যাহার নামে যত সংখ্যাপাত আছে, তাহার হস্তে তালুতে তত ঘা বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। যে যত বিলম্বে আসিয়াছে, তাহাকে তদনুরূপ জোরে মারা হইল। অধিক সংখ্যক বেত্রাঘাত এক হস্তে অসহ্য হইতে পারে এজন্য দুই হস্তে এবং কখনো কখনো হস্ততালু ব্যতীত অন্য অঙ্গেও সেই আঘাত ধারণ করিতে হয়। যাহারা সংখ্যায় অধিক, কিন্তু সকাল সকাল আইসে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ জোর প্রকাশ হয়

না ; যাহারা অধিক বেলায় আইসে অথচ বয়োধিক, তাহাদিগকে অধিক যন্ত্রনা সহ্য করিতে হয়। ফলতঃ যদি এই নিদারুণ প্রহার না থাকিত, তবে এই প্রথাকে আমরা সৎ প্রথা বলিয়া স্বীকার করিতাম। কিন্তু গুরু পাঠশালার প্রাণই প্রহার; সুতরাং তদভাব প্রত্যাশা করা এক প্রকার অগ্নির শৈত্যগুণ আশা করার সমান। যদ্যপি ভৎসনা ও লজ্জা প্রদানরূপ দণ্ডের সহিত হাতছড়ির প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে বিবিধ বিবেচনায় ইহাকে সদুত্তেজক প্রথারূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মদন গুরুমহাশয় আমার জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিশেষ কড়ারে বন্ধ থাকাতে আমি সম্পূর্ণরূপে হাতছড়ি হইতে মুক্ত ছিলাম। আমার মধ্যম দাদা প্রায় প্রত্যহ হয় শূন্য, নয় এক, কি দুই হইতেন।

গুরু পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী এইরূপ ; প্রাতঃকালে ছাত্রেরা পাঠশালায় যাইয়া প্রত্যেকে আপন আপন কক্ষস্থ পুঁথি মাদুর বিছাইয়া বসিবে ; তালপাতা, কলাপাতা ও কাগজ, এই তিনরূপ আলেখ্যোপরি যাহার যাহা লিখিবার সে তাহা লিখিবে ; তালপাতায় ক, খ, সিদ্ধি রস্তু, অ, আ, কড়ানিয়া শতকিয়া ইত্যাদি ধারাপাত, নামতা ও নাম, কলাপাতা ওয়ালারা ক, খ, অ, আ, ব্যতীত ঐসব এবং পূর্বাভ্যস্ত অঙ্ক সমুদয় ; কাগজ ওয়ালারা "সেবক শ্রী" আজ্ঞাকারী "ত্বদীয়" ইত্যাদি পাঠের পুরুষানুক্রমিক এক বয়ানের পত্র কয়েক খানি বিশেষ যত্নপূর্বক সম্মুখস্থ আদর্শ পাঠানুসারে লিখিবে। ছয় দণ্ড বেলা হইলে প্রত্যেকে আপন আপন লেখা লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে মশা'র কা'ছে যাইবে ; মশা'ই দেখিয়া সংশোধন করিবেন—সে সংশোধন মুখে কলমে ও বেতে, তিনরকমে। তাহার পর এড়াভাতের ছুটী। এই কারণে অথবা মল মুত্রাদি পরিত্যাগ জন্য যিনি যখন পাঠশালার বাহিরে যাইবেন, তাঁহাকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া যাইতে এবং তাহা শুষ্ক না হইতে হইতে ফিরিয়া আসিবে হইবে—বিলম্বে পীঠের চামড়া থাকিবে না।

এড়াভাত খাইয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলে অঙ্ক কষিবার ধুম পড়িয়া যায়। এখন নূতন অঙ্কের সংকেত শিখাইবার সময়। মশা'ই এক এক জনকে এক এক অংক দিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন, সে আপন আসনে বা অন্য নির্জনে গিয়া করাঙ্গুলির পর্বে পর্বে গণিতেছে, লিখিতেছে, মুছিতেছে; (যত কালী আপন মাথায় বস্ত্র ও বদনে মুছিতেছে) যে পারিতেছে আহ্লাদে ফুটি ফাটা হইয়া মশা'র কাছে দৌড়িতেছে, যে না পারিতেছে ভয়ে হৃৎকম্পের কঠোর তাড়না ভোগ করিতেছে। এই সময় পাঠশালার ব্যাপার দেখিতে অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। অধিকাংশ বালকের মুখ আরক্ত ; বিড়্ বিড়্ শব্দে এক প্রকার গুঞ্জরব উত্থিত ; কেহ ভয়ে অভিভূত; কেহ আপনা আপনি বিরক্ত; কেহ বেত্র খাইয়া "বাপুরে মারে" ধ্বনিতে গগন নিনাদিত করিতেছে ; অন্যান্য বালক ক্ষণমাত্র নিস্তব্ধ হইয়া তাহার দিগে আড়ে আড়ে চাহিতেছে ; তাহাতে "বটের‍্যা বেটার‍্যা" বলিয়া গুরু যত হাঁকিতেছেন, ততই আবার বিড় বিড়ানি বাড়িতেছে ; ইরির মধ্যে প্রিয় ছাত্র সর্দার

পড়ুয়া সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে গিয়া লিখাইতেছে, পড়াইতেছে, চড় চাপড়টাও মারিতেছে, মদগর্ব্বে মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছে। গুরু মহাশয় তাহাকে বড় কিছু বলিতে পারেন না, কি বলিতে চাহেন না, কেননা তাঁহার অর্দ্ধেক কাজ সে নির্ব্বাহ করে।

এই কালে অথবা ইহার কিছু পরে প্রধান প্রধান পড়ুয়া, যাহাদের কষামাজা একরূপ হইয়া বহিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গুরুর যত বিদ্যা তাহা প্রায় সমস্তই আদায় করিয়া লইয়াছে, তাহারা কেহ কেহ জমিদারী শেহা লিখিতেছে; কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত পুথি সকল পড়িতেছে, কেহ কেহ গুরু আজ্ঞায় অন্যকে অঙ্কাদি শিখাইতেছে; কেহ কেহ ডাক জিজ্ঞাসা করিতেছে।

গুরুসেবা ভিন্ন বিদ্যা হয় না; এ কথা তপোবন হইতে আরম্ভ হইয়া বঙ্গীয় টোল ও পাঠশালা পর্য্যন্ত অনাদিকাল ভাষিত ও পালিত হইয়া আসিতেছে। যাঁহারা মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ব্যবস্থা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, স্নাতক দ্বিজ-ছাত্রের গুরুসেবার আশ্চর্য্য ব্যাপার তাঁহাদের অগোচর নাই। গুরু পাঠশালার গুরু শিষ্য কেহই সে সব পড়েন নাই, তথাপি গুরু মহাশয়ের তামাকু সাজা, জল আনা, গৃহাদি মার্জ্জন করা বা ঘরে খেগো গুরু না হইলে রন্ধনাদির আয়োজন করা সকলই ছাত্র-হস্ত দ্বারা সাধিত হইতেছে। কিন্তু সকল ছাত্রের প্রতি গুরুর সে কৃপা হয় না; বড় মানুষের ছেলে, আদুরে ছেলে, পাড়া কুঁদুলীর ছেলে, খুব সাতান বাপ মার ছেলে, এ সব ছেলের প্রতি তত দূর কৃপাবলোকন হইতে পারে না, তদ্ভিন্ন আর সকলের উপরেই ন্যনাতিরেকে গুরু ঐ ঐ গুরু ভার অর্পণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃতার্থ করেন। আমার কি আমার মধ্যম দাদার ভাগ্যে সেরূপ কখনো ঘটে নাই।

গুরু মহাশয়ের উপার্জ্জনের কথা শুনিলে এখনকার পণ্ডিত মাষ্টার মহাশয়েরা আপনাদিগকে কোটীপতি জ্ঞানে ফুলিয়া উঠিবেন। তালপাতায় অর্দ্ধ, কি বড় জোর এক আনা, কলারপাতায় তাহার দেড়া কি বড় জোর দ্বিগুণ এবং কাগজে তাহার কিছু বেশী। সেকালে চারি আনা মাসিক বেতন এত অল্প শ্রুত হইত, যে, যদি কখনো কোনো ছাত্রের মা বাপ তত দিতেন তবে তাঁহাদের কাছে গুরুর মাথা কেনা থাকিত! কত গ্রামে ছাত্রকে বিদ্যা দান করিয়া গুরু নগদ কিছুই পাইতেন না! ব্রাহ্মণ হয় তো সুধু আশীর্ব্বাদ ও মাঝে মাঝে প্রসাদ; চাষা হয় তো ধানটা চা'লটা তরিটে তরকারিটে মানকচুটা; কলুর তেলির ছেলে হয় তো তেল; ময়রা হয় তো পাটালি, ফেণি, বাতাসা। কিন্তু সচরাচর এক ছিলিম কারয়া তামাক হাট বেলায় হাট গণ্ডি কড়ি, পা'ল পার্ব্বণে সিধা; পৌষড়ায় ঝুনা নারিকেল একটা, গুড় এক বাটী ইত্যাদি উপার্জ্জন সাধারণ! যে সব ছাত্র এ সকল দিতে অশক্ত হইত, তাহারা কৃপাভাজন হইতে পারিত না এবং পৃষ্ঠ-চর্ম্মের ত্বগিন্দ্রিয় যাহাতে স্পর্শানু ভাবকতায় কোমল না থাকে; এমন অভ্যাস করিতে বাধিত হইত।

যাহা হউক; এক কি দেড় বৎসর পর্য্যন্ত মদন গুরুর পাঠশালায় ছিলাম বলিয়াই এত সব মর্ম্ম কথা লিখিতে পারিয়াছিলাম। আমি মদন গুরুর প্রিয় কি অপ্রিয় ছিলাম বুঝিতে পারি নাই। কেননা বিশেষ নিয়মাধীন থাকাতে গুরু স্বাধীনভাবে আমার শাসন করিতে পারেন নাই, বোধ হয় তজ্জন্য বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমিও আমার মাতৃ-উত্তেজনায় এবং অন্যের দণ্ড দৃষ্টান্তের ভয়ে প্রতিনিয়ত অত্যন্ত সতর্ক থাকিতাম। এক বার ব্যতীত কোনো সময়ে কোনো কদর্য্য ব্যবহারে তাঁহাকে যে কুপিত করিয়াছি, তাহা মনে হয় না। আমি তাঁহার নিকট অনেক কষামাজা শিখিয়াছিলাম। আমার জমীদারী কাগজ লেখা হয় নাই। পুঁথি পড়া হইত, কিন্তু তাহা তাঁহার শিক্ষিত বিদ্যা নহে। ঘোষাইবার কালে আমি সকল ছাত্রের সহিত দাঁড়াইয়া পড়িতাম, তিনি আমাকে হরিশ গুরু মহাশয়ের ন্যায় আদর করিয়া কখনই ঘোষাইতে দেন নাই, এজন্য তাঁহার প্রতি মনে মনে আমার বিরাগ ছিল, ফুটিতাম না। আমার গুরু পাঠশালায় পড়া এই পর্য্যন্ত। ছয় বৎসর বয়সের সময় আমি এবং আমার মধ্যমাগ্রজ; জননীর সহিত নিশ্চিন্তপুরে গেলাম; সেখানে যে পাঠশালা ছিল; তাহা অতি সামান্য, তাহাও অল্প দিনে ভাঙ্গিয়া গেল। নিশ্চিন্তপুরের লীলা পরে বক্তব্য।

চতুর্থ পট—ধন্দমণি বা নাগরভাঁটা এবং নলছেঁচা বা বেড়িকাটা

আমি মাতুলালয়ে যাইবার পূর্ব্বে যে সব সঙ্গীগণের সহিত সর্ব্বদা খেলা করিতাম, খাইতাম, দাইতাম, লিখিতাম, পড়িতাম, তাঁহাদের কথা কিছু না বলিলে ভাল হয় না। আমার যে কয়জন সঙ্গী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সাদাসিদে বালক, তাহাদের কথা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? সচরাচর বঙ্গীয় ভদ্রবালক যেরূপ হইয়া থাকে, তাহারাও সেইরূপ-সচরাচর গুরুপাঠশালায় শিশু পড়ুয়ারা যেরূপ হইত এবং অনেক স্থলে অদ্যাপিও হইয়া আসিতেছে, তাহারা তাহাদের হইতে বড় ভিন্ন ছিল না। তাহারা প্রতিদিন প্রাতে উঠিত, কেউ বা মুখে জল দিত, কেউ বা দিত না, সকলেই কোঁচড়ে পুরিয়া মুড়ি মুড়কী বা চাউলভাজাদি জল পান ও হাতে করিয়া মোয়া সিন্নি পাটালি ফেনিবাতাসা প্রভৃতি কোনোরূপ মিষ্ট লইয়া খাইতে খাইতে এবং বগলে পুঁথিমাদুরের পাততাড়ি লইয়া নাচিতে নাচিতে কি দৌড়িতে দৌড়িতে পাঠশালায় যাইত। তখন পাড়াগায় মিঠাই মণ্ডার চলন বড় ছিল না; তখন "ভাজা খাইলে ছেলের পেট কামড়াইবে" এ ভয়ও কেউ করিত না—তখন লোকে "স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য" শব্দে এখনকার মত গগন দেশ ফাটাইয়া দিত না, কিন্তু এখনকার চেয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শতগুণে বেশী সুস্থ—প্রকৃত সুস্থ ছিল। তাহারা (মুখে নয়) যথার্থ সুস্থতার

সুখভোগ করিত, তাই ছেলেদের মা, মাসী, ভগ্নী, পিসীরা অনায়াসে ছেলের কোঁচড় পুরিয়া মোটা মোটা বোক্‌ড়া চাউলের, কাট-ভাজা ঢালিয়া দিত ; ছেলেরা পরমানন্দে ভাজা গালে দিতে দিতে অপর ছেলেদের ডাকিতে ডাকিতে পাঠশালায় যাইত। ছোট ছেলেদের মা মাসীরা অনেক দূর কোলে করিয়া পথ আগাইয়া রাখিয়া আসিতেন। রাস্তা তখন জনপূর্ণ নয়, কেননা অত ভোরে গ্রামের যুবা পুরুষেরা প্রায় উঠিতেন না এবং "সোমত্ত" বউ মানুষেরাও প্রায় ছেলে লইয়া যাইতেন না—সে কাজের ভার প্রায় পুকী পিসীদের উপরেই অর্পিত হইত। তবে যাঁহার ঘরে আজন্ম-বিধবা বহুপ্রৌঢ়া যুবতী ঠাকুরঝির অভাব, কাজেই তাঁহাকে খিড়কির পথে যতদূর সম্ভব, তত দূর গিয়া ছেলে রাখিয়া না আসিলে চলিত না। এইরূপে ছেলেরা পাঠশালায় গিয়া যাহার যাহা লিখিবার, পড়িবার, সে তাহা করিত। এড়াভাতের ছুটী হইলে এড়াভাত খাইয়া (হয় তো পথে ক্ষণেক খেলিয়া) আবার মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পাঠশালে গিয়া রুদ্ধ থাকিত। মাধ্যাহ্নিক ছুটীর অবসরে কয়েক ঘণ্টা খুব হুড়োমুড়ি দৌড়াদৌড়ি চলিত। বিকালে আবার পড়া, সন্ধ্যায় আবার ছুটী। সেই সময় তাহাদের দৌরাত্ম্য ও দাবাদাবী কিছু বেশী বাড়িত। বাড়ী একবারে তোলপাড় হইত। যাহাদের বাড়ী ছেলে নাই, পাড়াগাঁয় সন্ধ্যাকালে তাহাদের বাড়ী যেন দ-পড়া বাড়ীর মতন দেখাইত—আজো দেখায়। সে যাহা হউক, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপনান্তে ঠাকুরদাদা মহাশয় নাতিপুতিদের ডাকিয়া লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ, দাঁড়ঘরা বা চোচালায় সপ পাতিয়া বসিয়া ডাক জিজ্ঞাসা করিতেন ; পিতা, পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতি পিতৃমাতৃকুলের সপ্তম-পুরুষ পর্য্যন্তের নাম বলিয়া দিতেন ; "কত কাল কায়স্থ ? যত কাল চন্দ্র সূর্য্য—চন্দ্র সূর্য্য গগনে, আমি জানবো কেমনে ? যাবৎ মেরৌ স্থিতে দেবাঃ, যাবৎ গঙ্গা মহীতলে, চন্দ্রার্কঃ গগনে যাবৎ, তাবৎ কায়স্থকুলে বয়ং। তার সাক্ষী কে ? আদিত্যঃ চন্দ্রঃ বলিনঃ নভশ্চ" ইত্যাদি এবং কুলীনের ছেলে হয় তো, কুলীনের নব লক্ষণাদি চিরপ্রণালী বদ্ধ বহু বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। বয়সের তারতম্যানুসারে কাহাকে সমুদয়, কাহাকে আংশিক পাঠ দেওয়া ও ডাক জিজ্ঞাসা করা হইত। ছেলেরা সারাদিন লিখিয়া পড়িয়া, খেলিয়া, মাতামাতি করিয়া, গুরুমহাশয়ের ধমক ও প্রহার খাইয়া, বাটীতেও জননী প্রভৃতি গুর্ব্বিণীগণের নিকট বেশী খাইতে পারে না বলিয়া ঠোনাদা ঠানদা, চড়ুটা চাপড়ুটা জলযোগ পাইয়া এবং আপনারাও পরস্পরে দিনের মধ্যে প্রায় বিশ ত্রিশ বার গুরুতর মারামারি করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রার আবল্লীতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ; বাপের নাম বলিতে গিয়া হয়তো পিতামহের নাম বলিতেছি ; তথায় বাটীর কর্ত্তা ব্যতীত অন্যান্য কয়েক মহাশয় বসিয়া খোস গল্প, দলাদলির ঘোট বা মালি মোকদ্দমার আলোচনা করিতেছেন ; ঘুমন্ত বালকের ঐরূপ ভ্রান্তকথা শ্রবণে কোনো কর্ত্তা বা কোপন-ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন "হুঁ" এখন যে মুখে কথা ফোটে না, দো রাত্রির সময় তো আকাশ পাতাল ফেটে যায় ?" কেউ বা বলিলেন "ওর সব নষ্টামি,

দেও একটা থাপ্‌পড় বসিয়ে দেও না, ঘুম টুম কোথায় উড়ে যাবে এখন?" কেউ বা বলিলেন "আঃ? আর কেন? ঢের রা'ত হয়েছে, ছেড়ে দেও না?" এই শেষ উপরোধই সংরক্ষিত হইল, ছেলেরাও বাঁচিয়া গেল!

আমার যে সব সঙ্গীগণ ছিল, তাহাদের অধিকাংশ ন্যূনাতিরেকে প্রায় এইভাবেই কাল কাটাইত, তাহাদের কথা বিশেষ করিয়া আর কি বলিব? কেবল দুইটী খেলাড়িয়া সঙ্গী ঐরূপ সাদাসিদে প্রকারে লালিত, পালিত; শিক্ষিত ও রক্ষিত হইত না। তজ্জন্য সেই দুইটীর কথাই বিশেষরূপে বলা উচিত। তাহাদের বাল্যকাণ্ড আমার অন্যান্য সঙ্গীগণের বাল্য-জীবন হইতে যেমন বিভিন্ন ছিল, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনও সচরাচর ভদ্রলোকের জীবন-ব্যাপার হইতে তেমনি পৃথকরূপ লক্ষিত হইতেছে। অতএব তাহাদের (ঐ দুই জনের) তাৎকালিক বিবরণ কিঞ্চিৎ বিবৃত করি, যে, তৎপাঠে অনেক বালকের পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি রক্ষয়িতাবর্গের জ্ঞানলাভ ও চৈতন্যোদয় হইতে পারিবে!

সেই দুইটীর মধ্যে যেটী বয়সে বেশী, তাহার কথাই প্রথমে কথ্য। তাহার প্রকৃত নাম যাহাই হউক, সমবয়সী সঙ্গীগণ তাহাকে দুই তিনটী অদ্ভুত নামে ডাকিত। কেহ বলিত "ধন্দমণি", কেহ বলিত "নাগরভাটা" এবং কখনো কখনো বা কেহ কেহ "আহ্লাদে" ও "গড়গড়ে" বলিয়াও সম্বোধন করিত।

এবম্ভূত অদ্ভুত নামাবলীর কারণ এখনি প্রকাশ পাইবে। ঐ বালক আমা অপেক্ষা দুই তিন বৎসর বয়সে বড় ছিল। ফলতঃ আমার সমুদয় সঙ্গীই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি অত্যল্প বয়সেই কেঁড়েলি ও জ্যেঠামিতে সুপরিপক্ক হইয়াছিলাম; সুতরাং বয়োকনিষ্ঠ বা ঠিক্ সমান বয়স্কদিগকে গ্রাহ্য করিতাম না। তাহাদিগের সহিত আমার মিল হইত না, কারণ তাহারা আমার পাকামি কথার মত কথাবার্তা কহিতে তখনও প্রস্তুত হয় নাই, তাহারা তখন পঞ্চম কি ষষ্ঠ বর্ষীয় চপল শিশু, আমি যেন অষ্টম বর্ষীয় বিজ্ঞ বালক! কাজেই উভয় পক্ষে সহৃদয়তা ও সদ্ভাবের অভাব হইত—কাজেই তাহারা আমার নিকট আসিত না। কাজেই আমি তাহাদিগের পরিবর্তে আমা অপেক্ষা বড় বড় বালকের সঙ্গলাভে সুখী হইতাম। সেই অবধি চিরকালই বড়র দলে মিশিতে আমার আন্তরিক প্রয়াস! এ অবস্থায় ল্যাজ ধরা হওয়াই সম্ভব; কিন্তু বড় গলা করিয়া বলিতে পারি, অদৃষ্ট আমাকে (অন্যান্য শত তাপ দিয়াও) সে দুঃখে কখনো পাতিত করে নাই—কখনোই সে আমাকে অন্যের পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া আমার গালাগালি খায় নাই।

সে যাহা হউক, যে বালকের কথা বলিতেছিলাম, তিনি অর্থাৎ ধন্দমণি আমার দূরতর সম্পর্কীয় নন; তিনি আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা—অতি নিকট জ্ঞাতি-ভ্রাতা। পূর্ব্বে আমার যে জ্যেষ্ঠতাত (পিতার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র) মহাশয়ের কথা কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি, ধন্দমণি তাঁহারই পুত্র! ঐ জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় পরগণার মধ্যে একজন

সুপ্রসিদ্ধ তেজীয়ান, বুদ্ধিমান, ক্রিয়াবান; এবং মালি-মোকদ্দমায় দোর্দণ্ড প্রতাপবান্ পুরুষ ছিলেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, যদিও তৎকালে পূর্ব্বকার ন্যায় তাঁহার যানবাহন, দ্বারবানাদি জাঁকজমক এবং দান ধ্যান, ক্রিয়াকাণ্ডের কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু পূর্ব্ব ঝাঁজ কোথায় যায়? তাঁহার নামডাক, চালচলন, খ্যাতি প্রতিপত্তি, বাহ্যভড়ং ও পারিবারিক রীতিনীতি বহুলাংশে অটুটই ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পীড়িতাবস্থায় বাটীতেই থাকিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্য কোনো বিষয়ে তিনি লিপ্ত না থাকিয়াও ভ্রাতৃপুত্রের লালনপালন কার্য্যে কিয়দংশে নিযুক্ত ছিলেন। "কিয়দংশ" বলিবার তাৎপর্য্য এই, যে, লালনপালন জন্য যত কিছুর প্রয়োজন, তন্মধ্যে আদর করা ও প্রশ্রয় দেওয়া এই দুইটী গুরুতর বিষয়ের ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন—অন্যান্য লঘু অংশ ভ্রাতার শিরে সমর্পিত ছিল! কেবল ঐ দুইটীর সহায়তা বলেই যতদূর সম্ভব, ততদূর পরিমাণে তিনি প্রাণাধিক ভ্রাতৃপুত্রবরকে পরম স্নেহে লালনপালন করিতেন। সেই প্রণালীর লালনপালন নিবন্ধন ভ্রাতৃপুত্রের সৎশিক্ষারূপ উপকার কি কুশিক্ষারূপে অপকার ঘটিয়াছিল, তাহা পশ্চাল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠেই পাঠক মহাশয় বিনা সাহায্যে, বিনা আয়াসে, অতি সহজে স্বয়ং বিচার করিতে পারিবেন। তাহার মহদুদার স্নেহ-সিংহাসনে বসিয়া সমুজ্জ্বল প্রশ্রয়-মুকুটে ভূষিত হইয়া তাঁহার প্রাণতুল্য ভ্রাতৃপুত্র ভবিষ্যৎকালে যে মহাগুণরাজ্যের একাধিপতি রাজা হইবেন, তাহা সেই বালককালেই আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহার দুই একটী দৃষ্টান্ত বলিতে হইল।

মনে করুন, পাঠশালার ছুটী হইল; সায়ংকাল; আমরা কয় ভাই পাতৃতাড়িবগলে, হাতে কালি মুখে কালি বাটী আসিতেছি—খিড়্‌কির পথ সোজা, দত্তদের বাড়ীর মধ্য দিয়া সেই পথেই আসিতেছি—আমাদের সঙ্গে ধন্দমণিও আসিতেছেন—আমাদের নিজ খিড়্‌কির ঘাটের কাছাকাছি আসিতেছি—আর এক রসী গেলেই খিড়্‌কির দ্বার পাই; এমন সময় ধন্দমণিদের দোতলা কোঠার ছাতের উপর হইতে শব্দ আইল "কাঁহা রে রাঙা বাবু কাঁহা? কাঁহারে ধন্দমণি চন্দমণি আহ্লাদে গড়্‌গ'ড়ে নাগরভাটা লটপ'টে ফুটিফাটা রাঙাবাবু কাঁহা? কাঁহারে নাথবাবু কাঁহা?"

তিন চারিবার এই শব্দ—এই আদরের ডাকের শব্দ হইল। কিন্তু প্রথম বারের প্রথম পদটী পূর্ণ হইতে না হইতে অর্থাৎ যেই মাত্র "কাঁহারে রাঙাবাবু"—ধ্বনি নিনাদিত হইয়াছে, অমনি আমাদের ধন্দমণি ঘাটের একদিগে দোয়াত; একদিগে পাত্‌তাড়ি ফেলিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া গিয়া একেবারে সেই দোতলার ছাতের উপর—জ্যেঠা মহাশয়ের স্কন্ধের উপর চড়িয়া বসিলেন! আমরা একবারে অবাক্! কারণ যে স্থলে পাত্‌তাড়ি পড়িয়াছে; সে স্থানটী আসল আস্তাকুঁড়—বাড়ীর যত আবর্জ্জনা, যত হাঁড়িকুঁড়ি, যত এঁটো কাঁটা; যত নোঙ্‌রা নুড়ো ইত্যাদি সেই পবিত্র স্থলেই ন্যস্ত হইয়া

থাকে! ঘাটে মেয়েরা ছিলেন, তাঁহারাও অবাক্! তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "পোড়া ছেলের একি কারখানা? ভাল, গেলি গেলি, দ'ত পাত্‌তাড়ি সুদ্ধ গেলিনে কেন? আর যদি ফেলেই যাবি তো ভাল যায়গায় ফেলে গেলিনে কেন?"

ধন্দমণির মা—আমাদের জ্যেঠাই মা—শুনিতে পাইয়া ঘাটে আসিয়া আমাদিগকে সাদর বচনে বলিলেন "কি কর্ব্বে বাবা, ন্যাংটো হয়ে পাত্‌তাড়িটে তুলে আন।" ধন্দমণি কাঁধের উপর, কি কোলের ভিতর বনাতের মধ্যে গরম হইতে লাগিলেন, আমরা সেই পৌষ মাষের শীতে বস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক ঠকাঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আস্তাকুঁড়ে নামিয়া শম্বুক কণ্টকাদিতে বিদ্ধপদ হইয়া সেই পাত্‌তাড়ি দোয়াত কুড়াইয়া আনি! সুদ্ধ তাহাই নহে, সেই শীতে তখনি আবার ঘাটে উলিয়া সেই পুঁথি মাদুর কাচি; তাল পাতাগুলি একে একে ধুই এবং দোয়াতের কালি ও কানি ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া জ্যেঠাইমার ঠাঁই দিই!

আমাদের মা শুনিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলিতান্তঃকরণে বকিতে বকিতে ঘাটে আইলেন। স্বীয় পুত্রের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার মনে যে কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা তিনিই জানেন! অন্যান্যের ন্যায় তিনি দর্শক শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—জলে নামিয়া আমাদের হাত হইতে পাতাগুলি লইয়া আপনি ধৌত করিয়া দিলেন—আমাদিগকে ধোয়াইয়া মুছাইয়া উপরে তুলিলেন—আপনি সেই সন্ধ্যাকালে অবগাহন পূর্ব্বক ডুব দিয়া আমাদিগকে লইয়া ঘরে গেলেন—পিসীমা বকিতে বকিতে এক কোষ গঙ্গাজল আনিয়া আমাদের মস্তকে দিয়া বস্ত্র পরাইয়া দিলেন! সকলেই বলিতে লাগিলেন, এ কাজ ধন্দের মার ভাল হয় নাই, কচি ছেলেদের এত দুঃখ না দিয়া আপনি গিয়া পাত্‌তাড়ি তুলিয়া কেন স্নান করিয়া ঘরে আইলেন না? জ্যেঠাইমা সে সব কথা শুনিয়াও শুনিতেন না—হাঁ না কিছুই বলিতেন না—কেননা একদিন নয়, তাঁহার ভাশুরের ঐরূপ আদর, ছেলের ঐরূপ পাত্‌তাড়ি ফেলা, পরের ছেলেকে দিয়া ঐরূপে তাহা উঠানো, বহুদিন এমন কাজ হইতেছিল। সুতরাং কাহারো কথায় তিনি আস্তাকুঁড়ে নামিয়া স্বয়ং অপবিত্রা হইতেন না এবং আমাদিগকে দিয়া পাত্‌তাড়ি উঠাইতেও ছাড়িতেন না—আমরা জ্যেঠাইমার কথা, কি বলিয়া না শুনি—বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে বাটীর সকলকেই ভয় করিয়া চলিতে হইত! পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন, ছাতের উপর হইতে কাহার দ্বারা ঐ আদরের ডাক নিনাদিত হইত? এবং ধন্দমণির নাম ধন্দমণি, নাগরভাঁটা, আহ্লাদে বা গড়গ'ড়ে কেন হইয়াছিল?

ধন্দমণি যাঁহার পুত্র, তিনি আমাদের 'সেজজ্যেঠা' মহাশয়। আর যিনি ঐরূপে ডাকিতেন, তিনি আমাদের 'মেজজ্যেঠা মহাশয়' ছিলেন। মেজজ্যেঠা মহাশয় প্রতি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছাতে উঠিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার পীড়ার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র বড় যাইতে পারিতেন না। সেই ছাতের এক প্রান্তে ঠাকুর ঘর, আমাদের পৈতৃক শালগ্রামজী তথায় অবস্থান করেন। ঠাকুরের আরতির সময় দুই জ্যেঠা মহাশয়ই

উপস্থিত থাকিতেন; সেজজ্যেঠা মহাশয় যেখানেই থাকুন, আরতির সময় আসিয়া ছাতে উঠিলে তিনি স্বয়ং স্বহস্তে কাঁসর বাজাইতেন। তাঁহার শাসনে বাটীর সকল ছেলেকেই সে সময় ঠাকুর দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইতে হইত। প্রায়ই কদাপি এ নিয়মের অন্যথা ঘটিত না। ঠাকুর আরতি সমাপ্ত পর্য্যন্ত মেজজ্যেঠা' মহাশয় ছাতে থাকিতেন। আরতির কিছু পূর্ব্বে আমরাও সেখানে যাইতাম। কিন্তু ধন্দমণিকে কোল হইতে নামাইয়া আমাদিগের কাহাকেও তিনি কখনো কোলে করিতেন না। তাহা দূরে থাকুক, ধন্দমণি ব্যতীত আর কাহাকেও নিকট ঘেঁসিতে দিতেন না, কাহাকেও লইয়া বিশেষরূপে কোনো প্রকারের আদর আহ্লাদ করিতেন না, বরং ধন্দমণির পরিতোষার্থ অন্য সকলকে খাটাইতেন! ধন্দমণির জুতা পড়িয়া গিয়াছে, "উঠিয়ে দে তো রে!" ধন্দর ক্ষুধা পাইয়াছে, "অমুক, যা তো, কিছু খাবার চেয়ে আন্ তো" ইত্যাদি।

সেজ জ্যেঠা মহাশয় আপন পুত্রকে অমন স্নেহ বা অত প্রশ্রয়দান করিতেন না, বরং দাদার কাণ্ড দেখিয়া বিরক্ত ও ভীত হইতেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই ভাল বাসিতেন—কখনই আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন না, শ্বশুর বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন "দাদা আমার ছেলের মাথা খাইলেন!"

সে যাহা হউক, সেই ধন্দমণি, নাগরভাটা, আল্লাদে গড়গ'ড়ে, ফুটিফাটা বা রাঙাবাবু এইরূপে অসীম আদর ও প্রশ্রয়ের আশ্রয়ে লালিত পালিত হইতেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তিনি কতদূর কৃতকার্য্য ও চরিত্র বিষয়ে কি প্রকার হইলেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণ কি উৎসুক আছেন? আপনাদিগকে তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে? আপনারা অনুভবে তাহা কি বুঝিয়া লইতে পারিবেন না? বোধকরি, পারিবেন। তবে সকলে পারিবেন কি না সন্দেহ, অতএব কিঞ্চিৎ শুনুন;—

ধন্দমণি পাঠশালায় সকল দিন যাইতেন না; মাসের মধ্যে প্রায় তিন সপ্তাহ অনুপস্থিত থাকিতেন; অবশিষ্ট সপ্তাহ কি অষ্টাহের মধ্যেও সকল দিনের দুই বেলাও উপস্থিত হইতেন না, সেই অনুপস্থিতির কালে হয় জ্যেঠামহাশয়ের ঘরে, নয় মুদীর দোকানে, নয় বাগানে, নয় খড়ের গাদার নীচে লুকাইয়া থাকিতেন। কেননা, গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পীড়া ব্যতীত কোনো ছাত্র যে হঠাৎ গরহাজির থাকিয়া বাঁচিয়া যাইবেন, তাহার যো ছিল না—তৎক্ষণাৎ যমদূতের ন্যায় বলবন্ত ও দুরন্ত সর্দ্দার পড়ুয়ারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রেরিত হইত। আদালতের খাড়াওয়ারিনের পেয়াদারা বা কোথায় লাগে? কাহারো অন্দরে থাকিলে তো বিচারকের জমাদার পেয়াদার হাতে নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু গুরু মহাশয়ের পড়ুয়ার হাতে কোনো স্থানে অব্যাহতি নাই! সেই যে বলে "কি মাখিলেও যমে ছাড়ে না!" ইহাও তাই! আবার পাঠশালার গোয়েন্দার কাছে পুলিসের গোয়েন্দারা যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহা একবার কেন, জোর করিয়া শতবার বলিতে পারি!

যাঁহারা এখনকার বিদ্যালয়ের ছাত্র, তাঁহারা সে দায়ে কখনই পড়েন নাই, সুতরাং কি থানা ফৌজদারীতে আবৃত হইয়া তাঁহাদের পিতা পিতৃব্যাদি যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা জানেন না !

কল্পনা করুন, বদন নামে কোনো পড়ুয়া জানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোনো সামান্য অপকর্ম করিয়াছে। এখনকার শিক্ষক হইলে তজ্জন্য দুই চারি মিষ্ট ভর্ৎসনায় অনুতাপ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন। গুরু মহাশয় তাহা শুনিতে পাইয়া সর্ব সমক্ষে শাসাইলেন, যে, "ছোঁড়া কা'ল্ আসুক আগে, তার পীঠের চামড়া রাখবো না—তারে জ্যান্ত ব'লে ধ'ব্বো', মড়া বলে ছাড়বো।" ছুটীর পর সেই শাসানির কথা বদনকে বলিবার জন্য পড়ুয়াদের ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। তাহা শুনিয়া বদনের আত্মা পুরুষ উড়িয়া গেল—রাত্রে ভালরূপে ঘুম হইল না, তিন চারিবার ডরিয়া ডরিয়া উঠিল—পরদিন বদনের মা "ছেলে কেন ডরায়" এই কথা চেতনীদের জিজ্ঞাসা করিয়া পুরোহিত ডাকিয়া নারায়ণের তুলসী দেওয়াইলেন ! এদিগে প্রভাত হইবামাত্র বদন হিঁদুপাড়া ছাড়িয়া এককালে মুসলমান পাড়ায় গিয়া ইক্ষু চর্ব্বণ ও রস পান পূর্ব্বক ক্ষুধা নিবারণ করিতে লাগিল ! বেলা হইল, বদন বাড়ী আইল না, এড়া ভাত শুকাইতে লাগিল, বদনের মা ছেলের গত রাত্রের চমকানো স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, বদনের বাপ তাড়াতাড়ি পাঠশালায় গিয়া তল্লাস করিলেন, ছেলে পাঠশালায় যায় নাই ! গুরু মহাশয় বুঝিলেন, বদন পলাতক আসামী হইয়াছে, তদণ্ডেই উপযুক্ত পদাতিক চারিজনকে ধরিয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। তাহাদের সন্ধান করিতে কতক্ষণ লাগে ? চোর ডাকাইত ধরিতে চোর ডাকাইত চর ব্যতীত ব্লাকিয়ার, এলিয়েট ও ওয়াকোপ সাহেবান কি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, বদন মুসলমানীর ধান সিদ্ধের কাছে বসিয়া তুষের জ্বাল ঠেলিয়া দিতেছে, পড়ুয়ারা তাগে বাগে চুপি চুপি গিয়া একবারে বাঘের মতন আঁক করিয়া ঘাড়ে পড়িল ! বদন ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ; বিস্তর অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক সমপাঠীদের হাতে পায় ধরিল ; মুসলমানীরা অনেক অনুরোধ করিল ; তবু তাহারা ছাড়িবার লোক নয়—একজন বলিল "কেন; সে দিন আমাকে যে তুই কাঠের মাচা থেকে ধরে এনেছিলি।" এখন বদন পলাইবার পন্থা দেখিতে লাগিল, বলপূর্ব্বক হাত ছাড়াইয়া যাইতে চেষ্টা করিল; তাহা পারিল না। তখন দুই পড়ুয়ায় দুই হাত ধরিয়া, বদনের পৃষ্ঠদেশ প্রায় ভূমিসাৎ, বদনের বদন ও বুক আকাশচুম্বি এই ভাবে দোলাইয়া লইয়া চলিল বদনের মাথাটা ঝুলিয়া পড়িল, বড় কষ্ট হইল, চীৎকার শব্দে কাঁদিতে লাগিল ! তদ্দর্শনে পড়ুয়ারা এক চাষার ছেলেকে উহার মস্তকটা ধরিয়া যাইতে কহিল ; পাঠশালার এমনি প্রতাপ, সেই কৃষক-পুত্র ভয়ে ভয়ে তাহাই করিল। তখন পড়ুয়ারা নির্ব্বিঘ্নে প্রকাশ্য পথ বাহিয়া চারিজনে গানের মতন সম-উচ্চৈঃস্বরে এই বলিতে বলিতে বদনকে ঐ দোলাভাবে লইয়া চলিল—

"গুরুমশা'ই গুরুমশাই তোমার প'ড়ো হাজের ! একটুখানি জল দেও ছাতি ফাটে এর।" ইত্যাদি।

আমাদের ধন্দমণি ঐ ভয়েতেই আগানে বাগানে আনাচে কানাচে পলাইয়া বেড়াইতেন, বড় পীড়াপীড়ি হইলে জ্যেঠা মহাশয়ের ঘরে গিয়া লুকাইয়া থাকিতেন! গুরুমহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহার বিলক্ষণ শাসন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ধূর্ত্ত ধন্দমণি ভাণ্ডাশামুক দিয়া আপনার গা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে জ্যেঠা মহাশয়ের কাছে গিয়া এমনি ভাব দেখাইতেন, যে গুরুর নিদারুণ প্রহারে তাঁহার শোণিত-স্রাব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। জ্যেঠা মহাশয় ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া গুরুকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতেন এবং ভৃত্য বা অন্য কাহারো দ্বারা বলিয়া পাঠাইতেন, যে, যদি তিনি ধন্দমণিকে আর মারেন, তবে তাঁহার পাঠশালায় পাড়ার কোনো ছেলেকে যাইতে দিবেন না এবং বিধিমতে তাঁহার মন্দ করিয়া তুলিবেন। বিদেশী দরিদ্র গুরু অমন লোকের ভয় প্রদর্শনে যে ভীত হইবেন, আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ তিনি ভাবিতেন এবং স্পষ্টই বলিতেন, "তাঁহাদের আপনাদের ছেলেকে যদি আপনারা অধঃপাতে দেন, তবে আমার এত দায় কি ?"

এইরূপে ধন্দমণি গুরু অপরাধেও গুরুর গুরু দণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া অনেক যত্নে স্বাধীনতা-রত্নের অধিকারী হওতঃ এককালে যদৃচ্ছাচারী ও যথার্থই ধন্দমণি হইয়া উঠিলেন! তাঁহার লেখাপড়ার সীমাসংখ্যা আর কি করিব, তিনি একাল পর্য্যন্ত তেরিজ, বেরিজ বা জমা-খরচের উর্দ্ধ উঠিয়াছেন কিনা ঠিক বলিতে পারি না! পাঠশালায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যে কয় দিন যাইতেন, সঙ্গোপনে তাঁহার হইয়া অঙ্ক কষিয়া দিয়া কত ধূর্ত্ত বালক যে কত পয়সা উপার্জ্জন করিত তাহা মনে হইলে হাসি পায়! অঙ্কের সীমা এই। সাহিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহিত্যই রহিয়া গিয়াছে! তাঁহার নবীন গুম্ফ প্রভৃতি যৌবন দশার সমুদয় চিহ্ন এবং মাতৃভাষার বিদ্যায় সর্ব্বানন্দী গোছের পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া তাঁহার পিতা তাহাকে ইংরাজী অধ্যয়নের সোপানে স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথম ধাপে পা দিতে দিতে আর দিলেন না—মর্জ্জি হইল না! তজ্জন্য তাঁহার পিতা যদি কদাচিৎ কথঞ্চিৎ শাসনদানোন্মুখ হইতেন, অগ্রজের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহা পারিতেন না। সুতরাং আমার নাগরভাঁটা দাদা অনায়াসে যথার্থ একটী ডাগর রকমের নাগরভাঁটা হইতে সমর্থ হইলেন।

ধন্দমণি দাদার চরিত্র এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বিবরণ বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিতে সাহস ও ইচ্ছা করি না। সাহস না করিবার কারণ এই, যে, সেই চরিত্র পবিত্র পর্য্যায়ের পৃষ্ঠভাগে এত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা অণুশিরায় বিভক্ত, যে স্বয়ং গণপতি বা তাঁহার দিদি সরস্বতী হইলেও বর্ণনে অক্ষম! আর ইচ্ছা না করিবার কারণ এই, যে, এরূপ জীবিত আত্মীয়ের জীবনালোচনায় অহেতুক অপ্রিয় ও অপ্রার্থনীয় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। অথচ তাহাতে সাধারণের কোনো বিশেষ উপকার দেখি না। তাঁহার বাল্যাবস্থার কথা বলাতে তাঁহার কোনো বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে না, অথচ অপরের নীতি শিক্ষালাভের সম্যক্ সম্ভাবনা আছে। সেই বাল্যদশা অথবা শিক্ষার কালে

অপরিমিত প্রশ্রয় যে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেও এখন স্বীকার করিয়া থাকেন—এখন তাঁহার সে বিষয়ে চৈতন্য জন্মিয়াছে ; কিন্তু রোগ পাকিয়া উঠিবার পর পূর্ব্ব অমিতাচারের জন্য আপশোষ করিলে আর কি হইবে ? এখন' সংকল্প করিয়াও অভ্যস্ত কদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার যো নাই !

আমরা বিশেষরূপে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং অদ্যাপিও দেখিতেছি, তাঁহার বুদ্ধি স্বভাবতঃ 'অতি সূক্ষ্ম ও কার্য্য কারণ ধারণক্ষম ! কিন্তু হায় ! সেই মহা উর্ব্বরা ক্ষেত্র যথোপযুক্তরূপে সুকর্ষিত ও তাহাতে সুশস্যের বীজ রোপিত হইল না। অসঙ্গত প্রশ্রয়-সার পাইয়া নিবিড় বিষাক্ত কণ্টক তরু সমূহ উৎপাদন পূর্ব্বক এই মহাবাক্যের সমর্থন করিল, যে ;—

'If good you plant not, vice will fill the place."

ফলতঃ সদসৎ শিক্ষার এতই আশ্চর্য্য প্রভেদ, যে, যে বুদ্ধি হয়তো তাঁহাকে রামমোহন রায় করিতে পারিত, সেই বুদ্ধি তাঁহাকে যাহা করিয়া তুলিয়াছে, তাহার উপমা জানিলেও ফুটিতে পারি না ! প্রথম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাঁহার জীবন তাঁহার নিজের পক্ষে কি সুখময় এবং সমাজের পক্ষে কি মহোপকারী জীবনই হইতে পারিত ! শেষের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহার সেই জীবন তাঁহার নিজের পক্ষে (এখন ও পরে) কি অনন্ত দুঃখভারবহ এবং তাঁহার স্বজন ও সাধারণ সামাজিক জনগণের পক্ষে কি কণ্টকর—কি অপকারী জীবনই হইয়া রহিল ! এরূপ জীবন সর্ব্ব বিষয়ে সমাজের অহিতকারী, কেবল এক বিষয়েই হিতকারী ; অর্থাৎ পাকতঃ অন্যের শিক্ষাদাতা বটে ! এরূপ জীবন যেন ডাকিয়া ডাকিয়া চতুর্দ্দিগস্থ সকলকে বলে "দেখ ভাই সকল ! আমি অপার দুঃখ পাইব জানিয়াও কেবল তোমাদের চৈতন্যোদয়ের নিমিত্তই এত মন্দ হইয়াছি, ইহাতেও যদি তোমরা সতর্কতার আশ্রয় না লও তবে তোমরা আমা অপেক্ষা অধিকতর মন্দ !" এরূপ জীবন তাহার শিক্ষার কালকে ধ্যান করিয়া যত অনুতাপ—যত শোক করে, ততই অন্যকে জানাইয়া দেয়, যে, পর্ব্বত প্রমাণ স্বর্ণ দিলেও সে দিন আর আসিবে না !

"No gold can buy them back again !"

এরূপ জীবন সর্ব্বতোভাবে আমাদের শিক্ষক ও উপদেশক। আমাদের মধ্যে কি বালক, কি অভিভাবক, এরূপ জীবন পুস্তক হইতে নিত্য পাঠ গ্রহণ করা সকলেরই উচিত ! বোধ হয়, আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিব বলিয়াই আমাদিগের পরম গুরু ও পরমপিতা পরমেশ্বর এরূপ দুই একটী জীবন-গ্রন্থকে সযত্নে সমাজ-পুস্তকালয়ে সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করেন !

আমার দ্বিতীয় সঙ্গীর কথা বলিতে অবশিষ্ট। তাহা অতি অল্প কথায় সমাপ্ত করিব। তাহার নাম "নলছেঁচা" বা "বেড়িকাটা কানাই" ছিল। তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি তাহাতে তাহার বদনখানি বসন্ত-চিহ্নে সুচিহ্নিত ; স্থূলবুদ্ধি

ও অপরিষ্কৃত ছিল ! সে আমার প্রতিবাসী, কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞাতিপুত্র বটে, কিন্তু অত নিকট জ্ঞাতি নহে। তাহার পিতা, মাতা, খুড়া, জ্যেঠা তাহাকে আদর দিতেন না। আদর দূরে থাকুক, তাহার পিতা তো তাহাকে "দ্যাখ্ মার্" করিতেন। কি লেখাপড়ার ত্রুটী, কি অন্য কোনো সামান্য অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে এত শাস্তি পাইতে হইত, যে, দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। বিশেষতঃ যদি তাহার পিতা কখনো তাহাকে খেলা কি দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিতে পাইতেন, তবে আর নিস্তারও থাকিত না—তাহার পীঠের চামড়া রাখা ভার হইত ! তিনি বিনা অপরাধেও সতর্ক করিবার জন্য কথায় কথায়—নড়িতে চড়িতে "সাবধান সাবধান !" রব হাঁকিতে ভালবাসিতেন। এবং দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার এই বলিয়া শাসাইতেন "তুই বার হবি কি তোকে নলছেঁচা কব্বো !" এইজন্যই পাড়ার ছেঁাড়ারা তাহাকে "নলছেঁচা নলছেঁচা" করিয়া খেপাইত ! ক্রমে ছেলে বুড়া সর্ব সমাজেই তাহার "নলছেঁচা" পদবীটী জাঁকিয়া উঠিল ! পরিশেষে সুবিধা ও সুশ্রাব্যতার জন্য "নল" ছাড়িয়া লোকে তাঁহাকে সুধু "ছেঁচা কানাই" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। এখনও তাহার অসাক্ষাতে গ্রামসুদ্ধ লোকে ঐ নামে তাহার মর্যাদা রাখিয়া থাকেন। তাহার সাক্ষাতে তাহার ইয়ারেরা ব্যতীত আর কেহই সে নামে ডাকিতে সাহসী হয় না ; যিনি ডাকিবেন, নিশ্চয়ই ত্রিরাত্রি মধ্যে তাঁহার বাটীতে কি বাগানে চুরি হইবে !

আমি এবং আমার অন্যান্য আবাল সঙ্গীগণ বহুকাল হইল, ঐ ছেঁচা কানাইয়ের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হইয়াছি। কেননা তাহার এবং আমাদিগের জীবনের পথ সম্পূর্ণ বিপরীত মুখে অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। কেন ও কিরূপে তাহা হইল, ক্রমে তাহার বৃত্তান্ত সকলই বলা হইবে।

তাহার পিতা তাহাকে খেলিতে দিতেন না, বেড়াইতে যাইতে দিতেন না, আমাদিগকে তাহার কাছে যাইতেও দিতেন না, পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া কেবলই লিখাইতেন পড়াইতেন, আপনিই সে কাজ করিতেন। তিনি বড় কৃপণ—দেশের ডাক্‌সাইটে কৃপণ ছিলেন। গুরু মহাশয়কে বেতন দিতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত এবং পাছে পাঠশালার দুষ্ট পড়ুয়াদিগের সহিত মিশিয়া পুত্র মন্দ হয়, এই উভয় কারণেই তিনি ঘরে বসিয়া আপনিই পুত্রকে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তিনি কতক্ষণ চৌকি দিবেন ? খাতক পাড়ায় তাঁহাকে নিত্যই সুদ আদায় করিতে যাইতে হইত , গৃহিণীর উপর পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যাইতেন। তিনি যেমন বাহির হইতেন, নলছেঁচা অমনি জননীকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের রম্ভা দেখাইয়া চম্পট দিত ! দিয়া আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত। মিলিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত ! বাঁচিয়া প্রাণ ভরিয়া অনেকক্ষণ খেলাধূলা করিয়া লইত। (এইজন্যই তাহার নাম "বেড়িকাটা" হইয়াছিল !) আবার যেই তাহার পিতার আসিবার সময় হইত, অমনি বাড়ী চলিয়া যাইত। এবং মায়ের চরণে পড়িয়া কাতরোক্তিতে "বাবাকে ব'লে দিও না" বলিয়া বিস্তর কাঁদিত।

মায়ের প্রাণ, মাগী আর বলিয়া দিতে পারিত না। কিন্তু খেলার মত্ততায়—দিন কালানুভাবকতা শক্তির ঠিক পরিমাণ রাখিতে না পারাতে এমনও ঘটিত, যে, নলছেঁচার বাপ হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখনও বেড়িকাটা খেলা করিতেছে !

আহা! সে অবস্থায় কি ভয়ানক কাণ্ডই ঘটিত! বাটী আসিয়া প্রিয় পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া গাভীহারা গোপের ন্যায় বেড়িকাটার বাপ একেবারে রক্তমুখো হইয়া খেলার রঙ্গভূমিতে ছুটিয়া আসিতেন। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আমরা যেই বলিতাম "ওরে ছেঁচা, পালা পালা, প্রাণ বাঁচা, তোর বাপ আসছে ইত্যাদি!" অমনি নলছেঁচা কোথায় যে লুকাইবে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইত—তখন পৃথিবী দ্বিধা না হইলে তাহার লুকাইবার স্থান আর ছিল না! বলিতে বলিতে দ্বিতীয় কৃতান্তের ন্যায় তাহার পিতা আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া নিদারুণ প্রহার করিতে করিতে লইয়া যাইত—আমরা দেখিয়া নয়নজল নিবারণ করিতে পারিতাম না!

এই দোর্দণ্ড শাসন ও নিভৃত শিক্ষার ফল কি হইল? কেন, অল্পকালেই ধূর্ত্ততা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাকথন ইত্যাদি সর্বপ্রকার পাপের কারণগুলি অতি সহজে—অল্পে অল্পে তাহার মনকে অধিকার করিয়া বসিল! পিতাকে ঠকাইবার চেষ্টায় বুদ্ধিবৃত্তিকে অনবরত নিযুক্ত করিতে করিতে প্রতারণা-বিদ্যায় এতদূরে কুশলী হইয়া পড়িল, যে তাহার শৈশবের—এবং যৌবনের কাপট্য তৌল করিয়া আমরা কত আপশোষই করিয়াছি। সুদ্ধ ইহাই নহে; তাহার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার কিছু কিছু ব্যয়েরও আবশ্যকতা বোধ হইতে লাগিল—ইচ্ছা, আর পাঁচজনে যেমন চড়িভাতিতে পয়সা দিতেছে, সেও সেইরূপে দেয়—ইচ্ছা, আর আর ছেলে যেমন ভাল খায় পরে, সেও তাহা করে—ইচ্ছা, আর আর ছেলে যেমন (হাতীর পাল গ্রামে চরা করিতে আইলে) মাহুতকে পয়সা দিয়া হাতী চড়িতেছে, সেও সেইরূপে চড়ে, ইত্যাদি। কিন্তু এমন বাপ নয়, যে, একটী কাণাকড়ি তাহাকে দিবে।

একে তো সে অল্প বয়সেই মিথ্যাকথা ও প্রবঞ্চনায় পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাতে পয়সার অভাব; তাহার উপর ধর্ম্মনীতি শিক্ষার অভাব; কাজেই বিনাব্যাজে তাহার দুষ্প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল—নলছেঁচা কানাই ক্রমে ক্রমে চোর কানাই হইয়া পড়িল। জনক জননীর যে নিৰ্ম্মল স্নেহ সকল ধর্ম্মের জনক, তাহার পক্ষে তাহাও বিকৃত, গৃহে তাহার কোনো সুখ নাই, পাছে আপন কর্ম্মদোষে পিতার নামে কলঙ্ক রটে, কুলে কাঁটা হয়; তাহার সে চিন্তাও ছিল না। কেননা পিতাকে শত্রু বই মিত্র ভাবিবার কারণ সে পায় নাই; লজ্জার ভয়, দণ্ডের ভয়, প্রহারের ভয়, এবং অপমানের ভয় তাহার পিতা তাহাকে অজস্র মারিয়া মারিয়া "কিলদেগুড়ো" করিয়া তুলিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার মনুষ্যত্ব ঘুচাইয়া পশুত্ব জন্মাইয়া দিয়াছেন, তাহার কুকর্ম্মের ত্রাস হইবে কেন? সুতরাং কুকর্ম্মের দরুণ যে সব সামাজিক রাজনৈতিক দণ্ড ও অপমানাদি ব্যবস্থাপিত আছে, তত্তাবৎকে সে ভয় করিবে কেন? ফলকথা, অল্পকাল মধ্যেই—

তাহার সম্পূর্ণ যৌবন হইতে না হইতেই—ছেঁচা কানাই চোর হইল, লম্পট হইল, পিতার বিরুদ্ধে ঘোর বিদ্রোহী হইল এবং কুপথ ও কুসঙ্গের যাহা বল তাহাই হইল! প্রথমতঃ অন্যত্র চুরি করে নাই, ঘরেই করিয়াছিল। পিতার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া পলাইয়াছিল; সেই টাকায় যত দিন চলে; তত দিন অপব্যয়ে তাহা উড়াইয়া অনেক কষ্টভোগান্তে পুনর্ব্বার গ্রামে দেখা দিল—বাড়ীতেও আইল। বাড়ীতে আর চুরি করিতে পাইল না। কাজেই পরের ঘরে চৌর্য্য কার্য্য আরম্ভ করিল! এইরূপে অপরিমিত শাসনের দোষে নলছেঁচা কানাই বেড়িকাটা কানাই হইল, বেড়িকাটা হইতে হইতে বেড়িখাটা চোর হইল, চোর কানাই কতবার মেয়াদ খাটিল—এখন গ্রামের বিষম বালাই হইয়া কাল কাটাইতেছে—কখন্ কাহার কি করে! এই ভয়ে লোকে শশব্যস্ত রূপে রহিয়াছে। আমরা শৈশবে যাহাকে অতি সরল—অতি সদন্তঃকরণ বন্ধু বলিয়া জানিতাম, কুশিক্ষা ও কুশাসনের ফলে সেই বন্ধুই সমাজের ও পিতৃকুলের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

অতএব সাবধান! "অতি" শব্দটা কোনো বিষয়েই ভাল নয়—"সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।" অতি প্রশ্রয় দ্বারা আমার একসংগী এক মহা ধিংগী হইয়া জন্মের মত "বহিয়া" গিয়াছেন; আবার অতিশাসন দ্বারা আমার আর এক খেলোয়াড় তদধিক অসাড় বদমায়েস হইয়া উঠিয়াছেন! মধ্যপথ সর্ব বিষয়েই উত্তম; মধ্যস্থের বিবেচক পাঠকগণ অবশ্যই মাঝামাঝি প্রণালী অবলম্বনে আপনাপন সুকুমারমতি প্রাণাধিক প্রিয় শিশু-বৎসগণকে লালিত, পালিত, সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, তজ্জন্য ঐকান্তিক প্রার্থনা!—তদুদ্দেশেই ধন্দমণি ও নলছেঁচার উপাখ্যান কথিত হইল!—নচেৎ তাহারা কে, যে, তাহাদের ইতিহাস মধ্যস্থে স্থান পায়?

পঞ্চম পট—তখনকার শান্তিসুখ

ধন্দমণি ও নলছেঁচা প্রভৃতি সংগীগণ পড়িয়া থাকুন, আমি এখন মামার বাড়ি যাইতেছি! সে কোথায়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণনগর জিলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর নামা ক্ষুদ্র, কিন্তু ভদ্র গ্রামে আমাব মাতামহ বাস করিতেন।

আমাদিগের নিজ গ্রাম হইতে নিশ্চিন্তপুর ষোল ক্রোশ উত্তরদিগে স্থিত। সুতরাং অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণ করিয়াও—মেজদাদা ও আমি এক শিবিকাতে এবং মাতাঠাকুরাণী অপর একখানিতে—বাহকগণের স্কন্ধে এত লঘুভার—পথে তাহাদিগের বা আমাদের রন্ধনাদি হয় নাই, মা ব্যতীত আর সকলেই ফলার করিয়া লইলাম—পথে দস্যু তস্করের আশঙ্কায় বাহকদের দ্রুতগতি—তথাপি সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতে আমরা পঁহুছিতে পারিলাম না।

মৃত কবি রায় দীনবন্ধু মিত্রের জন্মভূমি খোজা চৌবেড়িয়া গ্রাম পশ্চাৎ করিয়া

কিয়দ্দূর গিয়াছি, নিশ্চিন্তপুর তখনো দুই ক্রোশ দূরে, সেই স্থলে, সন্ধ্যা হইল। কৃষ্ণ পক্ষ, মেঠো পথ, শীতকাল, ধান্য ক্ষেত্রে কিছুই নাই—গোড়া কাটা মাত্র অবশেষ—ছোলা, কৃষ্ণ মুগ, তিসি ও তামাকু প্রভৃতি কতক আছে কতক লইয়া গিয়াছে; মধ্যে মধ্যে খামার, উচ্চ উচ্চ আঝাড়া ধানের গাদা, এই ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট একটী বিস্তীর্ণ মাঠ বাহিয়া যাইতেছি। চতুর্দ্দিগ নিস্তব্ধ—জনরব মাত্র নাই, ধেনু পাল ও পক্ষীগণ অনেকক্ষণ বাসায় চলিয়া গিয়াছে—কেবল বাহকগণের ঘুম-পাড়ানে ঘুন ঘুননি শব্দ বা "ডাইনে খানা, হুঁ হুঁ; হুঁসিয়ার ভাই, হুঁ হুঁ; বাঁয়ে আল, হুঁ হুঁ; পাশে খোঁচা হুঁ হুঁ; হুসিয়ার ভাই হুঁ হুঁ, সামুনে ঢিবি হুঁ হুঁ, চোট্ লেগেছে, হুঁ হুঁ, হোঁচট সামাল্, হুঁ হুঁ" ইত্যাদি একঘেয়ে বুলি মাত্র শ্রুত হইতেছিল—তাহাতে আর গা দোলাতে দিনেও অনেকবার ঘুমায়েছি এখন তো ঘুমাবই! মেজদাদা মাঠ আর অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন, আমাকে ঘুমাইতে দিতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! সঙ্গে এত লোক, তাহাদের শব্দ শুনা যাইতেছে, তথাপি তাঁহার পার্শ্বস্থ কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সেও বালক) কথা না কহিলে ভয় ভাঙ্গে না—আমি কথা কহিলেই কি বিপদ আসিবে না? তথাপি মানব হৃদয়ের কি চমৎকার ভাব—ভয়ের কি অদ্ভুত প্রকৃতি, যে, অতি নিকটে স্বজাতিস্বর শুনিতে পাইলেও তত ভয় থাকে না—সাহস যেন দ্বিগুণিত হয়।

সে যাহা হউক, তিনি আমায় ঘুমাইতে নিষেধ করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে "সর্দ্দার দাদা, সর্দ্দার দাদা" বলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিতেছেন। তিলক সর্দার নামে আমাদিগের বাড়ীর একজন পুরাতন সর্দার আমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছে; সে একটু আগে আগে যাইতেছে; মেজদাদার ডাক শুনিতে পায় নাই। কিন্তু অগ্রবর্তী শিবিকা হইতে মা তাহা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ বুঝিয়াছেন যে আমরা ভয় পাইয়াছি। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া বাহকগণকে বলিলেন, "আর তো বেশী পথ নেই, ছেলে দুটীকে আমার পাল্‌কীতে তুলে নে!"· তাহারা আপনাদের সমস্ত দিবসের ক্লান্তি জানাইয়া তাহা স্বীকার করিল না। তখন মা কহিলেন "তবে সর্দ্দারকে আমার কাছে আসিতে বল।" বাহকেরা সর্দ্দারকে ডাকিয়া দিলে মার আজ্ঞাতে সে আমাদের পাল্‌কীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও অভয় দান করিল এবং আমাদের শিবিকা আগে লইয়া আমাদের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিল।

এইভাবে কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে তিন চারিটী ধান্যের গাদা বিশিষ্ট এক খামার হইতে শৃগালের ডাকের ন্যায় একটী ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা গেল—তাহা যে প্রকৃত শিয়াল ডাক নয়, তাহা ষষ্ঠ কি সপ্তম বর্ষীয় বালক যে আমি, আমি পর্য্যন্তও বুঝিতে পারিলাম! মেজদাদা তো এককালে "নাই" বলিলেই হয়—পাঠকগণ! বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, আপনাদের চির-সাহসী কৌড়েল তত ভয় পাই নাই; তাহার কারণ, আমি স্বভাবতঃ কখনই ভীরু নই এবং তিলক দাদা কাছে আছে!

তৎক্ষণাৎ আর একটী ডাক, আবার আর একটী! তিলকদাদা আমাদিগের গায় হাত

বুলাইয়া "ভয় কি? আমি আছি?" বলিয়া গাত্রবস্ত্রখানি আমাদিগের পাল্‌কীর মধ্যে ফেলিয়া ভাল করিয়া কোমর বাঁধিয়া বেহারাদিগকে সাহস দিয়া বলিল "চল্‌ ভয় কি? যেমন যাচ্ছিস তেমনই যা!" তাহারা অকৃতনিশ্চয় ভাবে একবার ডাইনে; একবার বাঁয় হেলিতেছে এবং মাতা ঠাকুরাণী "ওরে ছেলেদের আমার কাছে নিয়ে আয়" বলে কাতরোক্তিতে কথা কহিতেছেন, এমন সময় চারি পাঁচ জন যমদূত সদৃশ লাঠিয়াল দ্রুতবেগে উভয় পার্শ্ব হইতে আসিতে লাগিল। যখন তাহারা অর্দ্ধ রসি দূরে তখন তিলক দাদা গভীর স্বরে বলিল "কে তোরা?" তাহারা তদপেক্ষা ভীষণ স্বরে যুগপৎ কহিল "তোর বাপ আমরা!" তিলক দাদা অগ্রসর হইয়া বলিল "হুঁ! বাপ! তবে তফাৎ থাক! খবরদার কাছে আসিস্‌নে—"এইরূপ বাক্য বলিতে না বলিতে তাহাদিগের দুইজন দৌড়িয়া আসিয়া তিলকদাদাকে লক্ষ্য করিয়া একবারে দুইজনেই লাঠি হাঁকিল—আমরা কাঁদিয়া ফেলিলাম। বেহারাগণ পাল্‌কী ফেলিয়া দূরে পলাইতেছে—আর তিন জন দস্যু আর একদিক হইতে পাল্‌কীর অতি নিকট হইতেছে; নিমেষ মধ্যে তিলকদাদা আত্মরক্ষা পূর্ব্বক অত্যাশ্চর্য্য প্রণালীতে স্বীয় লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হঠাৎ এক জনের পায়, তৎপরেই অপরের মাথায় এত সতেজে প্রহার করিল যে, প্রথম ব্যক্তি "বাপ্‌রে" বলিয়া, কিয়দ্দূরে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে সরিয়া গেল এবং দ্বিতীয় দস্যু নিঃশব্দে ধরাশায়ী হইল!

তিলকদাদা এক লম্ফে প্রথমের নিকট গিয়া তাহার পৃষ্ঠে ভীমের গদাঘাতের ন্যায় আর এক ঘা মারিয়া বিদ্যুৎ বেগে পাল্‌কীর অপর দিগস্থ দুর্জ্জনগণের সম্মুখীন হইল! আমরা উঁকি মারিয়া দেখিতেছি,—বুক তোলপাড় হইতেছে; এক একবার চক্ষু বুজিতেছি, তবু দেখিবার ইচ্ছা ছাড়িতেছি না—অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না, তবু দেখিতেছি—এবারে তিলক দাদার মূর্ত্তি; পদচালন স্ফূর্তি ও লাঠি খেলাইবার ভঙ্গী ভয়ানক—আরো ভয়ানক—তেমন তেমন আর কখনো দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ! এবারে এক এক লম্ফে যেন দশ হাত পরে হইতেছে—দুই তিন লম্ফে দুর্জ্জনদিগের লক্ষ্যস্থল হইতে অন্তরিত হইয়া পলক মধ্যে ঘুরিয়া তাহাদের পৃষ্ঠ ভাগে আসিয়া তাহারা না ফিরিতে ফিরিতেই গো-বেড়েন!—সুধু একজনকে গো-বেড়েন নয়—এরে এক ঘা, ওরে এক ঘা; তারে এক ঘা; কিন্তু তৃতীয়কে মারিতে না মারিতে সে সরিয়া পড়িল—ছুটিল!—প্রাণপণে ছুটিল—পাঁচ সাত লম্ফে তিলক তাহাকে ধরিল—সে লাঠি ফেলিয়া হাত যোড় করিয়া পায় পড়ার ভঙ্গী করিল। তাহাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিলক ফিরিয়া আসিল—পূর্ব্বপতিত দুই ব্যক্তির একজন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আসিয়াই তাহাকে আবার এক লাঠি! সে মুমূর্ষুস্বরে কহিল, "বস্‌ হয়েছে, আর না!" তাহার সঙ্গীও তদ্রূপ ভয়ার্ত্ত বাক্য নিঃসারণ করিল—পঞ্চের মধ্যে এক জন মরিল, এক জন পূর্ব্ব কথিত রূপে প্রাণভিক্ষা লইয়া পলাইল, একজন গোঙরাইতে লাগিল; দুই জন তিলক দাদার চরণে শরণ লইল! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম সমাপ্ত হইল!

তিলক দাদা আহত ব্যক্তিদের লাঠি কাড়িয়া লইয়া বলিল "যা বেটারা এমন কাজ আর কক্ষণো করিস নে। এই লাস এখনি পুতে ফেলুগে যা, নইলে তোরাই মৰ্ব্বি।" এই বলিয়া লাঠিগুলি পালকীর উপর রাখিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বেহারাদিগকে ডাকিতে লাগিল। তাহারা কি সহজে আসিবার লোক? তিলক ডাকিয়া ডাকিয়া রণভূমির সবিস্তার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তবে সেই দ্বাদশ বীর ফিরিয়া আসিয়া এই বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল "কি ক'র্ব্বো সর্দ্দার, আমাদের হাতে যদি তোমার মতন অমন গুলবাঁধা লাঠি থাকতো, তো দেখতে তখনি বেটাদের কাত্ ক'রে রা'খতেম!" তিলক কহিল "তা বটে, তোরা কি কম জোয়ান? নে, এখন কাঁধে কর, এই দেখ্ তোদের জন্যে তিন চা'র গাছ লাঠি পেয়েছি এবার আর ভয় নেই।" তাহারা লাঠি লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিল—এ বলে আমি লইব; ও বলে আমার হাতে থাকুক—কেবল তিলক দাদার ধমকে সে গোল মিটিয়া গেল! দুই দণ্ড পরে আমরাও নির্ব্বিঘ্নে মাতুলালয়ে উত্তীর্ণ হইলাম।

সেবারে ঘটনা-সূত্রে চারি বৎসরের অধিক কালও মামার বাড়ী থাকি। সেই চারি পাঁচ বৎসরের যত কিছু ঘটনা, তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিব না। অর্থাৎ কিসের পর কি হইল, এ প্রণালীতে সময় ও ঘটনার পর্য্যায় রক্ষা করিব না। ইহা এমন কিছু রাজত্বের ব্যাপার নয়, যে, দিন, মাস; বৎসরের তালিকা আবশ্যক হইবে। প্রধান প্রধান ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল এবং প্রকৃত পাড়াগাঁর তাৎকালিক প্রধান প্রধান অবস্থাগুলি চিত্রণ করাই যখন বর্ত্তমান পটগুলির মূল অভিপ্রায়, তখন সময়ের পরিবর্তে বিষয়ের উপর অধিক নির্ভর করাই উচিত। এক এক বিষয় লইয়া এক এক নেতাড়ি লিখিত হইবে—সে সকল বিষয় ঐ চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়াছিল, অথবা ঐ কালের দর্শন-ফল; ইহাই বুঝিতে হইবে! সম্প্রতি চোর দস্যু দুর্জ্জনগণের কথা উঠিয়াছে অতএব ঐ অঞ্চলে ঐ কালে ঐ চৌর্য্যাদি বিষয়ের যেরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা ভুক্তভোগী হইয়াছি, বা আত্মীয়জনের ঘটিয়াছে, তত্তাবৎ এই স্থলেই সংখ্যানুক্রমে চিত্রিত হউক—অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অবধান করুন।*

১। আমার মাতামহের বাড়ীটী তিন চারি অংশে বা মহলে বিভক্ত। সদর বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপ, তাহার সম্মুখের উঠানে খামার, তৎপরে বাগান। ঐ বাগান ও খামার এক সারি তিন চারিটী পাকা কুঠারীর পশ্চাতে স্থিত। অন্দর বাটীর উত্তর দিগে প্রকাণ্ড একখানি খড়ুয়া ঘর; পশ্চিমে ঐরূপ এক ঘর, কিন্তু তাহার পশ্চাতে অনেকটা শাদা জমি, তাহার পশ্চিমে পাকা প্রাচীর। দক্ষিণ দিগের অর্দ্ধেক ভূমিতে গোয়ালবাড়ী ও গোলাবাড়ী; অপরার্দ্ধে ঢেঁকিশালা ও রন্ধনশালা। পূর্ব্বদিগে পূর্ব্বোক্ত পাকা ঘরগুলি ছিল। উত্তরের প্রকাণ্ড খড়ুয়া ঘরের ছাঁচ অত্যন্ত দীর্ঘ। সেই ছাঁচের নীচে দিয়া পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত লম্বা পাকা প্রাচীর।

* যাহা যাহা বলিতেছি একটিও কল্পিত নহে।

রাত্রিকালে যখন আহারাদির ব্যাপার সমাধা হইয়া বাটী সুদ্ধ (বাটীতে লোকও বিস্তর ছিল) শয়ন করিত, তখন আমার মাতামহী একাকিনী একটী প্রদীপ হস্তে সেই সুবিশাল বাটীর সর্ব্ব স্থল—গলি ঘুঁচি কোণ প্রভৃতি দেখিয়া ও দুটী দরজার চাবি বন্ধ করিয়া স্বীয় গৃহে আসিয়া বাটী রক্ষার মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনটী করতালি দিয়া শয়ন করিতেন। তখন সে মন্ত্র শিখিয়াছিলাম, এখন আর মনে নাই। তাহাদের এমন সংস্কার ছিল, যে, বাটীর মধ্যে চোর থাকিতে যদি সেই বাড়ীবন্ধের মন্ত্র পঠিত হয়, তবে আর নিস্তার নাই—চোরগণ সর্ব্বস্ব লইয়া যাইবে! কিন্তু বাটীর সীমার বাহিরে চোর সিঁধ কাটিতেছে; এমন সময়ও যদি ঐ মন্ত্রপাঠ দ্বারা বাড়ী বন্ধ করা যায় তবে সহস্র চেষ্টাতেও চোর বাড়ীর মধ্যে আসিতে পারিবে না—তাহার কর্ণে যেন পুরীজনের কলরব সমস্ত রাত্রি প্রবেশ করিবে—সে অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনা হইতেই পলায়ন করিবে! এই সংস্কারের বসেই আমার আইমা সমস্ত বাটী পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র ও হাততালি দ্বারা বাড়ী বন্ধ করিতেন না!

একদা ঐরূপ দীপ হস্তে চতুর্দ্দিগ পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন উত্তরের সেই বড় ঘরের ছাঁচের নিকট গিয়াছেন, তখন তাঁহার কর্ণে নাক-ডাকার শব্দ আইল—যেন ঘরের বাহিরে কাহারোও নাক ডাকিতেছে এমনি শব্দ শুনিলেন—তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু বুনোরা যেমন বাঘকে বড় ভয় করে না, নিশ্চিন্তপুরাঞ্চলের মেয়েরাও তেমনি চোরকে বড় গ্রাহ্য করিত না! কারণ তথায় চোরের পদার্পণ প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা, সুতরাং অভ্যাসের তলে পড়িয়া যায়! আইমা শব্দানুসারে ধীরে ধীরে সেই ছাঁচতলার প্রাচীরের নিকট গেলেন। গিয়া দেখেন, "তস্কররাজ চালের বাতা ধরিয়া ঐ বড় ঘরের উচ্চ দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়া পাকা প্রাচীরের উপর অশ্বারোহীর ন্যায় এক পা বাহিরে এক পা ভিতরে এই ভাবে বসিয়া অনায়াসে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন—তাঁহারই নাসিকা-ধ্বনিতে বাড়ীসুদ্ধ আমোদ করিতেছে! তিনি যদি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে কিম্বা বাড়ীর অপরাংশে গোঁসাই দাস নামক যে এক পুরাতন কৃষক ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল তাহাকে ডাকেন, তবে ভালই হয়। কিন্তু তাঁহার সাহস নাকি দুর্জ্জয়, তিনি কাহাকেও না ডাকিয়া আস্তে আস্তে প্রদীপটী রাখিয়া দুই হস্ত দ্বারা চোরের লম্বমান দক্ষিণ পদখানি ধরিয়া সজোরে এক টান মারিলেন! ভাবিলেন, চোরকে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া ফেলিয়া পরে চীৎকার করিবেন, সকলে আসিয়া পড়িবে; চোর আর পলাইতে পারিবে না! কিন্তু দুঃখের বিষয়, চোর ভালরূপে বাতা ধরিয়াছিল; যেই আকর্ষণ হইল,—যদিও তাহা সজোরে, তথাপি স্ত্রীলোকের হস্তপ্রসূত, সুতরাং সে অনেকটা হেলিয়া পড়িল বটে কিন্তু একবারে পড়িয়া গেল না—চৈতন্যোদয়ে আপনাপনি সামলাইয়া এক হেঁচকার আইমার হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া লইল ও দিব্য রাজার মতন প্রাচীরের উপর বসিল! বসিয়া বলিল; "কে ও গিন্নী? ধন্য মেয়ে যা হ'ক্!

তোমার প্রাণে কি ভয় নেই ?" তখন আইমা বলিলেন "কেও চাঁদা, তোর এই কাজ ? তোরে এত খাবার দিই, বছরে দুখান কাপড় দিই, তুই নেমখারামি ক'র্ত্তে এয়েছিস্ ?" চাঁদা বলিল "না মা, চৌকী দিতে দিতে বড় ঘুম পেলে, তাই এখানে ব'সে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেম !" আইমা কহিলেন "আমার পাঁচীর তোমার খাট না কি ?" সে উত্তর দিল "ঘুমের ঘোরে পথ ভুলে এখানে উঠে পড়েছি—আর এমন কাজ হবে না—" এমন সময় গোঁসাই দাস তাঁহাদের কথার আওয়াজ পাইয়া সেখানে যাইতেছে দেখিয়া চাঁদা চৌকীদার প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া বাহিরে পড়িল ! গোঁসাই দাস আইমার মুখে সমস্ত শুনিয়া "আমায় কেন ডাকলেন না" বলিয়া ভারি আপশোষ করিতে লাগিল। আমরা তখন কেহই ঘুমাই নাই, তৎক্ষণাৎ সমস্ত শুনিয়া অবাক হইলাম !

২। আর একদিন দুই জন চোর অনেক বাসন লইয়া যাইতেছিল, গোঁসাই দাসের সতর্কতায় তাহাদিগের দুরভিসন্ধি, বিফল হওয়াতে এই বলিয়া শাসাইয়া গেল "থাক্ বেটা থাক্ ; আগে তোর মাথাটা কাটি, তবে এ বাড়ীতে চুরি ক'র্ব্বো !" যখন কানাচ হইতে এই শাসানি বাক্য বলিয়া যায়, তখন আমরা স্বকর্ণে তাহা শ্রবণ করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া বলিয়াছিলাম "আর এদেশে থাকিব না—এ দেশের চোর আমাদের দেশের ডাকাতের চেয়েও জবরদস্ত !"

৩। আমার মাতামহ গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়া কলিকাতা হইতে বাটী গেলেন। তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। প্রায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। এক রজনীতে আমরা দুই ভাই, আমার মাতা ঠাকুরাণী এবং মাসীমাতা ঠাকুরাণী বড় পাকা ঘরে বড় একখান তক্তাপোষের উপর শয়ন করিয়া আছি, মাতামহ মেঝ্যায় আছেন, মাতামহী তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। প্রায় সকলেই জাগ্রত, তথাপি কানাচে সিঁধ কাটিতেছে। সিঁধকাটার শব্দ বড় টের পাওয়া যায় নাই ; কিন্তু শুষ্ক পাতার উপর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইয়া আইমা চুপি চুপি বলিলেন "বাইরে মানুষ এয়েছে।" মাতামহ বলিলেন "না, এমন হবে না ; আমরা কথা ক'চ্ছি মানুষ কি আস্‌তে পারে ? ও শব্দ গরুর পা'র শব্দ—" আমার আইমা এ বিষয়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ছিলেন—তাঁহার হাঁপে দাপে একবার ব্যতীত তাঁহার বাটীতে আর কখনো কিছু যায় নাই—সকলে বলিত, চোরেরাও ভাবিত "ও মাগী কি জানে।" সে যাহা হউক, মাতামহের ঐ কথার উত্তরে আইমা বলিলেন "গরুর চা'র্ পা; তার পা ফেলার শব্দ আর মানুষের পা ফেলার শব্দ কি বুঝ্‌তে পার না ?" এই বলিয়া দুইটা চেপ্‌টা ঢিলের উপর একটা হাঁড়ী উপুর করিয়া তম্মধ্যে ঘরের প্রদীপটী লুকাইয়া রাখিলেন এবং সকলকে নিস্তব্ধ হইতে বলিলেন। তখন স্পষ্ট ফুস্‌ফুসানি ও সিঁধকাটার শব্দ শ্রুত হইল ; সকলেই অত্যন্ত ভীত হইলেন—আমরা দুই ভাই বিশেষতঃ মেজদাদা তাহাতে আরো কাতর ! সে দিন গোঁসাই দাস স্থানান্তরে গিয়াছিল ; মাতামহ মহাশয় ঘোর পীড়িত, পশ্চিমের ঘরে মেসো মহাশয় আছেন কিন্তু তিনি চলৎশক্তিহীন ; আমরা দুই ভাই বালক ;

সুতরাং বাটীতে পুরুষ মাত্র নাই বলিলেই হয়! আবার চতুর্দ্দিগে যেরূপ বংশকুঞ্জ প্রভৃতির বাগান, তাহাতে প্রতিবাসীদিগকে ডাকিলে কেহ যে শুনিতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা স্বল্প। শুনিতে পাইলেও সে দেশে পরস্পরের সাহায্যে কেহ বড় আইসে না।

আমার আইমা এ সকলই জানিতেন এবং চোরেরাও তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না। সুতরাং তাহারা নির্ভয় হৃদয়ে সন্ধি খনন সমাধা করিতে লাগিল। আইমা নিঃশব্দে উঠিয়া জানালার নিকট গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, জানালার গোব্‌রাটের নীচে সিঁধ কাটিয়াছে—ভিতর হইতে ঢালু ভাব—পরিমাণে বৃহৎ—আর দুই চারি খানি ইট খসাইলেই পথ পরিষ্কার হয়। আইমা অতি সত্বরে আগুনের মালসা লইয়া দরদালানে গেলেন; যে উনানে কর্ত্তার জল গরম হইত তাহা জ্বালিলেন; বড় এক কলসী জল শীঘ্র গরম করিয়া আনিলেন; আর এক কলসী বসাইয়া রাখিলেন—জল এত গরম হইয়াছে, যেন আগুন! এদিগে তৎক্ষণে সিঁধ এপার ওপার হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সকলেই নিস্তব্ধ, সুতরাং চোর আমাদিগকে নিদ্রিত ভাবিয়া নিরাপদ জ্ঞানে সন্ধি মধ্যে মস্তক দিল। চোর প্রায় পারদিগ দিয়াই আইসে, কিন্তু অত উচ্চ জানালায় তাহা সম্ভবে না। যেইমাত্র সে মাথা গলাইয়াছে, আইমা অমনি সেই গরম জল হুড়্ হুড়্ করিয়া ঢালিয়া দিলেন। বাবারে! বলিয়া শব্দ উঠিল—আমরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলাম! "আচ্ছা থা'ক" বলিয়া ঘোরতর গর্জ্জনে শাসাইয়া তস্করদল চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে জানালা দিয়া ভালরূপে দেখিয়া যখন নিরাপদ বোধ হইল, তখন সিঁধ বুজাইবার মন্ত্রণা চলিল।

পাঠকগণ শুনিলে অবাক হইবেন, যে, তৎকালে পল্লীগ্রাম মাত্রেই চোর অপেক্ষা চোরের দমনকর্ত্তা পুলিসকে লোকে বেশী ভয় করিত। সতর্ক থাকিলে, কি টাকা গহনা পুতিয়া রাখিলে চোর অল্প পূজা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে বাধিত হইত, কিন্তু চুরির তদারক জন্য দারোগা জমাদার নামা যে সব রাজনিয়োজিত দস্যু আসিত, তাহাদিগের লোভ—পিশাচের পরিতোষার্থ গৃহস্থকে চোর-ত্যক্ত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হইত—স্থল ও ব্যক্তি বিশেষে ইহার ন্যূনাতিরেক যাহা হউক!

অতএব পরামর্শ হইল, রাত্রি থাকিতে থাকিতে যেরূপে হউক সিঁধ বুজাইতেই হইবে। আমি তৎকালে রামায়ণ পুঁথি সর্ব্বদা পড়িতাম, পুলিসের দৌরাত্ম্য-তত্ত্ব না জানাতে মনে মনে ভাবিলাম "লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে যে কারণে রাত্রি সত্বেও বিশল্যকরণীর প্রয়োজন হইয়াছিল, ইহাও বুঝি তাই!"

সে যাহা হউক, আমার মাতামহের এক জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্ঠীর এদিগ কি ওদিগ্! তাঁহাকে আমরা রাঙা দিদী বলিয়া ডাকিতাম। তিনি অন্য ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে উঠানো হইল। তিনি আসিয়া প্রথমে সিঁধ পরিদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন "এখনই চুন শুর্‌কি রাজ মজুর চাই—এমন করিয়া সারিতে হইবে

যেন কেহ মালুম করিতে না পারে !" তখন প্রশ্ন উঠিল মিস্ত্রী ডাকে কে ? মিস্ত্রীর বাড়ীও গ্রামে নয়, শ্রীনগরে—প্রায় সার্দ্ধ ক্রোশ দূরে ! রাঙা দিদী কহিলেন "যখন গোঁসাই দাস বাড়ী নাই এবং যখন অন্য কোনো রেয়েত জনের কাছে প্রকাশ করা হইবে না, তখন আমাকে নিজেই যাইতে হইবে।" কিন্তু সঙ্গে যায় কে ? পরামর্শ হইল, আমার মেজদাদা যাইবেন। তিনি সম্মত হন না দেখিয়ে আমি যাইতে চাহিলাম। কিন্তু মেজ্ দাদা আমাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতেন, আমাকে বিপদ স্থলে যাইতে দেখিয়া অগত্যা তিনি সাহস বাঁধিলেন। সেই ভরা রাত্রে এক বুড়ীকে সঙ্গে করিয়া তিনি শ্রীনগর গেলেন মিস্ত্রী ডাকিলেন, তাহাকে চতুর্গুণ মজুরি দিতে স্বীকার করিয়া আনিলেন। বাড়ীতে চূন ছিল, শুর্কি নাই ; এজন্য শ্রীনগরের মিন্দাদের বাড়ী হইতে শুর্কি চাহিয়া আনাও হইল। (ঐ মিন্দারা মুসলমান, বিস্তর ভূসম্পত্তির অধিকারী, আমাদিগের সহিত একটা ধর্ম্মসুবাদ থাকাতে অত্যন্ত মান্য ও আত্মীয়তা করিত।) এইরূপে সিঁধ বুজানো হইল—একখান শিল তম্মধ্যে দেওয়া গেল—শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত সেই কার্য্য চলিতে লাগিল !

৪। এক রাত্রি আমাদের গোয়াল বাটী হইতে চারিটা হেলে গরু মাতামহের চাষ ছিল—(সেদেশে সকল ভদ্র ঘরেই চাষ) এবং একটা গাভী চুরি গেল। প্রাতে জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গ্রামের মাতব্বর কিঙ্কর বখসী ও গোবিন্দ মিত্র প্রভৃতি মহাশয়গণকে ডাকিয়া আনিয়া যুক্তি স্থির হইল, যে, এখনি ১০/২০ টাকা লইয়া অমুক গ্রামে অমুক ব্যক্তির নিকট লোক যাউক। তাহাকে সম্মত করিতে পারিলেই সেই দিন, কি তৎ পরদিন রাত্রিকালে যেখানকার গরু সেখানে আসিয়া পেঁাছিবে। তাঁহারা প্রবোধ দিলেন, "কিছু ভয় নাই, এমন শত শত হইতেছে, তোমাদের বা কি, অমুকের পাল সুদ্ধ গিয়াছিল, অমুকের গরু পাঁচ দিনের পথে চালান হইয়াছিল, অমুকের বারটা গিয়া চোরেদের ভুলে তেরটা ফিরিয়া আসিয়াছিল ইত্যাদি !" আমরা দুই ভাই সব কথা শুনিয়া অবাক্—ভাবিলাম পৃথিবীতে এমন কুৎসিত দেশ বুঝি আর নাই ! তখন ইংরাজী শিখি নাই, সুতরাং স্কটের "রব্‌রয়" প্রভৃতি হাইল্যাণ্ডের রীতিবোধক নবন্যাসে "ব্ল্যাক মেল্" এবং "ক্যাটল্ মেল্" ইত্যাদির যে সব বৃত্তান্ত আছে, তাহা জানিতাম না—এখন দেখিতেছি স্কটের হাইল্যাণ্ড এবং আমার মামার বাড়ীতে বড় প্রভেদ ছিল না—আ'জ্ কা'ল্ কিরূপ অবস্থা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু শুনিয়াছি অদ্যাপি পূর্ব্বের ভাবগতিক এককালে সব অন্তর্হিত হয় নাই !

ঐ পরামর্শানুসারে গোঁসাই দাস এবং অত্যন্ত অনুগত ও বিশ্বাসী এক রাইয়ত নব ধোপা টাকা লইয়া উপদিষ্ট ব্যক্তির নিকট গমন করিল। বিস্তর সাধ্য সাধনাতে সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে তোমাদের জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখি কি হয় ? আমি তাদের কোনো সন্ধানই জানিনে, আমার শ্বশুর বাড়ীর দেশে একজন বন্ধু আছেন, তাঁর দ্বারা যদি কিছু হয় !" ইত্যাদি আত্ম-দোষোদ্ধারক ভদ্র বক্তৃতার পর প্রতি

গরুতে ৩ তিন টাকার হিসাবে এবং তাহাদের দুই তিন দিনের খোরাকী ও প্রত্যাবর্ত্তনকালে যাহারা পরিচালক হইবে, তাহাদের পারিশ্রমিক, এই সকল ধরিয়া মোটে ১৮ আঠার টাকা লইয়া গোঁসাই ও নবকে বলিলেন তোমরা বাড়ী যাও। তাহারা ফিরিয়া আইল, কিন্তু একে পাঁচটা গরু গিয়াছে, তাহার সঙ্গে ১৮।১৯ টাকা দক্ষিণা গেল, আমাদের উদ্বেগের সীমা রহিল না! কিন্তু তৃতীয় দিবসের প্রাতে উঠিয়া বাটীর সম্মুখস্থ আম্র-বাগানে ভ্রষ্ট গো পঞ্চ বাঁধা আছে দেখিতে পাইয়া বাটীসুদ্ধ ও পাড়াসুদ্ধ সকলেই হর্ষ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন!

৫। ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক এক ব্রাহ্মণ কুমার শ্বশুর বাটীতে প্রথম গিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে অগ্নিদাহে ঐ শ্বশুর বাটী অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী বাটী পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল। চক্রবর্তী মহাশয় আপাততঃ একখানি লম্বা দোচালা বাঁধিয়া তন্মধ্যে সামান্য দেওয়ালের ব্যবধান দিয়া এক ঘরকে দুই কুঠারী করিয়াছেন। যে দিন জামাতা গেলেন, সেদিন চক্রবর্তী ও তাঁহার পুত্র বাটী নাই। চক্রবর্ত্তীর ব্রাহ্মণী এক কুঠারিতে শয়ন করিয়া দ্বিতীয় গৃহে দশম-বর্ষীয়া কন্যা ও জামাতাকে শয়ন করিতে দিলেন। তাড়াতাড়ি ঘর বাঁধা হইয়াছে, এ নিমিত্ত তক্তার দ্বার হয় নাই—তাল পত্রের ঝাঁপ ও বাঁশের হুড়কা দেওয়া হইয়াছিল। যে কামরায় ঝি জামাই, তাহার দুই দ্বার।

রাত্রি দেড় প্রহর, জামাতা জাগ্রত, কন্যা নিদ্রিতা, কে যেন তক্তাপোষের নিকটস্থ বাহিরের দিগের ঝাঁপখানি ঈষৎ ঠেলিল। জামাতা একে বিদেশী, তায় অল্প বয়স্ক, তায় স্বভাবতঃ অত্যন্ত ভীরু। ঝাঁপ ঠেলার শব্দে ভয় পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল "ওবাটীর ঠাকুরঝিরা বুঝি আড়ি পাতিতে আসিয়াছেন!" ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার ঐরূপ শব্দ এবং ঝুরঝুর করিয়া মাটী পতন হইতে লাগিল। সন্দেহে ও ভয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়া ঝাঁপের ফাঁক দিয়া দেখে—তিনজন যমদূত সদৃশ কৃষ্ণকায়, ঝাঁকড়া চুল, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুরুষ! দিব্য জ্যোৎস্নাময়ী রজনী—দেখিয়া আত্মা-পুরুষ উড়িয়া গেল! জড়সড় হইয়া শয়ন করিল—গলদ্ঘর্ম্ম হইতে লাগিল! পরক্ষণেই মুড়ালি দিয়া একটা ঢিল আসিয়া ঠিক তাহার বুকের উপর পড়িল—গোঁ গোঁ শব্দে অর্দ্ধ চীৎকার, অর্দ্ধ স্তম্ভিত ভাবে "মা মা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল! পার্শ্বস্থা প্রেয়সী একে বালিকা, তাহাতে নিদ্রিতা; ও ঘরে শাশুড়ী, কথা কহিবেন না, মস্ত বিপদ!

জামাতা দেখিল, শাশুড়ী যদি কথা না কহেন এবং এ ঘরে না আইসেন, তবে তাহার প্রাণ সংশয়! সত্য সত্যই ভীরু জামাতার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইয়া উঠিয়াছে—তাহার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে, অনবরত ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, মুখ বুক শুকাইয়া তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে—সে সময় কেহ যদি নাড়ী টিপিয়া দেখিত, তখনি বলিত—"হয় আর কি!" এ অবস্থায় লজ্জা কোন্ কাজের? প্রাণ আগে না লজ্জা আগে? এই ভাবিয়া জামাতা শুইয়া শুইয়া অস্পষ্ট কম্প-কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল "ওমা,

তোমার জামাই যায়—তুমি যদি এখনি এ ঘরে না এস, তোমার মেয়ে রাঁড় হয়—আর বাঁচনে শীগ্‌গির এস—"চোরেরা খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে শুনিয়া আরো প্রাণ উড়িয়া গেল! শাশুড়ি ভাবিলেন জামাই স্বপ্ন দেখিয়া ডরিয়া উঠিয়াছে। অতএব যেন আপনা-আপনি বলিতেছেন, এমন শ্রুত স্বরে বলিলেন "দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং, দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং!"

শাশুড়ীর স্বর শুনিতে পাইয়া জামাতার একটু সাহস হইল, কিন্তু শাশুড়ীর ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিতে লাগিল "ও গো মা, তা নয়; ও গো মা স্বপ্ন ফপ্ন নয়; ও গো মা, আগর ঠেল্‌ছে, ওগো মা, চোর এয়েছে; ওগো মা, মেরে, ফেল্লে—শিগ্‌গির এস মেরে ফেল্লে—তোমার মেয়ে রাঁড় হয়, শিগ্‌গির ক'রে এঘরে এস"—শাশুড়ি কি করেন, জামায়ের সঙ্গে স্পষ্ট কথা কহিতে বাধিত হইয়া বলিলেন "ছি বাবা, অমন ক'চ্ছো কেন? ভয় কি? তোমার ও-বাড়ীর ঠাকুরঝিরে বুঝি এয়েছেন, ভয় কি? ইত্যাদি। "জামাতা মরিয়া হইয়া শয্যা হইতে উঠিল এবং ঘরের মধ্য-দেয়ালের নিকট দাঁড়াইয়া শাশুড়ীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া দৃঢ়রূপে কহিল "তুমি যদি এখনি এ ঘরে না এস, কি কারুকে ডেকে না দেও, তবে আর বেশী ব'ল্‌বো কি—তোমার মেয়ে রাঁড় হয়!" শাশুড়ী বলিলেন "তবে দোর খুলে দেও।" জামাতা বলিল "তুমি দোরের গোড়ায় না এলে দোর খুলতে পার্ব্বো না।" শাশুড়ী আপন গৃহদ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া জামাতার গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার খুলিতে বলিলেন, জামাতা উঁকি মারিয়া দেখিল শাশুড়ী বটেন, তবে দ্বার খুলিল। শাশুড়ী প্রবিষ্টা হইয়া পুনর্ব্বার দ্বার বন্ধ করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক ঘরে যে একখানি দা ছিল, তাহাই হস্তে লইয়া চৌরাক্রান্ত আগড়ের পার্শ্বে গিয়া দেখেন যে, জামাতা যাহা বলিয়াছে সত্য—বরং তিন জনের পরিবর্ত্তে তিনি চারিজন দেখিতে পাইলেন।

তখন সেই দার অগ্রভাগ দেখাইয়া এবং ভিতরে বাঁশের উপর তাহার শব্দ করিয়া নির্ভয় স্বরে ডাকিয়া কহিলেন "শোনো বাছারা, আমার ঝি জামাই ছেলে মানুষ, তারা ভয় পেয়েছে ব'লে এখন মনেও ক'রোনা যে, আমরাও ভয় পেয়েছি। এই দেখ দা আর বঁটী হাতে আমরা দু তিন জন মেয়ে মানুষ এখানে দাঁড়ালেম, কার সাদ্ধি মাথা গলাক্‌ দেখি? যেমন আস্‌বে অম্‌নি দা কোপা আর বঁটী কোপা ক'র্ব্বো—আমরা উগ্রচণ্ডী কালীর জা'ত—তোমরা এক শ লোক এলেও ভয় পাবো না—এক জনকেও প্রাণে রাখবো না!"

অসুর দলনীর গর্জ্জনবৎ এই ভীষণ বক্তৃতা শুনিয়া তস্করেরা কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া ক্ষণকাল চুপিচুপি মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শাশুড়ী জামাতার কিছু সাহস হইল। শাশুড়ীর দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখিয়া এবং বাক্য-প্রয়োগের প্রকরণ শুনিয়া জামাতা তো অগ্রেই সাহসী হইয়াছে। এক্ষণে দুর্জ্জনগণের শৈথিল্য দর্শনে আরো বুক বাড়িল—আগুণে তোলা চিমটা লইয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইল! দুর্বৃত্তেরা

পরামর্শ করিতে করিতে হঠাৎ দৌড়িয়া আসিয়া এককালে দুই তিন জন আগড়ের উপরিভাগ নোয়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবেশের নিমিত্ত মহা আক্রমণ করিল—তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণীর দা তাহাদিগকে উচিত শাস্তি দিয়া ফিরিয়া পাঠাইল! জামাতা আক্রমণের বেগ দেখিয়া "ওগো মা গেলুম!' বলিয়া বালিকা পত্নীর ঘাড়ে পড়িয়া গেল—সে কাঁদিয়া উঠিয়া গোলযোগ আরো বৃদ্ধি করিল! চোরেরা দেখিল, মাগী সুধু কথার লোক নয়, কাজের লোক বটে, কাজে কাজেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধিত হইল!

৬। একজনদের ঘরে সিঁধ কাটিতেছে, তাহারা তাহা টের পাইল। বাটীতে সদ্য আগত দশ বৎসর বয়সের এক দৌহিত্র ব্যতীত পুরুষ আর কেহই নাই। স্ত্রীলোকেরা ভাবিল, গোলমাল করিলেই চোরেরা পলাইয়া যাইবে। তন্নিমিত্ত তাহারা চেঁচাচেঁচি সোরসার আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে চোরেরা দৃকপাতও করিল না—আপন মনে সিঁধ ফুটাইতে লাগিল! মেয়েরা ডাকিয়া বলিল "তোরা কেরা? ওরে কানাচে কেরা? রঁসতো পুরুষদের ডেকে দিই!" একথা কে যেন কাহাকে বলিতেছে, স্ত্রীলোকেরা ভয় পাইয়া যত চেঁচায়, চোরেরা আরো উৎসাহিত হইয়া স্বকার্য্যে তৎপর হইল—শীঘ্র শীঘ্র ইট খসাইতে লাগিল। তখন নিরুপায় দেখিয়া এক প্রাচীনা ঐ বালকটীকে সঙ্গে লইয়া বাটীর এক গোপনীয় পথ দিয়া নিকটস্থ মিশ্রদিগের বাটীতে গিয়া বিপদ সংবাদ দিলেন। তাঁহারা তিন ভাই লাঠি লইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বাটীর কর্ত্তা ও স্ত্রীলোকেরা এই বলিয়া নিষেধ করিলেন, যে, "আজ তোমরা তাহাদিগকে বাধা দিতে যাবে, কা'ল তোমাদের নিজের সর্ব্বনাশ করিবে, তখন কি হইবে?" ভ্রাতা ত্রয় অমনি ভয় পাইয়া একে একে শয়ন গৃহে খিল আঁটিয়া দিলেন—বুড়ী বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া শেষে এই মাত্র ভিক্ষা চাহিল, যে, একজন আমার সঙ্গে আমাদের রাইতদিগের বাটী পর্য্যন্ত আইস, তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাই। এ কথায় এক ভাই সঙ্গে গেলেন আক্রান্ত বাটীর কৈবর্ত্ত রাইয়তেরা শ্রবণ মাত্র ৭।৮ জন লগুড়াদি লইয়া মনিব বাড়ীর গুপ্ত দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। ঘরে গিয়া দেখে, সিঁধ ফুটাইয়াছে, আসিবার বড় অপেক্ষা নাই! ঐ ৭।৮ জন সেই ঘরের মধ্য হইতে গোলমাল আরম্ভ করিল, কিন্তু কানাচে গিয়া চোর ধরা দূরে থাকুক, তাড়াইয়া দিতেও তাহাদিগের সাহস হইল না! কেননা উহার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে ঐরূপ অসমসাহসিকতার ফলস্বরূপ পল্লীর জনকতক লোক বিলক্ষণ আহত হইয়াছে! সিঁধ মহানা হইতে চোরদিগের তরবারাদি অস্ত্র শস্ত্র ও আকৃতি প্রকৃতি অকুতোভয়তা দর্শনে বোধ হইল ইহারা সেই খেলোয়াড় দল বটে! তাহারা দলে পুষ্ট নয় বলিয়া সদর খিড়কীতে ঘাঁটি দিয়া ডাকাইতি করিতে পারে না; কিন্তু সিঁধ কাটিয়া একবার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার পর প্রায় ডাকাইতি করিয়া চলিয়া যায়। কৈবর্ত্তেরা এই কথা জানিত, সুতরাং গণনায় অধিক হইলেও সাহস করিয়া সম্মুখ সংগ্রাম করিতে বাহিরে যাইতে পারিল না। তাহাদিগের দুই জন দা কুড়াল হস্তে সিঁধ মহানার দুই দিগে দাঁড়াইল,

অবশিষ্ট সকলে ছাতে উঠিয়া ঢিল মারিতে লাগিল! চৌকীদার চৌকীদার বলিয়া বিস্তর ডাকিল, চৌকীদার যে কোথায় উবে গেল, তাহার ঠিকানা হইল না! ইট পাটকেল খাইয়া তস্করগণ বাঁশবাগানে প্রবেশপূর্ব্বক ছাতের উপর মানুষ লক্ষ্য করিয়া লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। লাভে হইতে জাতের লোক যে ঢিল মারে, তাহা বাঁশ ঝাড়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া লাগিয়া ব্যর্থ হয়; চোরেরা যাহা মারে, তাহাতে দুর্গরক্ষাকারীদের "উহু গেলেম গেলেম" শব্দ নিঃসারণ করাইতে সমর্থ হইল! এইরূপ প্রায় সমস্ত রাত্রি আক্রমণ ও রক্ষার ব্যাপারে কাটিয়া গেল! পরদিন থানায় রিপোর্ট পাঠানো হইল। দারোগা ছিলেন না; জমাদার বলিলেন "আমি এতালা করিলাম, তোমরা সিঁদ বুজায়ো না, যেমন আছে অমনি রাখ, কল্য হয় তিনি নয় আমি তদারকে যাইব।" প্রজারা বলিল "সিঁধ খোলা থাকিলে আজ যদি আবার তাহারা আক্রমণ করে, তার রক্ষার উপায় কি?" জমাদার সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তা আমি কি ক'র্ব্বো? রা'তে পার ভালই, না পার মালামাল কা'ল লিখিয়ে দেবে!"

সে গ্রাম হইতে থানা দূরে। গ্রামস্থ লোকে আশা ও ভরসা করিয়াছিল আজ্ দারোগা আইলে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইয়া বাঁচিব। সন্ধ্যার সময় যখন লোক আসিয়া কহিল "দারোগা থানায় নাই, জমাদার এইরূপ বলিলেন" তখন গ্রামে যেন কম্পজ্বরের আবির্ভাব হইল! রাত্রে সেই কৈবর্ত্তেরা আরো দুই চারিজন লোক লইয়া সিঁধ চৌকী দিতেছে, এমন সময় পূর্ব্ব রাত্রির ন্যায় আবার ঢিলাঢিলি হুড়ামুড়ি আরম্ভ হইল! প্রায় দুই ঘন্টা কাল এই ভয়ানক কাণ্ড চলিয়া সহসা চোরেরা পলায়ন করিল। তাহা দেখিয়া অনেকে অনেকরূপ সন্দেহ করিতেছে, এমন সময় কৈবর্ত্ত পাড়ায় স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদ শ্রুত হইল! মিশ্র মহাশয়েরা যাহা বলিয়াছিলেন তাই—কৈবর্ত্তেরা তাহাদিগের বাধা দিতেছে দেখিয়া কৈবর্ত্তদের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল—তাহাদের মেয়েরা টের পাইয়া ঐ আর্ত্তনাদ ছাড়িল! কৈবর্ত্তেরা ছুটিয়া বাড়ী গেল—অগ্নি থামাইতে ব্যস্ত হইল। এদিকে চোরেরা ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগের মনিব বাড়ীতে সন্ধি সংযোগে প্রবেশের চেষ্টা দেখিতে লাগিল; কেবল স্ত্রীলোকদিগের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব গুণে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না—স্ত্রীলোকেরা দা বঁটী প্রভৃতি হস্তে আত্মরক্ষা করিল এবং গ্রামস্থ লোক অত্যন্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে বাহির হইয়া চোরদিগকে তাড়াইয়া দিল। পরদিন জমাদার আসিয়া গ্রামস্থ নিরীহ লোকের উপর যৎপরোনাস্তি পীড়া দিয়া যথোচিত পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক হাস্যমুখে বিদায় হইলেন!

এমন উপাখ্যান কত বলিব? সকল বলিতে গেলে একখানি গ্রন্থ হয়। যাহা বলা হইল, ইহাতে পল্লীগ্রামের—অজ পাড়াগাঁর অবস্থা ও পূর্ব্ব পুলিসের মহিমা প্রচুররূপেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে! আধুনিক পুলিসের শাসনে দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা কোনো

কোনো অংশে ভাল কোনো কোনো অংশে মন্দ দশায় পতিত হইয়াছে—আমার জীবন লিখিতে লিখিতে হয় তো তাহা বাহির হইয়া পড়িবে! অদ্য এ-বিষয়ে এই পর্য্যন্ত!!!

ষষ্ঠ পট—তান্ত্রিক মাতাল

নিশ্চিন্তপুর হইতে এককোশান্তরে আর একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, আমরা তাহার নাম করিব না। তাহাতে কতকগুলি কায়স্থ ও অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তৎকালে তত্রত্য কোনো কায়স্থ কৃষ্ণনগর জিলার মীরমুন্সী কিম্বা সেরেস্তাদার ছিলেন। এত দিনের কথা, পদটীর নাম ঠিক মনে নাই। কিন্তু ইহা বিলক্ষণ স্মরণে আছে, যে, জিলার মধ্যে তাঁহাকে একজন প্রধান ধনী প্রধান কৃতী এবং প্রতাপশালী পুরুষ বলিয়া লোকে জানিত। শুনিতাম, তিনি নাকি কাছারি হইতে বাসায় আসিবার কালে প্রায় প্রত্যহই পালি মাপা টাকা আনিতেন! সুধু তাহাই নহে, যত জমী, যত নীলকর, বড় বড় চোর ডাকাইত সকলেই তাঁহার নামে কাঁপিত—মাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও এত ভয় করিত না! কেবল ভয়ও নয়, ভক্তি করিত—অনবরত পূজা দিত! ইহার পরবর্ত্তী পটে পাঠকগণ্ পাঠ করিতে পাইবেন, কিরূপে তাঁহার সুপারিস চিঠি পাইয়া অদ্বিতীয় দোর্দ্দণ্ড অত্যাচারী নীলকর সাহেবও জনৈক ভদ্র গৃহস্থের ভূমি, বলদ ও লাঙ্গল ছাড়িয়া দিয়াছিল! লোকে বলিত সে অঞ্চলে তাঁহার নামে "বাঘে গরুতে একত্র জল খাইত!" উল্লিখিত সুপারিস ব্যতীত তাঁহার আর একটী প্রমাণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি; যে; যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার বাটীতে—কি তাঁহার গ্রামে কাহারো বাটীতে একটিবারও ডাকাইতি হয় নাই; কিন্তু যেইমাত্র তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন, অমনি সেই অশৌচের মাস মধ্যেই তাঁহার নিজ পুরীতে দস্যু পতিত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব—এমন কি, গৃহ ভিত্তির মধ্যস্থ গুপ্ত ধন পর্য্যন্ত লইয়া গেল! সেই দস্যুরা আবার স্পষ্ট বলিল "আর কি অমুক আছে যে মেয়াদের ভয় রাখিব?" ফলতঃ তখনকার মাজিষ্ট্রেট আদালতে সুচতুর ও সুযোগ্য সেরেস্তাদারেরাই মাজিষ্ট্রেট ছিলেন—হাকিম সাহেব প্রায় কাষ্ঠপুত্তলের ন্যায় কাষ্ঠাসনে বসিয়া স্বাক্ষর করিতেন মাত্র। সুতরাং জমীদার, নীলকর ও তস্কর প্রভৃতি দুর্দ্দান্তগণ সেরেস্তাদারকে ধনে মানে বাড়াইবে আশ্চর্য্য কি? তাঁহার পূজা না করিলে আইনবহির্ভূত প্রজাপীড়নাদি কার্য্যে তাহাদিগের অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা কি? কেহ গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া, কেহ লাঠিয়ালের দ্বারা খুন পর্য্যন্ত করিয়া, কেহ নিরীহ প্রজাপুঞ্জের ভূম্যাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া, কেহ তাহাদিগের যথা-সর্ব্বস্ব লুঠিয়া কেহ কেহ বা লোকের ধন, প্রাণ, জাতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে বিনষ্ট করিয়াও ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত সমাজ মধ্যে অক্ষত অঙ্গে আস্ফালন ও স্পর্দ্ধার সহিত বেড়াইত—

রাজনিয়ম তাহাদিগকে স্পর্শও করিত না—সুশাসক ইংরাজ রাজত্বে এতদূর অরাজকত্ব নিরাতঙ্কে প্রবাহিত হইত, ইহার কারণ কি ? কারণ আর কিছুই না—প্রধান আমলাকে অত্যাচারীর উৎকোচে এবং হাকিমকে নীলকরের তোষামোদে অন্ধ করিয়া রাখিত ! সৌভাগ্যক্রমে অধুনা সে সব দুর্দ্দিনের (সম্পূর্ণ না হউক) আংশিক অবসান হইয়াছে ! ভরসা করি, রোগের শেষটুকু অচিরাৎ কাটিয়া যাইবে।

সে যাহা হউক, সেই প্রসিদ্ধ আমলা মহাশয় আমার মেসো মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। আমার মাতুলালয় হইতে তাঁহার বাটী অধিক দূরে নয়, কাজেই আমরা দুই ভাই মাসীমাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত মাঝে মাঝে—বিশেষতঃ ক্রিয়া কলাপের সময় যাইতাম। আমলা মহাশয় বিলক্ষণ ক্রিয়াবান ও দাতা ভোক্তা ছিলেন। তাঁহারা তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য—তন্ত্রানুসারেই তাঁহাদিগের কৌলিক আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হইত। কেবল তাঁহারা বলিয়া নয়, সেই গ্রামবাসী প্রায় সকলেই তন্মতাবলম্বী। সুতরাং গ্রামসুদ্ধ প্রায় তাবতেই তন্ত্রোক্ত মদ্যপায়ী ছিলেন। উঁরির মধ্যে কেহ কেহ নিত্য, আর সকলে পর্ব্বাহ বিশেষে "কারণ" করিতেন ! একথা আমরা কানাঘুসায় শুনিতাম—কদাপি বা দুই এক জনের মুখে গন্ধও পাইতাম। কিন্তু মদোন্মত্ততার বিশেষ লক্ষণ বড় দেখিতাম না।

এক বৎসর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন আমরা দুই ভাই মাসী-মার বাটীতে পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। লক্ষ্মী পূজার বড় ধূম—বিস্তর ছাগ, মেষ বলিদান এবং বলিদান হইবামাত্র টাট্‌কা মহাপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ রন্ধন করাইয়া গ্রামস্থ কায়স্থগণকে বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন করানো হইত। লজ্জা খাইয়া বলিতে কি, আমরাও সেই মহাপ্রসাদের লোভে দুই ভাই সাজিয়া গুজিয়া একটী পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য সঙ্গে গিয়াছিলাম !

সন্ধ্যার পর পূজা হইয়া গেল। পাক শাক প্রস্তুত। তেমহল বাটী—গোলাবাটী ও গোয়াল বাটী লইয়া গণনা করিলে পাঁচ মহল। সদর বাটীতে বৃহৎ বাঙ্গালা চণ্ডীমণ্ডপ ; তৎসম্মুখে মস্ত দাঁড়ঘরা বা আটচালা ; পার্শ্বে লম্বা চৌচালী—সে মহল অনাবৃত ; সম্মুখেই দীর্ঘ পুষ্করিণী। দ্বিতীয় অর্থাৎ অন্দর মহলে পাকা দোতালা—তৎকালে খুব বড় মানুষ ভিন্ন সে অঞ্চলে এরূপ পাকা-বাটী প্রায় দেখা যাইত নাই। তৃতীয় অর্থাৎ রসুই মহলে বৃহৎ এক কাঁচা রসুই ঘর এবং আশে পাশে কাষ্ঠাদি রাখিবার চালা ও ঢেঁকিশালা ইত্যাদি। এই মহলে রন্ধনশালার সম্মুখে যে উঠান, সেই উঠানে উক্ত পূর্ণিমা রজনীতে ভোজনের স্থান হইল। একে শরৎকাল, তায় পৌর্ণমাসী, দিব্য জ্যোৎস্না, ঠিক যেন দিন ! সুতরাং প্রদীপ পিলসুজ বা সর্ষপ পুটুলির তেকাটাদির প্রয়োজন হইল না ; "সরকারী" আলোতেই পাতপাতানি হইয়া গ্রামস্থ কায়স্থ মহাশয়েরা ভোজনে বসিয়া গেলেন। সর্ব্বসুদ্ধ ৭০।৮০ জন ভোক্তা, তখন গ্রাম কুড়াইয়া ইহার বেশী পুরুষ হইত না, এখন বোধ হয় জরে আরো

হ্রাস করিয়াছে। আমরাও দুই ভাই পংক্তিতে বসিলাম। সকলেই কারণ করিয়াছেন, আমরা দুজনে কেবল সোধা ছিলাম! নিরামিষ ঘণ্ট ও ডাল্‌াদি দুই তিন রকম দেওয়া হইয়াছে, এমন সময় দেখি, একজন তরুণ বয়স্ক ভোক্তা—যিনি পাকশালার হাতিনার পৈঠার নিকট ছিলেন—আস্তে আস্তে গুড়ি মারিয়া পৈঠা বহিয়া বহিয়া উঠিলেন; এবং সেই গুড়িমারাভাবে পাকশালার দ্বারে গিয়া বলিতেছেন "ও খুড়ি! তোর পায় পড়ি, একটু পাঁটা দেনা? এত পাঁটা, তবে ছাই ভস্ম কেন খাই?" বলিতে না বলিতে তাঁহার দেখা দেখি তাঁহার পার্শ্বস্থ অপর যুবা সেইরূপ গুঁড়িমারাভাবে সেই দ্বারে গিয়া পূর্ব্ব যুবার ন্যায় হাত পাতিয়া সেইরূপে পৈঠা বহিয়া সেইসব উক্তি করিলেন। নিমেষ মধ্যে তৎপার্শ্বস্থ আর একজন—তৎপরেই আর একজন—তারপর আর একজন অবিকল সেইরূপে গুঁড়িমারিয়া, সেই স্থলে গিয়া সেইরূপে পাঁঠা চাহিলেন! স্ত্রীলোকেরা আপনাদের ভাসুরপো, দেওর পো, ভাসুর, দেবর, ভ্রাতা প্রভৃতিকে চিনিতেন; তাঁহারা হাতা বেড়ী গুছাইয়া ভয় দেখাইয়া বলিলেন "দূর ড্যাক্‌রারা, যা, পাতে ব'সগেযা! যা, পোড়ার মুখোরা পাঁঠা পাঠাচ্ছি, সেখানে ব'সে খেগে যা—যা, যা, স'রে যা—হাঁড়িকুঁড়ি সব মারা যায় ঘরে যা, ইত্যাদি!"

সে কথা কে শুনে? একজন গিয়া পাঁঠার পাত্রের উপর পড়িল—তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী সকলেই! আবার উঠানের কাণ্ড শুনুন—প্রথম ব্যক্তি যেরূপ গুরিমারা ভাবে চুপি চুপি গিয়াছিল, সে শ্রেণীর সকলেই একে, একে তাহাই করিল। তাহার পর দ্বিতীয়; তাহার পর তৃতীয়; পরে চতুর্থ, ক্রমে তাবৎ পংক্তির তাবৎ ভোক্তাই সেই পাকশালায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কেহই দাঁড়াইয়া নয়—কেহই দৌড়িয়া নয়—কেহই আগের লোককে পিছু ফেলিয়া নয়—প্রত্যেকেই সেই প্রকারে গুড়ি মারিয়া—সেইরূপ চুপি চুপি—অর্থাৎ প্রত্যেকের মনের ভাব "কেহ যেন না দেখে চুপি চুপি গুড়ি গুড়ি যাইতে হইবে!" এইরূপে উঠান শূন্য হইল; কেবল আমরাই দুই ভাই ভ্যাবা গঙ্গারামের মত অবাক্ হইয়া বসিয়া আছি! প্রতি ভোক্তাই দ্বারে গিয়া একবার সেই প্রথম বক্তার মত "খুড়ী পাঁঠা দেনা গা?" বলিল! তাহার পর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক (কিন্তু গুড়ি মারিয়া) পাঁঠার পাত্র বোধে যে যাহা সম্মুখে পাইতেছে—কে জানে শুক্তা, কে জানে ডা'ল, কে জানে শেষড়া, কে জানে মাছের ঝোল, কে জানে পরমান্ন!—যে যাহা পাইতেছে, তাহাতেই পাঁঠা খাইতেছে! ভাগ্যক্রমে গৃহের আর একটা দ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া স্ত্রীলোকেরা বকিতে বকিতে—গালাগালি দিতে দিতে নির্গতা হইলেন!

এই দক্ষযজ্ঞের প্রারম্ভেই আমার মাসী-মাতা ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া একখান কাঁসিতে তাড়াতাড়ি একদিগে কতকগুলি অন্ন, একদিগে কতকটা পাঁঠা লইয়া উক্ত দ্বিতীয় দ্বার যোগে নিষ্ক্রান্তা হইয়া আমাদিগের দুই ভাইকে ডাকিলেন "আয়, আয়, তোরা চ'লে আয়, ওখানে আর থাকিস্‌নে।" আমরা ভয় পাইয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার

উপরের ঘরে গেলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আহার করিতে পারিলাম না—একে বুক ধড়ফড় করিতেছে, তাহাতে কৌতুক দেখিবারও কৌতুহল—বারাণ্ডায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইল—কাড়াকাড়ি হাতাহাতি হইতে হইতে বিলক্ষণ মারামারি হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল। তৎপরে পরস্পরের মস্তকে হাঁড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়া খিড়কি সদর দুই পুষ্করিণী পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ গড়াইয়া গেল। সকলেই জলে পড়িয়া হুড়াহুড়ি করিতে লাগিল—কিন্তু কেহই ডুবিয়া মরে নাই!

সেই যে পাড়াগেঁয়ে তান্ত্রিক মাতাল দেখিয়াছিলাম, এখন সহুরে মাতাল দেখিয়া মনে হয়, ইহারা তাহাদিগের কাছে পারে কিনা সন্দেহ! তবে এরূপ তান্ত্রিক মাতাল সর্ব্বত্র ছিল না—ক্বচিৎ কোনো স্থানে কোনো কোনো বংশে দেখা যাইত—গ্রাম সুদ্ধ এমন "কারণ" করা সহস্রে দুই এক গ্রামে ছিল! এখন বিলাতী মাতাল ঘরে ঘরে হইয়া উঠিয়াছে—হইতেই সর্ব্বনাশ!!

মনোমোহন বসু প্রসঙ্গে

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে সকল বাঙালী স্বদেশ ও স্বজাতির চিন্তায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, মনোমোহন বসু তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাংবাদিক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও মননশীল প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখনী বাঙালীকে আত্মস্থ ও জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত হতে সাহায্য করেছিল। হিন্দুমেলার বক্তৃতায়, নাটকে, গানে, প্রবন্ধে তিনি বাঙালীর সম্মুখে এক মহৎ ভাবাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতির অনুসৃত প্রাচীন রীতির কাব্যধারাকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মনোমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্য। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত গুপ্তকবির প্রত্যক্ষ প্রেরণাতেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে মনোমোহনের কথাও বলেছেন :

> …ঈশ্বরগুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন, বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।[১]

বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রমুখ গুপ্তকবির শিষ্যরা যেখানে তাঁদের রচনায় গুরুর রচনারীতি ও আদর্শকে অতিক্রম করেছেন, সেখানে মনোমোহনই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি এই আদর্শকে আমৃত্যু অনুসরণ করেছেন। এজন্য তাঁকে খাঁটি বাঙালী কবিও বলা যেতে পারে।

ছাত্রজীবনে সংবাদ প্রভাকরে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত; এর ছেদ ঘটে মৃত্যুর অনতিপূর্বে নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত 'সতীর অভিমান'[২] নামের পৌরাণিক নাটকে। এইটিই তাঁর শেষ রচনা। বাংলা সাহিত্যে তিনি দুই যুগের সাক্ষী। দীর্ঘ ছয় দশককালের অক্লান্ত সারস্বত সাধনার যথোচিত স্বীকৃতি তিনি সমকালে যৎকিঞ্চিৎ যদিবা পেয়েছিলেন, কিন্তু উত্তরকাল তাঁকে সেইটুকু দিতেও কুণ্ঠিত। অথচ যুগকালের পটভূমিতে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান উন্নাসিক অবহেলার যোগ্য নয়।

১. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত, পৃঃ ১৪।

২. 'সতীর অভিমান'—মনোমোহন বসু; নাট্যমন্দির, অগ্রহায়ণ ১৩১৭-শ্রাবণ ১৩১৮।

১

১২৩৮ বঙ্গাব্দের ৩০ আষাঢ় বুধবার (ইং ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ ১৪ জুলাই) যশোহর জেলার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর[১] গ্রামে মাতামহের গৃহে মনোমোহনের জন্ম হয়। পিতা দেবনারায়ণ বসু ছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার ছোট জাগুলিয়ার বিখ্যাত বসু পরিবারের সন্তান। ছোট জাগুলিয়া থেকে ষোল ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রাম। দেবনারায়ণ কলকাতা থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত কোম্পানির ডাকের ঠিকাদার ছিলেন। মনোমোহন তাঁর পিতা সম্পর্কে লিখেছেন :

> মাতামহ মহাশয়…কলিকাতা জেনারেল পোস্ট অফিসের খাজাঞ্চী এবং আমার পিতা মহাশয় কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত কোম্পানীর ডাকের ঠিকাদার ছিলেন। তাঁহা হইতেই ডাকের ঠিকাগ্রহণ প্রথার প্রথম সূত্রপাত হয়। সে ঠিকা একাংশে ইজারার মত একাংশে নয়। ডাকের মাসিক ব্যয় তাঁহার সহিত গবর্ণমেণ্টের চুক্তি থাকিত, সেই নির্দ্দিষ্ট টাকা মাসে মাসে তিনি পাইতেন ; যত ডাক মুন্সি, তত্বাবধায়ক, হরকরা ও বাদী প্রভৃতি লোকজন এবং অশ্ব শকটাদি সমস্তই তাঁহার দ্বারা মনোনীত নিযুক্ত বা অবসৃত হইতে পারিত। কিন্তু চিঠি ও পুলিন্দা প্রভৃতির যত মাশুল, তাহা সরকারী তহবিলে জমা দিতে হইত।
>
> তিনি আর কিছু কাল জীবিত থাকিলে এ দেশের সমস্ত রাজবর্ত্মই তাঁহার ঠিকা ভুক্ত হওনের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ কাল তাহা শুনিল না—অকালেই পিতাকে হরণ করিয়া লইল।[২]

---

১. সঠিক জন্মতারিখ ও জন্মস্থানের জন্য মনোমোহনের নিজের লেখা দ্রষ্টব্য। মনোমোহনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত অধিকাংশ রচনায় জন্মতারিখ ও স্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। যেমন,—

(ক) মনোমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রবোধচন্দ্র বসু 'কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী-তে) লিখেছেন—'সন ১২২৮ সালের আষাঢ় মাসে বুধবার, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলিয়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন।' —নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৫৬৯।

(খ) বাণীনাথ নন্দী 'কবি মনোমোহন' প্রবন্ধে জন্মস্থান 'ছোটজাগুলিয়া' গ্রামের কথা লিখেছেন —জন্মভূমি, বৈশাখ ১৩১৯, পৃ. ১৫-২১।

(গ) কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত 'মনোমোহন বসু' প্রবন্ধে একই কথা লিখেছেন। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯ ; পৃ. ৯৮-১০১।

(ঘ) সাহিত্য সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩১৮) মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে মনোমোহনের জন্মস্থান হিসাবে 'ছোটজাগুলিয়া'র উল্লেখ করা হয়েছে, পৃ. ৩১৭।

একমাত্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় সঠিক সংবাদ পরিবেশন করেছেন।

২. 'সমাজচিত্র অথবা কেঁড়েলের জীবন' মধ্যস্থ, ১২৮০ ; পৃ. ৪৭০-৭১।

দেবনারায়ণের চার পুত্রের মধ্যে মনোমোহন সর্বকনিষ্ঠ। পিতা-মাতার বর্তমানেই মনোমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভুবনমোহনের অকাল বিয়োগ ঘটে। মনোমোহনের যখন তিন বৎসর বয়স তখন তিনি পিতাকে হারালেন। জননী প্রসন্নময়ী স্বামীর মৃত্যুর পর তিনটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে উঠলেন বাপের বাড়িতে। স্বামীর যা-কিছু ছিল তাই দিয়ে ছেলেদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন পিত্রালয়ে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, প্রসন্নময়ী তাঁর জীবৎকালের মধ্যে হারালেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রকে। অবশ্য মনোমোহনের পিতার মৃত্যুর পর 'পিতৃব্য ছিলেন তিনিই পিতৃস্থানীয় হইলেন।'

শৈশবাবস্থা থেকেই মনোমোহনের অস্বাভাবিক মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে কালের 'হাতে খড়ি' হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ মাত্র সাড়ে তিন বৎসর বয়সেই তিনি 'বর্ণমালা' শেষ করেন। শুধু তাই নয় ঐ বয়সেই 'গুরুদক্ষিণা' 'প্রহ্লাদ চরিত্র,' 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী', 'লঙ্কাকাণ্ড' প্রভৃতি গ্রন্থ ও পুথি তাঁর কণ্ঠস্থ হয়। শিশুকণ্ঠে এই আবৃত্তি শুনতে গ্রামবাসী এমনকি পুরমহিলারাও মনোমোহনের সংগ কামনা করতেন।[১] পরবর্তী কালে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্র বসু লিখেছেন:

> গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে…সমবয়স্ক এবং নিজাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে পাঠশালায় পাঠ্য পড়াইয়া গুরু মহাশয়কে সাহায্য করিতেন। শুনিয়াছি সেই অল্পবয়সেই তিনি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার ফরমাইস মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনার দ্বারা তাঁহাদের মন হরণ করিতেন, গ্রামবাসীরা অর্ধ উলঙ্গ শিশুর মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া শিশুমুখনিঃসৃত অর্দ্ধোচ্চারিত রামায়ণ মহাভারত আবৃত্তি গাথা পরম আনন্দ ও ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিতেন।[২]

নিশ্চিন্তপুরে রাধামোহন তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে পাঠ সমাপ্ত করে মনোমোহন জননীর সঙ্গে ছোট জাগুলিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ছোট জাগুলিয়ার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে মনোমোহন কিছুদিন শিক্ষা লাভ করে বার বৎসর বয়সে কলকাতায় হেয়ার সাহেবের 'School Society's School'-এ ভর্তি হন। আশৈশব মনোমোহন ছিলেন অমায়িক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কাব্যিক মনের ও নির্দোষ স্বভাবের অধিকারী। ফলে কি আত্মীয় পরিজন, গ্রামবাসীর কাছে ও স্কুলে সহজেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর প্রশান্ত চেহারা এবিষয়ে অনেক সাহায্য করেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৩]

১. মনোমোহন বসু—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৭

২. কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী)—প্রবোধচন্দ্র বসু ; নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮, পৃ. ৫৬৯-৮০।

৩. মনোমোহন বসু—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৭

স্কুলের প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। হেয়ার সাহেবের স্কুলে তিনি সেকালের প্রসিদ্ধ শিক্ষক রিচার্ডসন ও স্বয়ং হেয়ার-এর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। School Society's School-এর পাঠ সমাপনান্তে মনোমোহন ভর্তি হলেন জেনারেল এসেমব্লিজে। সেখানেও সহপাঠীদের মধ্যমণি হয়ে উঠতে তাঁর খুব বেশি সময় লাগেনি। ক্লাসের বিরতির সময় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে তিনি সহপাঠীদের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁর রচনাশক্তির কথা শিক্ষকদেরও কর্ণগোচর হয়। ক্রমে তিনি জেনারেল এসেমব্লিজের প্রিন্সিপাল ডঃ ওগিল্‌ভি ও অধ্যাপক এন্ডারসনের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। জানা যায় প্রায়ই অধ্যাপক এন্ডারসন তাঁকে দিয়ে কাউপার ও মিলটনের কবিতার বঙ্গানুবাদ করিয়ে নিতেন। বাল্যকাল থেকেই মনোমোহনের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'ছাত্র জীবনের কর্তব্য' প্রবন্ধ লিখে তাঁকে এই আত্মপ্রত্যয়ের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ঘটনাটি সম্পর্কে জানা যায়ঃ

> উক্ত বিদ্যালয়ে এইরূপ ঘোষণা হইল যে, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রমণ্ডলী হইতে যে কোন ছাত্র কোন একটি ('ছাত্রজীবনের কর্তব্য') নির্বাচিত বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটী মূল্যবান স্বর্ণপদক ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। অপর একটী উচ্চ শ্রেণীর বালক সেই সর্বোচ্চ সম্মান লাভ করিবেন কর্তৃপক্ষমণ্ডলী হইতে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু তাহাতে বিদ্যালয় মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় পরীক্ষক মণ্ডলী যুবা মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পুনর্বিচারের ভার কাহার হস্তে দিলে সন্তোষলাভ কর?" উভয় পক্ষীয় প্রবন্ধ লেখক যুবকদ্বয়ের সহপাঠিগণ বিশেষরূপে ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিত-প্রবর রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিলেন।
>
> কিছুদিন পরে যুবক মনোমোহন একদিন বিদ্যালয়ের বারাণ্ডায় পদচারণা করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন যে "করিলাম কি যদি পরাস্ত হই তাহা হইলে এ স্কুলে আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব।" উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের প্রাণের গভীর আবেগ যেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার ওগিল্‌ভি (Dr. Ogilvie) বুঝিতে পারিয়াই ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করতঃ কহিলেন, "Well Mohun! here is the result. I see you stand first" (অর্থাৎ "মোহন! পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে তুমি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছ)।" চতুর্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।[1]

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহনের প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

১. কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী)—প্রবোধচন্দ্র বসু; নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮; পৃ ৫৬৯-৮০।

> মনোমোহন বাবু নামক যুবকের প্রবন্ধ অতিসুন্দর হইয়াছে, কারণ এই প্রবন্ধে বাজে অসার কথা নাই; সহজ বোধগম্য ও প্রচলিত শব্দবিন্যাসে আমি এই প্রবন্ধটিকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিলাম।[১]

টাউন হলে এক জনসভায় দেশের গণ্যমান্য সুধীবৃন্দের উপস্থিতিতে মনোমোহনকে 'সুবর্ণপদকে' পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কৃত বই-এর মধ্যে Walkar's Dictionary-র নাম উল্লেখযোগ্য।[২]

মনোমোহনের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পরবর্তীকালের বিখ্যাত সাহিত্যরথীদের প্রায় সকলেরই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রেরণাতেই সাহিত্য-জগতে প্রবেশাধিকার ঘটে। শিবনাথ শাস্ত্রী ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল সম্পর্কে লিখেছেন:

> …প্রভাকর বাহির হইলে, বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া এসকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ বিক্রয় হইয়া যায়। ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল দেখাদিল এবং বঙ্গ সাহিত্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট বড় পুরুষ স্ত্রীলোক যিনি কবিতা রচনা করেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের ছাঁচে ঢালিয়া থাকেন, তখন কবিতা রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাঁচে ঢালিতেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুকরণে শিষ্য প্রশিষ্য শাখা প্রশাখা সমন্বিত এক কবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই শিষ্যদলের মধ্যে সুধীরঞ্জন প্রণেতা দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন বসু পরবর্তী সময়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।[৩]

সংবাদ প্রভাকরে রচনা প্রকাশের পর মনোমোহনের খ্যাতি প্রসারিত হয়। ক্রমে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর অনেক কবিতা ও রচনা প্রকাশিত হয়। মনোমোহনের সাহিত্য প্রতিভাকে প্রথমে তাঁর খুল্লতাত চন্দ্রশেখর বসু আমল দেন নি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় মনোমোহনের রচনা প্রকাশিত হলে ক্রমে চতুর্দিকে তাঁর রচনা চাতুর্যের সুযশ ছড়িয়ে পড়লে খুল্লতাত সাহিত্য সাধনায় মনোমোহনকে উৎসাহিত করেন। যুবক মনোমোহনের ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র 'তাঁহাকে

১. কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী)—প্রবোধচন্দ্র বসু, নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮ ; পৃঃ ৫৬৯-৭০।

২. তদেব।

৩. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৯০৯ ; পৃ. ২০১।

প্রিয়শিষ্য রূপে আলিঙ্গন করিলেন।'[১] এই সময়ে মনোমোহনের জীবনে এক অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। সবেমাত্র তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিনিয়র ক্লাসে ঐ বিদ্যালয়েই ভর্তি হয়েছেন। যৌবনের চপলতার ফলে তাঁর জীবনের যাত্রাপথ কত সুগম হয়েছিল তা জানা যাবে নিম্নোদ্ধৃত অংশ থেকে ঃ

ইহার মধ্যে আর একটি অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় কবিবরের সাহিত্য-জগতে উন্নতির পথ আরও সুপরিস্কৃত হইল। তাঁহার আবাল্য সখা, সম্পর্কে শ্যালক পরে কলিকাতার প্রথিত নামা Ernsthushan Ogsterler-কোম্পানীর Book Keeper ৺ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সহিত বালকোচিত চপলতার বশবর্তী হইয়া ৺কাশীধামে যাত্রার সুযোগ উপস্থাপিত হইল। আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি ইণ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তখন কেবলমাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে, তাহার পর বরাবর গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। সেকালে তীর্থ ভ্রমণ করিতে হইলে লোকে বাটী হইতে উইল করিয়া যাত্রা করিত। তাঁহারা সে সমস্ত দুঃসহ কষ্ট সহ্য করতঃ ৺বারাণসী ধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে বাঙ্গালীটোলায় ৺গুপ্ত কবির তখন খুব পসার। ৺গুপ্ত কবিকে পাইয়া তথাকার বাঙ্গালীরা একেবারে একটী সঙ্গীত সংগ্রামের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু গুপ্ত কবির সহিত প্রতিযোগিতা সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে কেহই সাহসী হইলেন না। মনোমোহনকে পূর্ব্ব হইতেই গুপ্ত কবি প্রিয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সেই সংগ্রামের দুই একটি বিশিষ্ট পাণ্ডাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে-'আমার এক প্রিয় শিষ্য ৺ধামে সমুপস্থিত। তোমরা তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারিলে আমার কোন আপত্তি নাই।' মনোমোহন প্রথমেই এ প্রস্তাব শ্রবণে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় সখা ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের অকাট্য যুক্তি ও উৎসাহ-জনক প্ররোচনায় পরিশেষে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষেরই মহলা খুব জোরে বসিত লাগিল; আসর খুব জমকাল হইল; বিভিন্ন প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জন সঙ্ঘে সংগ্রাম ক্ষেত্রের শোভা আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। গান বাজনা তখনকার দিনে যত দূর সম্ভব সুচারু রূপে গঠিত হইল। পরিশেষে ভাগ্য বিপর্য্যয়ে গুপ্ত কবি দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় প্রিয় শিষ্যের হস্তে পরাস্ত স্বীকার করিলেন; কবি মনোমোহন তখন গলদঘর্ম্ম কপোলে ও রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই বিস্তীর্ণ সংগ্রাম ক্ষেত্রে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ৺গুপ্ত কবি আসরে বিনম্র যুবকের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক

---

১. কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী)—প্রবোধচন্দ্র বসু; নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮; পৃ. ৫৬৯-৮০।

আশীর্ব্বাদ করিলেন যে,—"আমার আশীর্ব্বাদে তুমি প্রতি সঙ্গীত সংগ্রাম ক্ষেত্রে বিজয়ী হও।"[১]

এই ঘটনার উল্লেখ মনোমোহনের ডায়েরিতে পাই। সেখানে অবশ্য গুরুর পরাজয়ের কথা লেখা নেই। তিনি লিখেছেন ঃ

৩৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন কাশীতে আসি, তখন ঐ সীতারাম বাবুর সহিত বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছিল। তৎকালে ভারত প্রসিদ্ধ কবিবর ও প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও কাশীতে ছিলেন। আমি তাঁহারই সাথে এক বাটীতে ও একান্নে বাসা করিয়াছিলাম। আমাদের বাসায় কাশীর সকল বড় বড় বাঙ্গালী বাবুই প্রায় সর্ব্বদা আসিতেন। যেহেতু ঈশ্বর বাবুর সহিত আলাপ পরিচয় ক্রীড়া কৌতুক করা সর্ব্বদা সকল শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বাঙালীর সুখের কাজ ছিল। ঈশ্বর বাবু যেমন কবি তেমনই সদালাপী, আমোদী, ক্রীড়াপ্রিয় ও সৌজন্যশালী ছিলেন। তিনি যখন যেখানেই যাইতেন বা থাকিতেন, তখন তথায় বিবিধ শ্রেণীর লোকের সমাগম এবং নানা আমোদ প্রমোদ হাস্য কৌতুক তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। কাশীতে ৭।৮ মাসেরও অধিক প্রবাস (আমার প্রায় ছয় মাস, তাঁহার আসার ২।৩ মাস পরে আমার আসা হইয়াছিল) করাতে তাঁহারই বাসভবন কাশীর মধ্যে প্রধান আমোদের স্থল হইয়াছিল। দিবাভাগে তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি ক্রীড়ায় অসম্ভব আমোদ, নানা বিষয়ক কথোপকথন, কবিতায় তরঙ্গ, রঙ্গ রসের স্রোত, সকলই প্রায় ছিল। এজন্য শুধু দেখাশুনার উদ্দেশ্যেও যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে বাবু সীতানাথ পালধি মহাশয় একজন প্রধান। পালধি মহাশয় বড় ভালো লোক, বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি বলে বাঙ্গালীটোলায় প্রসিদ্ধ। সেই বৎসর ৺শারদীয়া মহাপূজা উপলক্ষে কাশীতে সখের দুইটি কবির দল হয়। একদলের নাম কাশীবাসী দল, অন্যদলের নাম মথুরাচ্ছত্রের দল। পালধি মহাশয় এবং শীতলপ্রসাদ গুপ্ত শেষোক্ত দলের প্রধান উদ্যোক্তা কর্ত্তা ছিলেন। কাশীবাসীর দলে ঈশ্বরবাবু গান বাঁধেন এবং মথুরাচ্ছত্রের দলে আমি গান বাঁধি। সেই সূত্রে পালধি মহাশয়ের সহিত তখন আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।[২]

মনোমোহন ডায়েরিতে এই ঘটনার কথা লিখেছেন, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ তারিখে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের ৩৮ বৎসর পূর্বে দুর্গা পূজার সময় যদি ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে কাশীতে দেখা হয় তাহলে হিসাবে দেখা যায় তখন ১৮৪৯-৫০ সাল। ঈশ্বর গুপ্ত এসময়

১. কবিবর মনোমোহন বসু (সংক্ষিপ্ত জীবনী)—প্রবোধচন্দ্র বসু, নাট্যমন্দির ; মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮ ; পৃ. ৫৬৯-৮০।
২. বর্তমান গ্রন্থের ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১৮৪৯-৫০) উত্তর ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ভ্রমণশেষে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে ২১ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে সংবাদ প্রভাকরে লিখলেন:

> এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিমে প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম; সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী৺বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করণান্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি।[১]

এছাড়া মনোমোহনের মৃত্যুর পর হিতবাদী পত্রিকায় উক্ত সংগীত-সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়:

> শুনিতে পাই; একবার কাশীধামে হাফ আখড়াইয়ের আসরে গুরু শিষ্যে দ্বন্দ্ব হইয়াছিল। মনোমোহন নিজ গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত গীতিরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কাশীর হাফ আখড়াইয়ে 'শিষ্যাবিদ্যাই গরীয়সী' হইয়াছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহনের গুণপণায় এরূপ প্রীতি ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, সেই সঙ্গীত ক্ষেত্রে স্বয়ং হার মানিয়া শিষ্যের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন।[২]

ভবতোষ দত্ত 'কবি সংগীত রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের কতখানি উৎসাহ ছিল' একথার সমর্থনে কাশীধামে ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে মনোমোহনের কবির লড়াইয়ের উল্লেখ করেছেন।[৩] কাশী ভ্রমণের পর মনোমোহন কলকাতায় ফিরে পুরোপুরি সাহিত্য-সাধনায় নিমগ্ন হলেন। মনে হয় এ কারণেই তাঁর পড়াশুনায় ছেদ পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ প্রেরণা মনোমোহনকে দাঁড়াকবি ও হাফ আখড়াই সংগীত রচনায় উৎসাহিত করে, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'কার লিখেছেন:

> ঈশ্বর গুপ্ত যখন দাঁড়াকবির দলে বাঁধনদার হলেন, মনোমোহন বসু ও ঈশ্বর গুপ্তকে গুরুপদে বরণ করে দাঁড়াকবি ও হাফ আখড়াই সংগীতসংগ্রামে যোগ দিলেন, তখন মোহনচাঁদ বসু বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে ঈশ্বর গুপ্ত হাফ আখড়াইয়ের গান লিখেছেন এবং বৃদ্ধ অশক্ত মোহনচাঁদ সুর দিয়েছেন। মোহনচাঁদের মৃত্যু হলে মনোমোহন বসু হাফ আখড়াই গানের রচনাকার ও গায়ক হিসেবে বেশ কিছুদিন কলকাতায় জনপ্রিয়তা রক্ষা করেছিলেন।[৪]

বস্তুতঃ বাল্যকাল থেকেই মনোমোহনের উপস্থিত সঙ্গীত রচনার অসাধারণ শক্তি ছিল। বাল্যে তিনি মুখে মুখে কবিতা ও গান রচনা করে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তীকালে মনোমোহনের অসামান্য কবিত্বশক্তির স্ফুরণ

---

১. ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত; পৃ. ১৪২।
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা: মনোমোহন বসু—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ২৯।
৩. ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত -সম্পাদিত. পৃ. ১৪২।
৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত: ৪র্থ খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ২৬১।

ঘটতে দেখা যায়। স্বয়ং গুপ্ত কবি মনোমোহনের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন বিভিন্ন সংগীত-সংগ্রামে, শুধু তাই নয় দাঁড়াকবি, হাফ আখড়াই ও পাঁচালির ক্ষেত্রে তাঁর নব্য চিন্তা সেকালের কবির দলে আলোড়ন জাগিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> ঊনবিংশ শতাব্দীতে—যখন বাঙালীর মানসিকতা ও সাধনায় উৎকট বিপ্লব সূচিত হয়েছিল, তখনও ঐ ধরনের গীতি সাহিত্যে ফেনোচ্ছ্বাস বাঙালীমনের একাংশকে আবিষ্ট করেছিল। আধুনিক প্রগতিশীল ভাব ও স্বদেশপ্রেমের অন্যতম উদ্গাতা মনোমোহন বসুও হাফ আখড়াই সংগীতের একজন উৎসাহী 'মল্ল' ছিলেন, কৌতুকের সঙ্গে তাও লক্ষণীয়।[১]

মনোমোহন হাফ আখড়াই গানের শেষ পর্বে প্রতিনিধিত্ব করেছেন একাই। ঈশ্বর গুপ্তের সাহায্য ও সহযোগিতায় মনোমোহন কবিগানে বিশেষ করে হাফ আখড়াই, দাঁড়াকবি, সংগ্রামে নিজেকে যশের উচ্চশিখরে আসীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মনোমোহনের জনপ্রিয়তার কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। একবার পাথুরিয়া ঘাটার বাবু যদুনাথ মল্লিকের বাড়িতে তাঁর রচিত সখীসংবাদ শুনে হাফ আখড়াইয়ের প্রকাশ্য সভাস্থলেই বড় বাজারের কবি ভোলানাথ মল্লিকের দু' চোখ অশ্রুসংবরণ করতে পারে নি। মনোমোহনের উত্তরী কবিগান শুনে পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রকাশ্য সভাস্থলেই মনোমোহনকে আলিঙ্গন করেন।[২] মনোমোহন যাত্রা, কবিগান, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, বাউল প্রভৃতি সর্বপ্রকার গান রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর রচনা বিশুদ্ধ দেশী ভাবমূলক, দেশী সুরে রচিত, সাহেবিয়ানা বর্জিত।[৩] জাতীয় ভাবোদ্দীপক বাংলা কবিতা রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী আসন একমাত্র মনোমোহনই দাবি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, কবিগানের ধারাবাহিকতা রক্ষায় ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর শিষ্য মনোমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা জিইয়ে রেখেছিলেন। বস্তুত ঈশ্বর গুপ্তের কবিগানের ইতিহাস পুনরুদ্ধারের বাকী কাজটুকু মনোমোহন সম্পূর্ণ করেছিলেন। মনোমোহন যে হাফ আখড়াইয়ের প্রকৃত উত্তরসাধক, নিম্নোদ্ধৃত রচনা থেকে তা জানা যাবে ঃ

> কলিকাতাস্থ হোগল কুঁড়িয়া পল্লীতে ৺শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়ের ভবনে সন ১২৭৪ সালের শ্রীশ্রীপঞ্চমী পূজার রজনীতে হাফ্ আখড়াই সঙ্গীত সংগ্রাম হয়। এক পক্ষে কাঁসারী পাড়ার ও অপর পক্ষে শ্যামপুকুরের সৌখিন দল। মনোমোহন বাবু প্রথমোক্ত দলের জন্য নিম্নলিখিত গান কয়টী রচনা করিয়াছিলেন।

---

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ৪র্থ খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ৩৩।
২. মনোমোহন গীতাবলী (প্রকাশকের বিজ্ঞাপন)—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ; পৃ. /০।
৩. তদেব।

এস্থলে বলা উচিত, উক্ত সংগ্রামে কাঁসারী পাড়ার সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ জয় হইয়াছিল—যেমন গান তেমনি গাহনা, উভয়ই চমৎকার।

হাফ আখড়াই সংগ্রামে এমন সুন্দর গাহনা ইদানীন্তন আর কুত্রাপি হয় নাই।[১]

ঐ আসরে ইলারাজার স্ত্রীর উক্তিতে নিম্নলিখিত খেঁউড় হইয়াছিল।

১ম খেঁউড়।

মহড়া

ওহে মহারাজ, কাঁচুলিতে আঁটা কেন বুক্ ?
একি দেখি অসম্ভব, গর্ভের লক্ষণ তব,
কৈতে লাজ্-একি কাজ্, হ'লো হে !
ছি ছি কি ব'লে আর দেখাও কালামুখ্ ?[২]

অথবা,

উক্ত গানের উত্তরে শ্যামপুকুরের সৌখিন দল যে অশ্লীল উত্তর দেন তদুত্তরে মনোমোহন নিম্নলিখিত গান রচনা করেন ঃ

কি হবে উপায়—ছেলে হ'লে বাবা ব'লবে কায় ?
পুরুষ হ'য়ে নারী হ'লে, দুদিগের ভাব্ জেনে নিলে !
সরমে মরমে, মরি হায় !
দিলে কুলে কালী ছি ছি ধিক্ তোমায় ![৩]

তৃতীয় খেঁউড় গাইবার সময় হয়নি কিন্তু গান বাঁধা ছিল। মহড়াটি এস্থলে প্রণিধানযোগ্য ঃ

বাঁচালে আমায়্—আমার্ হ'য়ে পোয়াতি হ'লে !
আঁতুড়্ ঘরে থা'কবে তুমি, তাপ দিব নাথ্ আপনি আমি—
ভাব্না কি ; ঠাকুরঝি হবে ধাই !
ভেলা বংশ রা'খ্‌লে ইন্দু-রাজকুলে ![৪]

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে 'মনোমোহন গীতাবলী' প্রকাশিত হয়। এই গীতাবলী থেকে জানা যাবে যে মনোমোহন সর্বপ্রকার গান রচনাতে পারদর্শী ছিলেন। এই বইয়ে মনোমোহন 'হাফ আখড়াই-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' লিখেছেন। হাফ আখড়াই-এর সৃষ্টিকর্তা মোহনচাঁদ বসু ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে বিবরণ সংগ্রহ করে তিনি 'হাফ-আখড়াই-

১. মনোমোহন গীতাবলী ; পৃ. ৫।
২. ঐ পৃ. ৯।
৩. ঐ পৃ. ১০।
৪. ঐ পৃ. ১১।

এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' রচনা করেন। এই বইয়ের প্রকাশকের নিবেদনে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> হাফ আখড়ায়ের জন্মের পর "কবি"র নামটী যে "দাঁড়াকবি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে। কেন না হাফ-আখড়াইও একপ্রকার কবি, কিন্তু বসা। কাজেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ পূর্ব্বকার কবি 'দাঁড়াকবি' হইল।'[১]

হাফ আখড়াই, দাঁড়াকবি, পাঁচালি, আগমনী, বৈষ্ণব ও বাউল, তন্ত্রের গান, গীতাভিনয় সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং টপ্পা প্রভৃতি গানে মনোমোহন আসর মাৎ করতেন। ১২৭৮ সালের কার্তিক পূজার রাত্রে কলকাতার ঠনঠনিয়ার তারিণীচরণ বসুর বাড়িতে একবার 'পাণিহাটির দল' ও 'গোবাগানের' দলের মধ্যে দাঁড়াকবি গানের তুমুল সংগ্রাম হয়। মনোমোহন 'গোবাগানের' দলের জন্য উত্তর বাঁধেন। এই সঙ্গীত-সংগ্রামে মনোমোহন কিভাবে আসর মাৎ করেছিলেন মনোমোহনের গীতাবলীতে সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে ঃ

> দেশপূজ্য স্বর্গীয় ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই সংগ্রাম-সভায় উপস্থিত ছিলেন। মধ্যস্থতার ভার তাঁহার প্রতিই অর্পিত হয়। গোবাগানের সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক খেঁউড় গান খুব উচ্চ ও স্পষ্টরূপে গাওয়া হইবার পরেই বাচস্পতি মহাশয় "বাঁধনদার কে? বাঁধনদার কে? গীত-রচয়িতাকে চাই" বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মনোমোহনবাবু বৈঠকখানা গৃহমধ্যে ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে কয়েকজন ভদ্রলোক মনোমোহনবাবুকে জিদ করিয়া সভামধ্যে লইয়া গেলেন। বাচস্পতি মহাশয় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই কবির আসরে যে খেঁউড় শুনিলাম, তাহা উত্তর-দাতার গুণে খেঁউড় নয়, যেন মহাভারত শুনিলাম। আমি নিশান ফিশান বুঝি না, আমার আন্তরিক তৃপ্তি ও আনন্দের নিদর্শনস্বরূপ এমন সুন্দর-গান-প্রণেতার সহিত এই প্রেমালিঙ্গন করিতেছি।" এই বলিয়া পরম প্রীতি সহকারে মনোমোহনবাবুর সহিত কোলাকুলি করিলেন।[২]

এই সঙ্গীত-সংগ্রামে (সখীসংবাদ) অপর দল যে অশ্লীল, কটূক্তি করেন তার উত্তরে মনোমোহনের রচনার একাংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য। কারণ অশ্লীলতার উত্তর যে কত সুন্দর এবং রুচিশীল হতে পারে তার প্রমাণ হিসাবেও এটি প্রণিধানযোগ্য। মনোমোহনের কৃতিত্ব এইখানে, তিনি সেকালের অশ্লীল কবিগানকে আধুনিক গীতি-কবিতার ধাঁচে রূপ দিয়ে কবিগানের মধ্যে সুরুচির সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

১. মনোমোহন গীতাবলী, পৃ. ৭৫।
২. ঐ পৃ. ৵০।

দ্বিতীয় খেঁউড়ের উত্তর।

মহড়া।

বুঝলেম্ তোর্ ইতর্ স্বভাব্ যাবে না ম'লে !
সতী-নিন্দা-পাপের ফলে, শাস্তি পাবি ম'র্বি' জ্বলে, চিরকাল্,
ও তুই কুলাঙ্গারী রাজকুলে !
কুলগ্নে হায়্, তোরে আমায়্, বিধি ঘটা'লে !
ও তুই যেমন্ নারী জেনেছি, বুঝেছি ; পেয়েছি, ঔষধ্ তার—
ঝাঁটা মেরে, তোর্ বাপের্ ঘরে, কর্ব্বো গঙ্গা পার্ !
নারী অত্যজ্য, কিন্তু ত্যজ্য হ'লি আ'জ্ ! তোরে
আন্‌বো না আর্ এ কুলে !

চিতেন।

ওলো, এমন্ ক'রে বুঝিয়ে ব'ল্লেম্, তবু হ'লো না !
ললনা ! তোর ছলনা সব্, তবু গেল না !
হ'য়ে কুলবালা, অবলা, কি জ্বালা, প্রবলা হইলি !
এত ছলা, আর্ এত কলা, কোথা শিখিলি ?
হয়ে কুলের বৌ, কুলের্ কুচ্ছ কেউ করে না !
নারী না হ'লে দিতাম্ শূলে ?[১]

কিভাবে হাফ-আখড়াই ও দাঁড়াকবির সঙ্গীত-সংগ্রামে প্রশ্নোত্তর করা হত তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১২৯১ সালে ১৮ কার্তিক ৺জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বাগবাজারের ৺রামানন্দলাল বসুর বাড়িতে যে হাফ-আখড়াই সঙ্গীত-সংগ্রাম হয়েছিল সেখানে বাগবাজারের দলের পক্ষে মনোমোহন বসু উত্তর লিখেছিলেন। প্রথমে ভবানীপুরের দলের প্রশ্নগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হল ঃ

রাধে চন্দ্রমুখি তোল চন্দ্রবদন।
দুর্জ্জয় মান, সমাধান কর, মানময়ি রাই প্যারি—
তব মান-দাবানলে মলেম জ্বলে, কর বাক্যজালে—
শীতল তাপিত মন।
ওগো রাই রাই রাই গো (৩)
মান ত্যাজ ও মানময়ী রাই গো ॥
ওগো রাই রাই গো।
হও হে কৃষ্ণপক্ষের সদয়া এখন।

১. মনোমোহন গীতাবলী ; পৃ. ৭৪-৭৫।

সাধিলাম তব সাধে বাদো রাই রাই গো ভক্তেরো কারণ
তাতে লাঞ্ছনা; নিষেধ কতই করিলেন রাই তোমার সখীগণ।
যা হোক অপরাধ আর লইও না নিশ্চিত আমি
নিন্দিত কর দোষ মার্জনা।
ভেবে পদাশ্রিত জন, ক্ষমিতে এখন; রাধে বঞ্চনা করো না।
স্মরগরল খণ্ডণং মম শিরসি মণ্ডনং শ্রীমতী দেহি
পদপল্লব মুদারং আমারো দুর্লভ ধনো॥"
ওপদ কমলো পরশে খণ্ডিবে মদনো গরল।
হও হে কৃষ্ণপক্ষের সদয়া এখন।"

এই প্রশ্নের উত্তরে মনোমোহন যে গান রচনা করেছিলেন নিম্নে তা উদ্ধৃত হল।

তবে আমি কি ভক্ত নই বঁধু তোমার,
বাঁকা শ্যাম, শুন গুণধাম, এ কেমন ভাব তোমার।
ভাবলে না কি গতি হবে রাধার,
নিতান্ত হরি কিশোরি তোমারি॥
শ্রীরাধা বলিয়ে বংশীরব হয়েছে যেদিন—
বাঁকা শ্যাম হে শ্যাম হে।
সেই হতে বিক্রীতা রাধা তব রাঙ্গা পদে
নিতান্ত প্রেমাধীন॥
রাধার কে আছে বঁধু তোমা বিনে ;
প্রাণ মন, জীবনো যৌবন সমর্পণ চরণে,
বাঁকা শ্যাম, শ্যাম হে কভু জানিনে ত্রিভুবনে
অন্যজনে।
গুণোমণি জেনো সার, মম মান অপমান ;
সকলি তব স্থান,
তুমি না রাখিলে মান, কে রাখিবে আর।
মান বিনে কি আছে অবলার।[১]

মনোমোহন গীতাবলীতে আমরা পাই শুধু মনোমোহনের রচনা কিন্তু প্রতি পক্ষের রচনার হদিস পাওয়া ভার, উদ্ধৃত প্রশ্নটি মনোমোহনের ঘনিষ্ঠ পরিচিত বাণীনাথ নন্দীর প্রবন্ধ থেকে পাওয়া গেছে।

১. কবি মনোমোহন বসু—বাণীনাথ নন্দী ; জন্মভূমি ; ২০শ বর্ষ ১ম সংখ্যা।

পাঁচালির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও পাওয়া যাবে 'মনোমোহন গীতাবলীতে।' পাঁচালি সম্পর্কে মনোমোহন লিখেছেন :

এখন যেমন নাটক ও গীতাভিনয়ের ছড়াছড়ি, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বেই এই রঙ্গ ভরা বঙ্গদেশে তেমনি পাঁচালির অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছিল। এমন কি প্রায় প্রত্যেক ভদ্র-পল্লীতে অতিক্ষুদ্র গ্রামেও—আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, বারোয়ারি ও পাঁচালির দল পাওয়া যাইতই যাইত।

নব্য সম্প্রদায়ের গোচরার্থ "পাঁচালি" বস্তুটা কি, একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। যদিও হাফ আখড়াই ও দাঁড়াকবির ন্যায় পাঁচালিতেও দুই দলে সঙ্গীত-সংগ্রাম হইত, কিন্তু উঁহাদের ন্যায় ইহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন একদল পূর্বপক্ষ রূপে আসরী গান গাইলে অপর দল উত্তর পক্ষ রূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন, পাঁচালিতে তৎপরিবর্তে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হইত—যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলের ভাগেই জয়শ্রী দীপ্তিমতী হইয়া নিশান লাভ ঘটিত!

পাঁচালির প্রণালী এইরূপ,—হাফ আখড়াইয়ের ন্যায় তানপুরা বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি ইহার বাদ্য-যন্ত্র ইদানিং ঐকতান বাদ্যের ফ্লুটাদি উপকরণও তৎসঙ্গে থাকিত। হাফ আখড়াইয়ের ন্যায় বাদ্যেরও লড়াই হইত—সে বাদ্যের নাম 'সাজ বাজানো'। সাজ বাজনার পর 'ঠাকুরুণ বিষয়' বা 'শ্যামাবিষয়। প্রথমেই শ্যামা-বিষয়ক একটী গান সকলে মিলিয়া গাইবার পর কাটনদার উক্ত বিষয়ের ছড়া কাটাইতেন—অর্থাৎ ঐ কার্যের উপযুক্ত কোনো এক ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত, কখনো বা সহজ গলায় কখনো বা এক প্রকার সুরের সাহায্যে—কখনো বা পদ্যে, কখনো বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চ স্বরে ছড়া বিন্যাস করিতেন—কাটাইতে জানিলে তাহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের রোমাঞ্চ হইত। ফলতঃ সুকবি রচনা ও সু-কাটানদার কর্তৃক যোজনা হইলে নানা রস উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ছড়া কাটানো হইলে সকলে মিলিয়া আবার গান। কোনো কোনো দলে এই গান এমন মিলশুদ্ধ ও তান-লয়-বিশুদ্ধভাবে গাওয়া হইত যে, শ্রোতাগণ মোহিত হইয়া অজ্ঞাতসারে আহা আহা না বলিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই গোঁড়া-দল যোগ্যাযোগ্য সকল অবস্থাতেই বাহবার চীৎকারে আসর ফাটাইয়া দিত, তাহাতে কখনো বা জ্বলাতন করিত, কখনো বা হাসাইত![১]

কবিগানের আদিপুরুষ গোঁজলা গুঁই কি না এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও অদ্যাবধি প্রমাণিত গোঁজলা গুঁইকে আদি কবি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গুপ্ত কবি গোঁজলা গুঁই সম্পর্কে লিখেছেন :

---

১. মনোমোহন গীতাবলী ; পৃ. ১৬১-৬২।

'১৪০ বা ১৫০ বর্ষগত হইল 'গোঁজলা গুঁই' নামক এক ব্যক্তি পেসাদারি দল করিয়া ধনীদিগের গৃহে গাহনা করিতেন, ঐ ব্যক্তির সহিত কাহার প্রতিযোগিতা হইত তাহা জ্ঞাত হইতে পারি নাই ; তৎকালে 'টিকেরার' বাদ্যে সংগত হইত। লালু-নন্দলাল, রঘু ও রামজী—এই তিনজন কবিওয়ালা উক্ত গোঁজলা গুঁই প্রভৃতির সঙ্গীত শিষ্য ছিলেন।[১]

সুতরাং গোঁজলা গুঁই-এর পর থেকে কবিগানের সূত্রপাত। ডঃ সুশীলকুমার দে কবিগানের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

'The existence of kabi-songs may be traced to the beginning of the 18th Century of even beyond it to the 17th, but the most flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830.[২]

রাসু, নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, রঘুনাথ দাস, রামজী দাস, কেষ্টা মুচি, নিমে শুঁড়ি, প্রমুখ খ্যাতনামা কবিওয়ালাদের ১৮৩০ বা তার কাছাকাছি সময়ে মৃত্যু হয়। মূলতঃ ১৮৩০-এর পর থেকেই কবিগানের ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে শুরু হয়। ডঃ সুশীলকুমার দে লিখেছেন ঃ

After these greater Kabiwalas, came their followers who maintained the tradition of kabi-poetry up to the fiftees or beyond it. The kabi-poetry, therefore, covers roughly the long stretch a century from 1760 to 1860, although after 1830 all the greater Kabiwalas one by one had passed away a kabi-poetry had rapidly declined in the hands of their less gifted followers.[৩]

কবিগানের আবির্ভাব ও প্রয়োজন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

'বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল,

১. 'সংবাদ প্রভাকর, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১।
২. Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De, P. 302.
৩. Bengali Literature in the 19th Century—S. K. De, P. 302.

তৎপূর্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।[১]

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী লিখেছেন:

সাহিত্যের ক্রমবিকাশের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কার্য কারণ সম্পর্ক ব্যতীত ফলশ্রুতি কোন ক্ষেত্রেই আকস্মিক হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিগানও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কবিগানের যুগগত ভিত্তিভূমিতেই ইহার উদ্ভব কিভাবে হইয়াছিল তাহা আমাদের অজানা নয়। পঙ্গপালের মত ইহারা আসে নাই বা মধ্যাহ্ন আকাশকে অন্ধকারে ঘনীভূত করিবার পূর্বেও ইহারা অদৃশ্য হইয়া যায় নাই—তাহার প্রমাণ বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। কবিওয়ালাদের নিকট হইতেই আধুনিক বাংলা কাব্য অন্তর্মুখী ভাব-চেতনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। ঊনিশ-শতকের অন্যতম যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদনের কাব্যেও কবিওয়ালাদের প্রভাব স্থায়িভাবে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।[২]

দীনেশচন্দ্র সেন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সমর্থন করেননি। দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে কবিগানের ভাব, ভাষা এবং প্রকৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যের উৎসমুখ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

১৮৫০ সালের পর থেকে ইউরোপীয় ভাবধারা এদেশীয় বাবু-সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার শুরু করে, ফলে প্রাচীন সংস্কৃতির ভাবধারার অস্তিত্ব রক্ষাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি বাংলার এই প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসতে থাকে এবং মনোমোহনের জীবদ্দশার মধ্যেই এগুলির সমাপ্তি ঘটে। এ সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উদ্ধারযোগ্য:

…দাশু রায়ের পাঁচালীর ধরনের সস্তা অনুপ্রাসের ছেলেখেলা এতেই বোঝা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নব সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কবিগান ধীরে ধীরে হঠে যাচ্ছিল। তখন বাধ্য হয়ে এরা বাইরের দিক থেকে শব্দের খোঁচা মেরে শ্রোতার কর্ণপটহে চাঞ্চল্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে কলকাতা ও শহরতলী থেকে আখড়াই, হাফ-আখড়াই কবির লহর-তর্জা-পাঁচালী নবযুগের বন্যাপ্রবাহে স্থানচ্যুত হয়ে পড়ল এবং সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে অগ্রসর হল আধুনিককালের মহাকাব্য গীতিকাব্য কথাসাহিত্য, পাশ্চাত্য রীতির নাটক প্রবন্ধ-নিবন্ধ সাময়িকপত্র, সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন। মধ্যযুগের সংস্কারের শেষচিহ্ন কবিগান ইত্যাদি অনুষ্ঠান কলকাতা থেকে ক্রমেই

---

১. লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৫২ ; পৃ. ৭৫।
২. ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলাসাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী ; পৃ. ১৬।

অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু একেবারে নিশ্চিহ্ন হল না। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামান্তরে কবিগান ও নতুন আশ্রয় পেয়ে গেল। কিন্তু আকার-প্রকার বদল হলেও গ্রামের কবিগান আধুনিক কালেও অনেকদিন গ্রাম্যমনে প্রভাব বিস্তার করেছে।[১]

রাম বসু, হরুঠাকুর, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, গোরক্ষনাথ যোগী, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, রামরূপ ঠাকুর, উদয়চাঁদ, প্রমুখ কবিওয়ালাদের প্রকৃত উত্তরসাধক মনোমোহন। কবি-গানের চর্চা এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও ছিল, তাঁর জন্যই তিনি ছিলেন এই প্রাচীন সংস্কৃতির শেষ সলতে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সাঙ্গে কবি-যুগেরও অবসান ঘটে। মনোমোহন ছিলেন স্বভাব-কবি, সর্বোপরি গীতরসিক, হাফ আখড়াই ও দাঁড়াকবির উত্তরসাধক সৌখিন পাঁচালিকার। কবি-গান ও পাঁচালিকে নব্য-গীতরূপে প্রতিষ্ঠা করতে অনেকাংশে হয় তো এর ভাবমূল্যের ক্ষতি হয়েছে ; লাভ হয়েছে যাত্রা ও গীতাভিনয়ে এই গানের নব্য প্রবেশ ঘটিয়ে। অর্থাৎ নাটকে গান রচনা করে মনোমোহন কবিগান ও পাঁচালির সার্থক সদ্ব্যবহার করেছেন। ক্রমে থিয়েটার জয়প্রিয়তা লাভ করেছে ; তার ফলে আস্তে আস্তে পাঁচালি ও কবিগানের জনপ্রিয়তাও হ্রাস পেয়েছে।

৩

ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' মনোমোহনের সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত। ক্রমে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ -সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ', অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর রচনা উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করলে তিনি নিজেই সম্ভবতঃ সাময়িকপত্র সম্পাদনায় উৎসাহিত হয়ে থাকবেন। ১৫ জুন ১৮৫২ (৩ আষাঢ় ১২৫৯) মঙ্গলবার অর্ধ সাপ্তাহিক 'সংবাদ বিভাকর' মনোমোহনের সম্পাদনায় বাংলা সাময়িক জগতে আবির্ভূত হয়। 'সংবাদ বিভাকরে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে ১৭ জুন 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায় লেখা হয় ঃ

> আমরা অহ্লাদ পূর্বক পাটক বর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে গত পরশ্বাবধি শ্রীযুক্তবাবু মনোমোহন বসু কর্ত্তৃক 'সংবাদ বিভাকর' নামক অর্দ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র অর্দ্ধ মুদ্রা মাসিক মূল্যে প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, নবীন সম্পাদক-দিগের অভিপ্রায় এবং পত্রের রচনা উত্তম হইয়াছে।[২]

এক বৎসরের মধ্যেই 'সংবাদ বিভাকরে'র প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। ৯ মে ১৮৫৩ তারিখের 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' 'সংবাদ বিভাকর' প্রচার বন্ধের সংবাদ জ্ঞাপন করেছে।[৩]

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ ৪র্থ খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ২১৮-১৯।
২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা ঃ মনোমোহন বসু—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ১০।
৩. তদেব। আমরা 'সংবাদ বিভাকর' দেখিনি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাময়িকপত্রে (২য় খণ্ড) যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত হল।

সম্ভবতঃ আর্থিক অনটনের ফলে 'সংবাদ বিভাকরে'র অকাল বিয়োগ ঘটে। তাছাড়া অপরিণত বয়সের ফসল 'সংবাদ বিভাকর' হয়তো 'প্রভাকরের' প্রভায় ম্লান হয়ে যায়। সংবাদ বিভাকরের অকাল মৃত্যু মনোমোহনকে পীড়া দিয়েছিল। কিন্তু এই অসফলতা তাঁকে সাহিত্যচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়নি, বরঞ্চ সাহিত্যচর্চায় অতিমাত্রায় একাগ্রতা সঞ্চার করেছিল। 'সংবাদ বিভাকর' থেকে 'মধ্যস্থ' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রচনা প্রকাশ এবং ঈশ্বর গুপ্তের প্রেরণায় কবি-গানের চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'রামাভিষেক নাটক' (১৫ জ্যেষ্ঠ ১২৭৪/ইং ১৮৬৭), 'প্রণয়পরীক্ষা নাটক (ভাদ্র ১২৭৬/ইং সেপ্টেম্বর ১৮৬৯) 'পদ্যমালা ১ম ভাগ' (অগ্রহায়ণ ১২৭৭/ইং ১৮৭০) ইত্যাদি গ্রন্থ। এছাড়া ফরমাইস মত বিভিন্ন নাটকের গান রচনা করেছেন। ১২৭৯ সালের - বৈশাখ প্রকাশ করলেন 'মধ্যস্থ'। ইতিমধ্যে তাঁর সাহিত্যজগতে খ্যাতি প্রসারিত হয়েছে। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে ১৮৭২ সাল নিঃসন্দেহে গৌরবময়। কারণ ঐ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন', মনোমোহনের সম্পাদনায় 'মধ্যস্থ,' শ্রীকৃষ্ণ দাসের সম্পাদনায় 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকা। তবে উল্লিখিত তিনটি পত্রিকার মধ্যে 'মধ্যস্থ' ছিল সংবাদ-পত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে ১২৭৯ সালের ২ বৈশাখ, শনিবার (১৩ এপ্রিল ১৮৭২) থেকে এই সাপ্তাহিক 'মধ্যস্থ' প্রচারিত হয়। প্রতি সংখ্যার শিরোভাগে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি শোভা পেত :

নবীনভাবাচ্চপলাননবান্নবেৎযবীয় সোপীহ চিরাগত প্রিয়ান্।
নিরীক্ষ্য ভিন্ন প্রকৃতীন মূলতঃ মধ্যস্থ ইত্থং যততে সমন্বয়ে॥

ছাপা হত কলুটোলাস্থ 'ভারত যন্ত্রে'। প্রকাশিত হত 'করনওয়ালিস ষ্ট্রীটের ২০২ নং ভবন' থেকে। প্রথম সংখ্যায় যে ২১ জনের গ্রাহক তালিকা ছাপা হয় তাঁদের মধ্যে বহরমপুরের জমিদার বাবু রামদাস সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সংখ্যায় মধ্যস্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ১৬। দু কলমে পাইকা বোল্ড টাইপে প্রথম সংখ্যা ছাপা শুরু হলেও মাঝেমধ্যে স্মল পাইকা এবং কিছু বোল্ড হেডিং টাইপ ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যস্থের বার্ষিকমূল্য ছিল মাশুল সমেত ৫ টাকা ১০ আনা। প্রতিসংখ্যার মূল্য নির্ধারিত ছিল দুই আনা, প্রতিবারে প্রতি পংক্তি বিজ্ঞাপনের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ১ আনা।

প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রচারের 'প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য' সম্পর্কে সম্পাদক মনোমোহন লিখেছেন :

আমি কোনো পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই; কাহারো সহিত প্রণয় বা বিবাদ করিতে আসি নাই; ব্যক্তি বিশেষকে তোষামোদ বা শ্লেষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতেও আসি নাই, আমি আমোদজনক নীতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি—এই চীৎকার করিতে আসিয়াছি—এই দোহাই পাড়িতে

মধ্যস্থ

প্রতি শনিবারে প্রকাশমান।

ভাগ। | শনিবার, বৈশাখ। | ১সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণ।

'মধ্যস্থ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা

আসিয়াছি, যে—স্থির হও; উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম! কিন্তু একটু মন্থর গতিতে চল; শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ কর; সময়যাত্রীদের কুড়াইয়া লও; সঙ্গী ছাড়িয়া কোথা যাও?—সঙ্গীহারা কেন হও? উন্নতির পথে বিঘ্ন-দস্যু অনেক আছে, একা একা গেলে অগ্রবর্তী পরবর্তী সকলের বিপদ্; গমন বিলম্ব হয়; তাও ভাল, কিন্তু একত্র হও! কিছু বিলম্বে গেলে হানি হইবে না, অতএব সময় বুঝিয়া পথ দেখিয়া চল—অত রাতারাতি অত দৌড়াদৌড়ি, অত ব্যস্তসমস্ততার আবশ্যক কি?···

···এইসব সামাজিক প্রয়োজন ব্যতীত রাজকীয় ও অন্যান্য বিষয়াদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, তত্তাবৎ বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই—ফলেন পরিচীয়তে!"

'মধ্যস্থ' চলেছিল চার বৎসর। ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ২৭ সংখ্যা (৯ কার্তিক ১২৮০) পর্যন্ত সাপ্তাহিক আকারে চলবার পর 'মধ্যস্থ' মাসিক আকার ধারণ করে। শনিবারের পরিবর্তে প্রতি শুক্রবারে 'মধ্যস্থ' প্রকাশের কারণ হিসাবে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রণিধানযোগ্য:

আগামী সংখ্যা হইতে শনিবারের পরিবর্তে মধ্যস্থ শুক্রবারে প্রকাশিত হইবে। বিশিষ্ট হেতুতেই পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইল। কলিকাতার প্রায় সমুদয় কর্মালয় আলিপুরের তাবৎ আদালত শনিবারের দুইটার সময় বন্ধ হয়। বাহকগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়াও সকল দিন সকল অফিসে দুইটার মধ্যে কাগজ দিয়া উঠিতে পারে না। শুক্রবার হইলে সে দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় কারণ, বিদেশীয় অনেক গ্রাহকের কাগজ তাঁহাদিগের কর্মস্থানের নামে শনিবার ডাকঘরে প্রেরিত হয় রবিবারে তাহা তথায় পেঁছে। কিন্তু সোমবার ব্যতীত তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারে না; শুক্রবারের ডাকে পাঠাইলে তাঁহারা তৎপর দিনেই পাইতে পারিবেন।[১]

'মধ্যস্থে' সাধারণ সংবাদ অপেক্ষা সাহিত্য সংবাদ বেশি গুরুত্ব পেত। অথচ পাঠকের চাহিদার প্রাধান্য বজায় রাখতে নানাবিধ সামাজিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ ছাপা হত। বিনা নোটিশে মধ্যস্থের কোন সংখ্যা আত্মগোপন করতো না। কোন কারণে কোন সংখ্যার বিলম্ব প্রকাশ অথবা ছুটি থাকলে সব সময় পূর্বাহ্ণেই গ্রাহকদের মধ্যস্থ মারফৎ যথারীতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যস্থ পত্রিকা মারফৎ মনোমোহন সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। দেশের জন্য মনোমোহনের চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত রচনা থেকে:

মধ্যস্থের পাঠক মাত্রেই এতদিনে অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন, যে তাঁহাদের

১. মধ্যস্থ; ১২৮০, ১ বৈশাখ।

> চিহ্নিত মধ্যস্থ কিছু স্বজাতীয় রীতি পদ্ধতির ভক্ত। কিন্তু কাণা-ভক্ত নহে। যাহা আবহমান চলিয়া আসিতেছে ভাল হউক, পুরাতন বলিয়া তাহাই থাকুক অথবা চাকচিক্যময় বিলাতী সভ্যতা, ভাল হউক মন্দ হউক, জাহাজী আমদানি বলিয়া নূতন জিনিষ বলিয়া তাহাই গৃহীত হউক, মধ্যস্থের সে অভিপ্রায় নয়। মধ্যস্থ পরিস্কারভাবে ইহাই বলে, তাড়াতাড়ি করিও না; ঠাণ্ডা হইয়া ভালরূপে বিচার করিয়া—সুদ্ধ বাহ্য নয়, অভ্যন্তর ভাগ চিরিয়া দেখিয়া—দেখার মতন দেখিয়া পুরাতনের মধ্যে যাহা উত্তম তাহাকে প্রাণপণ রক্ষা কর; যাহা মধ্যম, তাহাকে ভালরূপে সংশোধিত কর; যাহা অধম তাহাকে পরিত্যাগ বা তাহার পরিবর্ত্তন কর। আবার ও পক্ষে যত নূতন আমদানি হইতেছে, তন্মধ্যে যাহা উত্তম ও উপকার, যাহা এ দেশের অবস্থায় লাগিনক, সুতরাং স্বাভাবিক—যাহার জন্য আমাদের সমাজ যখন যতদূর প্রস্তুত; তখন তন্মাত্রই গ্রহণ কর; তদ্ব্যতীত আর যত "নূতন" যেসব (ফল বিক্রেতারা যেমন পচা আম্র প্রভৃতি ফেলিয়া দেয়; তেমনিভাবে) দূরে নিক্ষেপ কর।[১]

ইউরোপীয় চিন্তাধারার পুরোপুরি নকলের ঘোর বিরোধী ছিলেন মনোমোহন। মধ্যস্থের আরম্ভ পৃষ্ঠায় যে ছবি ব্যবহৃত হত সে ছবি থেকেই পরিস্কার বোঝা যায়। 'প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের মিলন' এই মধ্যস্থতার উদ্দেশ্যেই মনোমোহনের 'মধ্যস্থ' জন্ম নেয়। 'সংবাদ' শিরোনামে সে সব সংবাদ পরিবেশিত হত সেগুলি ছিল 'classified' অর্থাৎ প্রত্যেকটি সংবাদের সংক্ষিপ্ত একটি শিরোনাম থাকতো, যেমন—রাজকীয় সামাজিক, শিক্ষা, আবকারী, বিচার, মিউনিসিপ্যাল, ইত্যাদি। প্রত্যেকটি সংবাদই সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত করে লেখা হত।

মধ্যস্থকে হিন্দু বা চৈত্রমেলার মুখপত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। জাতীয় সভার কার্যবিবরণ, বিজ্ঞপ্তি, আলোচনার বিষয়বস্তু এমনকি বিভিন্ন বিষয়ে চাঁদা পাঠাবার এবং যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল মধ্যস্থ কার্যালয়। এসব ছাড়া পাঠকচিত্তরঞ্জনের জন্য 'তারকেশ্বরের মোহান্তের বিচার' 'ব্যাভিচারিণী বধবার বিষয়াধিকার' মামলার বিবরণ পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে নিয়মিত ছাপা হত। 'জয়াবতী', 'কুলীনচাঁদ', 'কুলীন,' 'বঙ্গীয় কবি ও কাব্য' প্রভৃতি কাহিনী ও আলোচনা ধারাবাহিক ভাবে মধ্যস্থে ছাপা হত। 'প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি' শিরোনামে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা সমালোচনা করা হয়েছে। ১২৮০ সালের শ্রাবণ মাস থেকে পরপর তিনটি সংখ্যায় 'বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ১২৮০ সালের মধ্যস্থে ছাপা হয়—'এ দেশের পানদোষের আধিক্য জন্য গভর্নমেন্ট দায়ী কি না?' কেঁড়েল-কৃত তৎকালীন দুর্গোৎসব-চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'দুর্গোৎসব

১. মধ্যস্থ; ১২৮০, বৈশাখ।

পাঁচালি' কবিতায়। শোক সংবাদে লেখা হয়েছে 'মৃত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত' ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্দেশে 'হায় কিশোরী'। সর্বোপরি মনোমোহনের 'কে'ড়েল' ছদ্মনামে 'সমাজচিত্র'[১] আত্মজীবনী মূলক একটি মূল্যবান রচনা। এই পত্রিকা থেকে আমরা নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য সংবাদ দুটি জানতে পারি ঃ

'সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি প্রদর্শন জন্য সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ২০০০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। শ্বেতপুরুষ দলের মধ্যে অনেকে এই হিংসাতে ফাটিয়া মরিতেছেন! সংস্কৃত ভাষা বাঙ্গালীর মাতৃভাষা সুতরাং তজ্জন্য বাঙ্গালী সিবিলিয়ানকে পারিতোষক দেওয়া অনুচিত। ইত্যাদি কত আপত্তি উঠিতেছে!'[২]

'রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ড রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কতৃর্ক সংগৃহীত হয়ে প্রথম খণ্ডটি আদি ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। এখানে বিশেষ উল্লেখ্য যে, তখনকার দিনে এই গ্রন্থাবলী গ্রাহক করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। সম্ভবত গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে গ্রাহক করে গ্রন্থাবলী বিক্রয়ের উদ্যোগ এই প্রথম। এ সম্পর্কে মধ্যস্থে লেখা হল ঃ

প্রকাশকেরা সংকল্প করিয়াছেন, খণ্ডে খণ্ডে তাঁহারা সমুদয় গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন, প্রতি খণ্ডে ডিমাই ৮ পেজী ৮ ফারম করিয়া থাকিবে; প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ॥. আট আনা ও ডাক মাশুল এক আনার বেশী নয়। গ্রাহকগণকে দুই খণ্ডের মূল্য মাশুল সহিত অগ্রে দিতে হইবে।'[৩]

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা মধ্যস্থের উদ্দেশ্যের আর একটি দিক। ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের বঙ্গদর্শনে ভারতচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এ সমালোচনা তখন বাংলা সাহিত্যে রীতিমত আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। মনোমোহন বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় 'মধ্যস্থ'কে মধ্যস্থ করেছিলেন। ধারাবাহিকভাবে দ্বিতীয় বর্ষের মধ্যস্থে বঙ্গদর্শনের তীব্র সমালোচনা করা হয়।[৪] বঙ্গদর্শনের সমালোচনা প্রসঙ্গে মধ্যস্থে লেখা হয় ঃ

১. বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
২. মধ্যস্থ; ১ম বর্ষ ১২৭৯, ৩০ বৈশাখ।
৩. মধ্যস্থ; ২য় বর্ষ ১২৮০, ৭ অগ্রহায়ণ।
৪. মধ্যস্থ পত্রিকায় বঙ্গদর্শনের সমালোচনার তালিকা ঃ ভারতচন্দ্রের গ্রহণ; মধ্যস্থ ২১ বৈশাখ ১২৮০। বিলাস বাবুর অভিপ্রায়লিপি; ২৮ বৈশাখ ১২৮০। বাঙ্গালা কবি ও কাব্য; ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। প্রাপ্ত ঃ প্যারীমোহন কবিরত্নের কবিতা; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। সমালোচনের সমালোচনা, ১৮, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। প্রেরিত পত্র; ১৮ শ্রাবণ ১২৮০। বঙ্গদর্শন—গর্দ্দভ; ৩২ শ্রাবণ ১২৮০; বঙ্গদর্শন—গর্দ্দভ পরিশিষ্ট; ৭ ভাদ্র ১২৮০।

ভারতের কাব্যকে আমরা অমৃত বলিয়া জানিতাম, যদিও তাহা ছেলে ভুলানো কোত্‌রা গুড় হইয়া উঠিল, কিন্তু বিদ্যাপতিরূপ 'পুঁটি মাছ' কবি কঙ্কণ 'রোহিত মৎস্য' এবং বঙ্কিম বাবু রূপ "মিষ্ট লঙ্কার আচার" যখন পাইতেছি; তখন ঝোল কর, অম্বল কর সকলি হইতে পারিবে—অরুচির মুখেরও রুচি জন্মিবে! তাহার উপর আবার দীনবন্ধুবাবু কাঁচা মিঠার আম গাছ আছেন। "নীলদর্পণ" তাঁহার মুকুল, দক্ষিণ মলয় বায়ুতে তাহার সৌরভ দিগ্বিস্তার করিয়াছিল, তাঁহার নিমচাঁদ, মল্লিকা, শ্রীনাথ, ক্ষীরোদবাসিনী প্রভৃতি তাঁহার সেই কাঁচা মিঠার কাঁচা অবস্থা আর তাঁহার "দ্বাদশ কবিতা" "সুরধুনীতে" সেই ফল যে পাকিয়া উঠিতেছে তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

তবে আর ভারতচন্দ্র কোত্‌রা গুড়ের অভাবে শোক কি? এমন অমৃত ফলে যখন পাক ধরিয়াছে—সম্মুখে যখন এমন ফলের জ্যৈষ্ঠ মাস—তখন আর কোথাকার ভারতচন্দ্র? পরস্পরের গরিমা গ্রন্থনরূপ জাল আঁকুশী দিয়া সেই মিষ্ট ফল একটি একটি করিয়া পাড়িয়া জাগ্ দিয়া ভোগ করিব, আমার মুখে তুমি দিবে, তোমার মুখে আমি দিব, লোকে দেখিয়া বলিবে "বা বা! কি চমৎকার!" কিন্তু এই বেলা; এখন পাক ধরেছে রং ধরেছে, এই বেলা; শেষে পাছে পচে যায়, এই বেলা!!

এই অমৃতফল ফুরাইতে না ফুরাইতে আবার এক উপাদেয় বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই হইয়াছে—অর্থৎ আচার। বঙ্কিমবাবু মিষ্ট লঙ্কার আচার; আর বঙ্গদর্শন সেই আচারের হাঁড়ি। খানিক খানিক মিষ্ট লাগিবে; খানিক অম্ল রসময়; অম্ল সুধু খেতে ভাল লাগে না কিন্তু ভাল খাইবার সময় অম্ল না হইলে চলে না। কিন্তু ঝালের ভাগটা যাহার অদৃষ্টে পাড়িবে তাহার হাড়ে হাড়ে খ্ খ্ করিবে। এই ঝালের ভয়েই ভয়! নতুবা উপাদেয় বস্তু বটে! কিন্তু কোত্‌রা গুড়ের আস্বাদে দেশের লোকের গলা একবারে ঝাঁঝিয়ে গিয়াছে, তাহার উপর একটু ঝালে আর কি করিবে? আজ্‌কাল্ সুদ্ধ ভারতচন্দ্রামৃত যে কোত্‌রা গুড় হইয়াছে তাহা নহে; –

বিদ্যাসাগর সাগর ছিলেন,
তিনি এখন ডোবা হলেন!

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরাজী গ্রন্থাবলী অবলম্বন করিয়া কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানিতাম, সেই সেই গ্রন্থে এত গুণপনা এত পারিপাট্য দেখাইয়াছেন, যে অক্ষয় বাবু ব্যতীত অদ্যাপি ভাষান্তরিত গ্রন্থরচনায় এদেশে আর কেহ তেমনটী পারেন নাই। আমরা আরো ভাবিতাম, যদি তিনি সে সকল কিছুই না করিতেন, তবু তাঁহার বিধবা বিবাহের পুস্তক দুই খণ্ড ও বহুবিবাহের পুস্তক দুই খণ্ড প্রভৃতি চারি পাঁচ খান যাহা লিখিয়াছেন;

ইউরোপ হইলে তাহাতেই তিনি পরম পূজ্য গ্রন্থকার হইতে পারিতেন। কিন্তু এদেশে তুলনায় সমালোচনা হইয়া থাকে, এদেশে তিনি কে? এদেশে জন দুই তিন চিহ্নিত গ্রন্থকার আছেন, তাঁহারা কোম্পানির চিহ্নিত সিবিলিয়ানের ন্যায় সকলকে মস্তকে ঠেলিয়া উঠিবেন![১]

মনোমোহনের সমালোচনার রীতি ছিল খোলাখুলি। মধ্যস্থের যে-কোন সংখ্যাতেই দেখা যাবে এই সমালোচনার নমুনা। উদাহরণ হিসাবে নিচের উদ্ধৃতিটি প্রণিধানযোগ্য:

বঙ্গদর্শন অনেকেরি প্রিয়দর্শন; সম্প্রতি তাঁর কলমের কার্দানি দেখে আবার আদার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খবর দেওয়াতে বাংলা বাজারে অনেকেরি অপ্রিয় দর্শন হয়ে উঠেছেন! আজকাল এঁর এতদূর দৌড়, যে মহাকবি ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবিতার দোষারোপ করেছেন! এবং বর্ত্তমান বঙ্গভাষার বিধাতা পুরুষ, যাঁর শ্রীচরণ প্রসাদে অনেকেই কলম ধ'রতে শিখেছেন, সেই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মেকি লেখক বলিয়া অবলীলাক্রমে ঠাট্টা ক'র্ত্তে কোমর বেঁধেছেন![২]

দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই মধ্যস্থ *বঙ্গদর্শনের* প্রধান প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে মনোমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। ক্রমে সে বন্ধুত্বে ফাটল ধরে। কারণ হিসাবে একটি গল্প প্রচলিত আছে। একদা নাকি দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এক রচনা প্রতিযোগিতা হয়। বিচারক ছিলেন মনোমোহন, তাঁর বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের পরাজয় ঘটে। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র মনোমোহনের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন।[৩]

মধ্যস্থে রাজনীতি, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে মনোমোহনের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া একাধিক কবিতা, বক্তৃতা, আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। মধ্যস্থের লেখকগোষ্ঠী নিরূপণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, কারণ কোন রচনাতে নাম প্রকাশ করা হত না। এমনকি বার্ষিক সূচিপত্রেও না। ফলে মনোমোহন ছাড়া আর কে কে এতে লিখতেন তার হদিস করা আজকের দিনে অসম্ভব। মধ্যস্থ পত্রিকাতে মনোমোহনের 'দুলীন' উপন্যাসের প্রথমাংশ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

মধ্যস্থে নিয়মিত পুস্তক সমালোচনা করা হত। স্থানাভাবে সমালোচনা না করতে পারলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা অথবা প্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা ধন্যবাদের সঙ্গে ছাপা হয়েছে; এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সমালোচনা করা হয়েছে নিয়মিত। 'মুখুয্যার ম্যাগেজিন', বেঙ্গল ম্যাগাজিন, বারুইপুর চিকিৎসাতত্ত্ব, সাপ্তাহিক সমাচার, বঙ্গদর্শন, ভারত সংস্কারক, মাসিক প্রকাশিকা, সমবেদক, উড়িষ্যাপেট্রিয়ট, পল্লীদর্শন, তমোলুক পত্রিকা, জ্ঞান-বিকাশিনী, বিজ্ঞান-বিকাশ, প্রয়াগদূত, হিন্দুপেট্রিয়ট, মুর্শিদাবাদ পত্রিকা প্রভৃতি

১. বিলাস বাবুর অভিপ্রায় লিপি; মধ্যস্থ, ২৮ বৈশাখ ১২৮০; পৃ. ৯০-৯১।
২. মধ্যস্থ; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০; পৃ. ১০৯।
৩. মনোমোহন বসু—কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত; প্রবাসী, বৈশাখ ১৩১৯; পৃ. ৯৮-১০১।

পত্র-পত্রিকার প্রাপ্ত সংখ্যাগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করা হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন'-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা পেয়ে 'প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি' বিভাগে লেখা হয় ঃ

> বঙ্গদর্শন বর্ত্তমান মাসে স্বীয় কাঁঠালপাড়াস্থ যন্ত্রালয় হইতে এই প্রথম বহির্গত হইল। আকার প্রকার তাহাই আছে, স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এইমাত্র। বর্ত্তমান সংখ্যার কোন কোন বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর বলিবার কথা আছে, ভরসা করি আগামীতে তজ্জন্য মধ্যস্থে স্থান করিতে সমর্থ হইব। [১]

'প্রাপ্ত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে উক্তি' বিভাগে পত্র-পত্রিকা ছাড়া বইপত্র সমালোচিত হয়েছে। পারিবারিক সাহিত্য সভার বিবরণ, উপেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী প্রণীত বীরাবলী কাব্য, ভিক্টোরিয়া পঞ্জিকা, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের টড্স রাজস্থান, জৈমিনি ভারত, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনগুপ্ত প্রণীত প্রবোধ কৌমুদী, কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের পার্থজ বিয়োগ কাব্য, শ্যামাচরণ শ্রীমানীর আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ইত্যাদি সমসাময়িক বইপত্রের নিয়মিত সমালোচনা করা হত। সঙ্গীত-বিষয়ক বইয়ের মধ্যে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর জয়দেবের জীবনচরিত সম্বলিত গীতগোবিন্দ গীতাবলীর স্বরলিপি ; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরাজী স্বরলিপি পদ্ধতি ও জাতীয় সংগীত বিষয়ক প্রস্তাব (হিন্দুমেলায় গীত) ইত্যাদি বহু গ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে। রামগতি ন্যায়রত্নের বইটি সমালোচনা করেন ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এডুকেশন গেজেটে 'বাংগালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশকের বিজ্ঞাপন দেখে সমালোচক বইটি কিনে সমালোচনা করে এডুকেশন গেজেটে ছাপার জন্য পাঠিয়ে দেন, কিন্তু ছাপা হয়নি। সমালোচক মধ্যস্থ পত্রিকায় সমালোচনাটি প্রকাশের জনা অনুরোধ করেন। এই সংগে প্রেরিত পত্রটি উলেখযোগ্য ঃ

> মান্যবর শ্রীযুক্ত মধ্যস্থ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু !
>
> সম্পাদক মহাশয় !
>
> বহুদিবস হইল, নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী আমি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। কেন যে তিনি এ পর্যন্ত উহা মুদ্রিত করেন নাই, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আপনি যদি আপনার পত্রিকায় আমার প্রবন্ধটীকে স্থান দেন, বোধহয় বাংগালা সাহিত্য সমালোচনার অনেক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এডুকেশন গেজেটের সম্পাদককে লিখিবার সময় যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলাম, নিম্নে সেইরূপ রাখিলাম।
>
> শ্রীঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
>
> সাং নিমতা। [২]

১. মধ্যস্থ ; ১৪ বৈশাখ ১২৮০ ; পৃ. ৫৬।
২. মধ্যস্থ ; ফাল্গুন ১২৮০ ; পৃ. ৭৩৩-৩৭।

সেকালের ধনী জমিদারদের সাহায্যে মনোমোহনের মধ্যস্থ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর গ্রাহক সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল মধ্যস্থের প্রচার। রঙ্গপুরের কাঁকিনীয়া থেকে লাহোর পর্যন্ত ছিল মধ্যস্থের গতিপথ। 'অতিরেক মধ্যস্থ' প্রকাশের পরও নির্ধারিত মূল্যের কোন পরিবর্তন করা হয়নি। স্বদেশচিন্তাই যাঁর ধ্যানজ্ঞান তাঁর পক্ষে ব্যবসা করা দুঃসাধ্য, মনোমোহনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আর্থিক অনটনে মধ্যস্থ অনেকবার হাবুডুবু খেয়েছে। শেষপর্যন্ত বেঁচে উঠেছে রাজা মহারাজাদের সহৃদয়তার গুণে। সব থেকে বেশি সাহায্য পেয়েছে শোভাবাজারের মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কাছ থেকে। এইরূপ দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনোমোহন মধ্যস্থে প্রকাশ করেছেন ঃ

> শোভাবাজারস্থ রাজবাটীর শিরোভূষণ শ্রীমন্মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট মধ্যস্থ চির কৃতজ্ঞতা ঋণে বন্ধ হইল। মধ্যস্থ পত্রের মুদ্রাঙ্কন কার্য্যের সৌকর্য্য হেতু একটী উত্তম লৌহযন্ত্র, একটী কাষ্ঠযন্ত্র এবং কয়েক প্রকারের নূতন ও পুরাতন অক্ষর বিবিধ সরঞ্জামের সহিত বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মধ্যস্থের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। স্বকীয় মুদ্রাযন্ত্রের অভাব-জনিত যন্ত্রণা হইতে এত অল্পকাল মধ্যে আমাদের যে নিষ্কৃতি লাভ হইবে, তাহা মনে ছিল না, কেবল মহারাজের কৃপা বলেই তাহা সংঘটিত হইল।[১]

এছাড়া পুঁটিয়ার রানী শরৎসুন্দরী দেবী 'মধ্যস্থের অনুকূল্যার্থে বিংশতি মুদ্রা' এবং 'রামাভিষেক নাটক' পাঠে সন্তুষ্ট হয়ে গ্রন্থকর্তাকে দশ টাকা পারিতোষিক দিয়েছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীও মধ্যস্থের প্রচারের জন্য ৫০০ টাকা দান করেছিলেন। এইভাবে বিত্তবানের সহায়তায় মধ্যস্থ টিকে ছিল। এই দানের মর্যাদা মনোমোহন সর্বান্তঃকরণে মধ্যস্থ পাঠককে দিতে পেরেছিলেন। মধ্যস্থ সম্পাদনে সাফল্য মনোমোহনকে তাঁর প্রথম সাংবাদিক জীবনের ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিয়েছিল। মধ্যস্থ সম্পাদনার গুরুতর পরিশ্রমে মনোমোহন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। ক্রমে বাধ্য হয়ে তিনি মধ্যস্থকে মাসিকে রূপান্তরিত করেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

> আমার অন্যান্য রূপ অবস্থা অনুকূল থাকিয়াও দৈহিক অবস্থা বিশেষ প্রতিকূল হইয়া উঠিল। ...মহাপূজার অবসান কালে অস্বাস্থ্য রূপ সেই প্রতিকূল অবস্থা দেখা দিল। তাহাতেও ভীত হই নাই। ভাবিলাম অল্প দিনে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইতে পারিব। এই আশাতে বর্ত্তমান কার্ত্তিক মাসের ২৬ সংখ্যা সংকল্পানুরূপ তিন ফরমাকারেই প্রচার করিলাম। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই স্বাস্থ্য ভঙ্গ বহু চেষ্টাতেও রণে ভঙ্গ না দিয়া বরং সমধিক তেজস্বিতা প্রদর্শন করিতে

১. মধ্যস্থ ; ২ আষাঢ় ১২৭৯ ; পৃ. ১৪৬-৪৭।

> লাগিল। তথাপি অদ্যকার এই ২৭শ সংখ্যা কষ্টে-সৃষ্টে প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু শরীরের যেরূপ অবস্থা লক্ষিত হইতেছে তাহাতে পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের হ্রাসতা না করিলে অবশেষে অতি সামান্য-আয়াস-সাধ্য কোনো কর্মের যোগ্যও থাকিতে পারিব না।[১]

মধ্যস্থকে মাসিক পত্রে পরিণত করার পিছনে শারীরিক অসুস্থতা প্রধান কারণ, অবশ্য এটাই একমাত্র কারণ নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল একে 'বঙ্গদর্শনে'র মত মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় রূপান্তরিত করা। এই ইচ্ছার কথা মনোমোহন বিজ্ঞাপিত করেছেন : 'সেই মাসিক মধ্যস্থ বঙ্গদর্শনের ন্যায় আকৃতি ও পত্রসংখ্যাবিশিষ্ট হইবে।' অবশ্য মাসিক হওয়ার পূর্বে মধ্যস্থের গ্রাহকসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পেতে শুরু করে। মধ্যস্থ সাপ্তাহিক থেকে মাসিকে রূপান্তরিত হলে 'সাধারণী' পত্রিকায় লেখা হয় :

> মধ্যস্থ পত্র আর প্রতি সপ্তাহে বাহির হইবে না। এখন অবধি ইহা মাসিক পত্র হইল। ও দিকে হালিশহর মাসিক ছিল সাপ্তাহিক হইয়াছে। সুতরাং ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না।[২]

'মধ্যস্থ' মাসিকে পরিণত হলেও মনোমোহন সম্পাদনার পুরো দায়িত্ব একাই পালন করতেন। এমন কি ঠিক মত লেখা পাওয়া যেত না, তাই মনোমোহন ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন—'অন্য কোন সমহৃদয় সুহৃদ লেখকের যথেষ্ট লিপি সাহায্য পাইতে পারিতাম, তাহা হইলেও একদিন চলিত। কিন্তু সমাজের বর্তমান অবস্থায় নানা কারণে সেরূপ আনুকূল্য পাওয়া নিতান্ত দুর্ঘট।' মধ্যস্থকে মাসিকে পরিণত করবার পর মধ্যস্থের জনপ্রিয়তা অনেক হ্রাস পায়। জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে ১২৮২ সাল থেকে মনোমোহন মধ্যস্থের আকার পরিবর্তন করেন। পূর্বাপেক্ষা ঝরঝরে ছাপা ও বড় টাইপ ব্যবহার করা হয়। তবুও মধ্যস্থ হৃতগৌরব ফিরে পেল না। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মনোমোহন মধ্যস্থকে প্রায় দুবছর সচল রেখেছিলেন। সর্বোপরি মনোমোহনের শারীরিক অসুস্থতার জন্য মধ্যস্থ প্রকাশ বাধ্য হয়েই বন্ধ করতে হয়। মধ্যস্থের শেষ সংখ্যার প্রকাশ কাল ১২৮২ আশ্বিন।

মনোমোহনের আয়ের অন্যতম উৎস ছিল মধ্যস্থ পত্রিকা ও প্রেস। চেক্, বিল, অফিসে ব্যবহৃত নানাবিধ খাতাপত্র ইত্যাদি মধ্যস্থ যন্ত্রে ছাপা হত। নাগরী হরফেও বই-পত্র ছাপা হয়েছে। মধ্যস্থ যন্ত্রালয় থেকে মনোমোহন নিজের বই ছাড়া অন্যান্য

১. মধ্যস্থ (অতিরেক) ; ৯ কার্তিক ১২৮০ ; পৃ. ৫৫৩-৫৬।
২. সাধারণী ; ১৮ কার্তিক ১২৮০।

লেখকদের বই বিক্রী করতেন। মধ্যস্থে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেওয়া হত 'মধ্যস্থ যন্ত্রালয়' থেকে কি কি বই বিক্রী করা হবে[১] একটি বিজ্ঞাপনে জানা যায় :

> আমাদের যন্ত্রালয়ে···বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত মহাভারত একসেট ও স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কৃত শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট একখানি বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ডাকমাশুল ব্যতীত মহাভারতের মূল্য ৫০ টাকা ও শেষোক্তর মূল্য ১২ টাকা মাত্র। গ্রহণেচ্ছুক মহাশয়গণ পত্র লিখিলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।[২]

এই সময়ে মনোমোহন সমকালের নানা ধরনের সামাজিক কর্মকান্ডের সংগে যুক্ত ছিলেন। আর তাঁর এই সব কাজকর্মের কেন্দ্র ছিল মধ্যস্থ যন্ত্রালয়।

'মৃত কবি মাইকেলের নিরাশ্রয় পুত্রদ্বয়ের সাহায্যার্থ চান্দা' পাঠাবার অন্যতম ঠিকানা নির্ধারিত হয়েছিল 'মধ্যস্থ' যন্ত্রালয়।[৩]

১. মধ্যস্থ-যন্ত্রালয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হয়।

বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা মূল্য আট আনা। বাবু বিহারীলাল নন্দী প্রণীত বাঙ্গালা ভিকটোরিয়া পঞ্জিকা মূল্য একটাকা। বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভারতবর্ষের ভুগোল বিবরণ মূল্য ছয় আনা। বাবু নিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত শরৎকুমারী নাটক মূল্য আট আনা। বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত রামাভিষেক নাটক মূল্য এক টাকা, প্রণয় পরীক্ষা নাটক মূল্য এক টাকা, পদ্যমালা (শ্রেণীপাঠ্য) দুই আনা; হিন্দু আচার ব্যবহার ১ম ভাগ মূল্য ছয় আনা। বক্তৃতামালা অর্থাৎ উক্ত বসুর সমস্ত বক্তৃতা একত্রে সংকলিত মূল্য দশ আনা। শেষোক্ত কয়খানি পুস্তক সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, পটলডাঙ্গাস্থ বাঁড়ুয্যা ব্রাদার্স কোং, চিনাবাজার ও বটতলার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়। অধিক পুস্তক লইলে রীতিমত কমিসন দেওয়া যায়।—মধ্যস্থ, ১৮ শ্রাবণ ১২৮০। পৃ. ৩৩৯।

২. মধ্যস্থ; ৩২ শ্রাবণ ১২৮০। পৃ. ৩৭৫।

৩. এ বিষয়ে একটি ইংরাজী বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে 'মধ্যস্থে'।

FUND FOR THE MAINTENANCE AND EDUCATION
OF THE BOYS OF THE LATE
MR. M. M. S. DUTTA.

The undermentioned noblemen and gentlemen have kindly consented to form a committee to receive subscriptions :—

The Honorable Raja J. M. Tagore Bahadoor
" Degumber Mitter
Rajendralala Mitter
Baboo Joykishen Mookerjee
" Bhoodeb Mookherjee
Gour Das Bysack
Monomohan Ghosh Esquire
Hemchandra Banerjee
Shishir Kumar Ghose
Kristo Dass Pal

W. C. Bonerjee Esquire member and Secy. Subscriptions in aid of the above fund will be thankfully received by the undersigned.

3 Hasting Street — W. C. Bonerjee.

—মধ্যস্থ; ১৮ শ্রাবণ ১২৮০; পৃ. ৩৩৯।

ব্যভিচারিণী বিধবা স্বামীবিত্তে অধিকারিণী হতে পারবে হাইকোর্টের এই রায় বাঙালী হিন্দু সমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্রাণনাথ পণ্ডিত প্রমুখ মনীষী এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে 'জাতীয় সভায়' এক প্রস্তাব পাশ করে চাঁদা আদায় করতে আরম্ভ করেন। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীলের জন্য চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা নির্ধারিত হয়েছিল মধ্যস্থ যন্ত্রালয়। এই যন্ত্রালয়ে চাঁদা পাঠিয়েছেন মহারাণী স্বর্ণময়ী, কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুর, বর্ধমানাধিপতি প্রমুখ অনেকেই।
১২৮০ সালের চৈত্র মাসের একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় মনোমোহন 'ভারত-চিত্র অর্থাৎ প্রথম যবনাধিকার হইতে পরপর সর্ব্ব সময়ের ইতিহাস ঘটিত নবন্যাস-শ্রেণী'[১] গ্রাহক করে বিক্রির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মনোমোহনের এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। এই রকম আরো অনেক প্রচেষ্টার কথা মধ্যস্থ থেকে জানা যায়। চার বছরের মধ্যস্থ মারফৎ মনোমোহন সমকালের নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আজও স্মরণীয়।

৪

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় জনচিত্তে স্বদেশানুরাগ জাগিয়ে তুলতে জন্ম হয় চৈত্র বা হিন্দুমেলার। ভারতবাসীর মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বন বৃত্তির উন্মেষের পটভূমিকায় এর দান অপরিহার্য। বস্তুতঃ এই হিন্দুমেলা প্রথমে ভারত-

১. আমি বহুদিন হইতে এরূপ বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছি। কতিপয় সম্বিদ্বান্ ধনী ও মধ্যবিধ বান্ধব সেই সংগ্রহ কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন বৃহদায়তনের একশ্রেণী ঐতিহাসিক নবন্যাস প্রণয়ন ও প্রচারের আশা করিতেছি।

আর্য্যভূমি যৎকালে দুর্দ্দণ্ড যবন কর্ত্তৃক প্রথম উৎপীড়িত হয়, সেই সময়ের ঘটনা সূত্রে প্রথম নবন্যাস খানি রচিত হইবে। তৎপরে প্রধান প্রধান সম্রাটের রাজত্বকাল অবলম্বন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ এক একখানি নবন্যাস চলিতে থাকিবে। প্রত্যেক নবন্যাসের বিষয় ও নাম স্বতন্ত্র হইবে। কিন্তু সর্ব্ব সমষ্টিতে যে শ্রেণী দাঁড়াইবে, তাঁহার নাম "ভারতচিত্র"। ফলতঃ যবনাধীন ভারতেতিহাসের সমগ্র সার ভাগ আয়ত্ত করাই অভিপ্রায়। তন্মধ্যে এত বিচিত্র ও অদ্ভুত ঘটনাবলী দৃষ্ট হয়, যে তত্তাবৎ (উচ্চ প্রতিভার লেখনী না লিখিলেও) উত্তম উত্তম নবন্যাসে পরিণত হইতে পারে। সুদ্ধ সেই ভরসাতেই সাহস বাঁধিলাম।

এরূপ গ্রন্থাবলীর মহোপকারিতা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া বাহুল্য। মনোরঞ্জনের সহিত স্বদেশের ঐতিহাসিক জ্ঞান-লাভের এমন পন্থা দ্বিতীয় নাই। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত গ্রন্থমালা অন্যান্য গুণে সম্বন্ধে যাহাই হউক, এইটী সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, সব প্রয়োজনীয় ও স্পৃহণীয় বিষয় সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য, এতন্মধ্যে তেমন দুর্লভ ও সুলভ হইবে।

…এক এক খণ্ড সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রচার করিতে গেলে প্রকাশক ও গ্রাহক উভয়কেই বহু ব্যয়ের অসুবিধায় পড়িতে হয়, এ নিমিত্ত সাপ্তাহিক সংখ্যানুক্রমে প্রকাশের রীতি অবলম্বন করা গেল। প্রতি সপ্তাহে দুই ফরম বাহির করিবার ইচ্ছা, কিন্তু আপাততঃ এক এক ফরম হইতে পারে। ফলতঃ এক ফরমের ন্যূন নয়, দুই ফরমের বেশী নয়, এই নিয়মই ধার্য্য রহিল।…যথোপযুক্ত গ্রাহক সংখ্যা সংগৃহীত হইলেই এই 'ভারত চিত্রের' প্রচারারম্ভ হইবে।—মধ্যস্থ; চৈত্র; ১২৮০ পৃ. ৭৭৩-৭৫।

বর্ষের হিন্দুদের বিভিন্ন শ্রেণীকে একতাবদ্ধ করতে সহায়তা করে। পরবর্তীকালে এর প্রভাব অন্যান্য সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল। ফলে ভারতীয় মহাজাতি গঠনে জন্ম নেয় ইন্ডিয়ান লীগ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস প্রভৃতি সভা, যার উৎপত্তি এই হিন্দুমেলা থেকে। শুধু তাই নয়, এই হিন্দুমেলা থেকে জাতীয় সঙ্গীতেরও উৎপত্তি। মনোমোহন চৈত্র বা হিন্দুমেলার আদি পর্ব থেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেকালের বাঙালীচিত্তে দেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-বোধের নতুন চেতনা সঞ্চার করেছিল চৈত্র বা হিন্দুমেলায় মনোমোহনের ওজঃপূর্ণ বক্তৃতা।

রাজনারায়ণ বসু এই মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :

> শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এই হিন্দুমেলা সংস্থাপন করিবার পর ইহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।[১]

বস্তুতঃ জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগীদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন নবগোপাল মিত্র। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন :

> ...কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ পরিবার ও সহকর্মীদের মধ্যে ইহা (স্বদেশানুরাগ) অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট 'নেশন্যাল পেপার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন অনন্যকর্ম্মা যুবক নবগোপাল মিত্রের উপর। রাজনারায়ণের...অনুষ্ঠান পত্রখানি 'নেশন্যাল পেপার' এ হুবহু মুদ্রিত করেন। এই অনুষ্ঠান পত্রখানিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু পাঠে সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের মনে ইহার আদর্শে জাতীয় সভা প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম উদিত হয়।[২]

নবগোপালের এই মহৎ কর্মযজ্ঞের প্রধান সহায়ক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণের উদ্ধৃত অংশ প্রণিধানযোগ্য :

> নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ পারিত; কুস্তি জিমনাষ্টিক প্রভৃতির প্রচলন করায় চেষ্টা তার খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত।[৩]

১. আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ২০৮।
২. হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত—যোগেশচন্দ্র বাগল ; পৃ. ৩।
৩. পুরাতন প্রসঙ্গ (২য় পর্যায়)—বিপিনবিহারী গুপ্ত ; পৃ. ২০৬।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই জাতীয় মেলার বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন:

> ...আমি বোম্বাইয়ে কার্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলকাতায় এক স্বদেশী মেলা প্রবর্তিত হয়। বড় দাদা নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাতে যোগদান করায় প্রকৃত পক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়।[১]

জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয় চিৎপুরে রাজা নরসিংহ রায়ের বাগান বাড়িতে।[২] দিনটি ছিল ১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তি (ইং ১৮৬৭, এপ্রিল ১২)। প্রথম তিন বৎসর মেলা চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হ'ত বলে চৈত্রমেলা নামে পরিচিত ছিল। এই মেলা থেকে ভারতবাসী স্বাজাত্যবোধের দীক্ষা গ্রহণ করে। রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের স্মৃতিকথায় জাতীয় মেলার এই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করেছেন। নবগোপাল মিত্র সহকারী সম্পাদকের ভার নিয়ে মেলার যাবতীয় কাজ-কর্ম

---

১. আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃ. ৩৫।

২. হিন্দুমেলা ও ভারতচিন্তা—শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়; 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৪; পৃ. ৯৮-৯৯।

যোগেশচন্দ্র বাগল 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে 'সংশোধন ও সংযোজন' করেছেন শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ দেখে। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: '১৮৬৭ সালের ১২ই এপ্রিল; ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন চিৎপুরের স্বর্গীয় রাজা নরসিংচন্দ্র বাহাদুরের উদ্যানে এক জাতীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই জাতীয় মেলার প্রস্তাবে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, প্রমুখ ব্যক্তিগণ। স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে রক্ষণশীল ভাবধারার বাহক হয়েছিলেন। এঁরা ছাড়া রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নবগোপাল মিত্রের সক্রিয় প্রয়াস এই মেলার প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়, এঁদের মধ্যে নবগোপাল মিত্রের নাম সর্বাগ্রগণ্য।'

এই প্রসঙ্গে ন্যাশনাল পেপারে মুদ্রিত বিবরণ উদ্ধৃত করা যায়: *The Chaitra Shankrantee Mela*...'the first assembly of this kind was held on Friday last, the day of Chaitra Shankrantee at the garden house of the late Raja Nursing Chunder Roy, Chitpur. Opened with an inaugural address by Baboo Sreepatty Mookherjee, Deputy Inspector of Schools, Bengal...He further observed that if the business of the Mela were conduct properly it may be the means of stimulating National works of Industry and Arts, it may be the means of fusing distinct Hindoo Nationalities in to one common Hindoo National. He moreover assured the assembly that it was purely a social and neither a religious or political one— The National Paper, 17 April. 1867.

সম্পাদন করতেন। দ্বিতীয় অধিবেশন অর্থাৎ ১৭৮৯ শকাব্দের ৩১ চৈত্র তারিখে মেলার সম্পাদক চৈত্রমেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ঃ

> এই মেলার উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিনে কোনো এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে।…আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য—ইহা ভারতভূমির জন্য।…ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অপনার মহৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে।…আমরা কি মনুষ্য নহি? মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া চিরকাল পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়—ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয়, তা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

এই দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' সঙ্গীতটি মেলা প্রাঙ্গণে গীত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে একজন করে সভার সভাপতি নির্বাচিত হতেন। আর একজন হতেন বক্তা। চৈত্রমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত মনোমোহনের জাতীয় ভাবোদ্দীপক বক্তৃতাটি বাঙালীর রাজনীতি-চর্চার ইতিহাসে স্মরণীয়। বক্তৃতাটির বিষয় ছিল ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ। নিম্নে বক্তৃতাটি উদ্ধৃত করা হল ঃ

> স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে এই বোধ হয়, আজ আমরা একটি অভিনব আনন্দবাজারে উপস্থিত হইয়াছি। সারল্য আর নিম্ম‍ৎসরতা আমাদের মূলধন, তদ্বিনিময়ে ঐক্যনামা মহাবীজ ক্রয় করিতে আসিয়াছি। সেই বীজ স্বদেশক্ষেত্রে রোপিত হইয়া সমুচিত যত্নবারি এবং উপযুক্ত উৎসাহ তাপ প্রাপ্ত হইলেই একটী মনোহর বৃক্ষ উৎপাদন করিবেক। এত মনোহর হইবে, যে, যখন জাতি গৌরব রূপ তাহার নব পত্রাবলীর মধ্যে অতি শুভ্র সৌভাগ্য পুষ্প বিকশিত হইবে, তখন তাহার শোভা ও সৌরভে ভারতভূমি আমোদিত হইতে থাকিবে। তাহার ফলের নাম করিতে এখানে সাহস হয় না, অপর দেশের লোকেরা তাহাকে "স্বাধীনতা!" নাম দিয়া তাহার অমৃতস্বাদ ভোগ করিয়া থাকে। আমরা সে ফল

কখনো দেখি নাই ; কেবল জনশ্রুতিতে তাহার অনুপম গুণগ্রামের কথা মাত্র শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগের অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে অন্ততঃ স্বাবলম্বন নামা মধুর ফলের আস্বাদনেও বঞ্চিত হইবে না ! ফলতঃ একতাই সেই মিলন সাধনের একমাত্র উপায় এবং অদ্যকার এই সমাবেশরূপ অনুষ্ঠান যে সেই ঐক্য স্থাপনের অদ্বিতীয় সাধন তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।[১]

এই মেলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মনোমোহন বলেন :

বস্তুতঃ চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য প্রকার মেলার মধ্যে এমন একটি বিশেষ মেলার প্রয়োজন হইতেছে কিনা, যাহা নির্বিবাদে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত শ্রেণীস্থ লোকের প্রীতিস্থল হইতে পারে—যেখানে ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদ তিরোহিত হইয়া সকলেই সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্য শৃংখলে আবদ্ধ হইবেন—যেখানে বৈষ্ণব; শাক্ত, শৈব, গানপত্য, বুদ্ধ, জৈন, নাস্তিক, অস্তিক সকলেই আপনাপন মেলা ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে উৎসবের সমভাগী হইতে পারেন—যেখানে অন্যান্য মেলার অনুষ্ঠিত অথবা নব নব প্রকারের ক্রীড়া-কৌতুক, আমোদ-আহ্লাদ, বিদ্যা, নাট্যশিল্প, সাহিত্য, কুস্তি ব্যায়াম ইত্যাদি অধিকতর সুশৃংখলা ও সুনিয়মে প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হইতে পারে। যদি এমন মেলার অভাব থাকে—যদি এমন রুচিকর কোনো একটী মহামেলার আবশ্যকতা প্রতিপাদিতা হইয়া থাকে, তবে এই 'চৈত্র-মেলা' সেই অভাব দূরীকরণার্থ—সেই প্রয়োজন সাধনার্থেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" ···কিন্তু এই চৈত্র মেলা নিরবচ্ছিন্ন স্বজাতীয় অনুষ্ঠান, ইহাতে ইউরোপীয় দিগের নামগন্ধ মাত্র নাই, এবং যে সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রদর্শিত হইবে; তাহাও স্বদেশীয় ক্ষেত্রে, স্বদেশীয় উদ্যান, স্বদেশীয় ভুগর্ভ, স্বদেশীয় শিল্প, এবং স্বদেশীয় জনগণের হস্ত সম্ভুত, স্বজাতির উন্নতি সাধন, ঐক্য স্থাপন এবং স্বাবলম্বন অভ্যাসের চেষ্টা করাই এই সমাবেশের একমাত্র পবিত্র উদ্দেশ্য।[২]

এই মেলার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কত ব্যাপক ছিল, তা জানা যায় মনোমোহনের নিম্নোদ্ধৃত বক্তৃতার অংশ থেকে :

যে শিল্পী, যে কৃষক, যে উদ্যানপালক, যে মন্ত্রী, যে গায়ক, যে পাইক; যে পালওয়ানকে আজ অনুরোধ করিয়া ডাকিয়া আনিতে হইল, এবং যে সকল দ্রব্য সামগ্রী লোকের বাটী বাটী গিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইল ; যখন দেখিবেন সেইসকল লোক ও সেই সমূহ দ্রব্যসম্ভার আপনা হইতেই আসিতেছে—যখন দেখিবেন ঢাকা ও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ, কাশী ও কাশ্মীরের কারুগণ, জয়পুর

---

১. দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলার বক্তৃতা—মনোমোহন বসু ; চৈত্রসংক্রান্তি, শনিবার ১৭৮৯ শক।

২. তদেব।

ও লক্ষ্নৌয়ের ভাস্করগণ, চণ্ডালগণ ও কুমারটুলির কুমারগণ, পাটনার কৃষকগণ, অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে উত্তর ও দক্ষিণের পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সম-ব্যবসায়ী, সমশিল্পী এবং সমবিদ্য গুণিগণ এই চৈত্রমেলার রঙ্গ-ভূমিতে আপনা হইতে আসিয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে – যখন দেখিবেন তাহারা এই মেলার প্রদত্ত প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার-কে অমূল্য ও অতুল্য গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছে—যখন দেখিবেন এই মেলাকে স্বজাতীয় গৌরবভূমি বলিয়া সকলের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখন জানিবেন এই নব রোপিত বৃক্ষের ফললাভ হইল। সেই শুভকাল আসা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে হইবেক—ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে হইবেক। একদিনে কিছুই হয় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে বৃহদ্ব্যাপার মাত্রই অল্পে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।…আসুন আমরা মিলিত হই! জননী জন্মভূমি অধিকতর আপনাদের আদেশ করিতেছেন তাঁহার দুঃখ বিমোচনে অসগ্রর হউন!…পূর্ব্বে স্বদেশ-বাৎসল্য-ধর্ম্ম হিন্দু জাতির প্রাণাধিক প্রিয় পদার্থ ছিল, এখন দুর্ভাগ্য ক্রমে অনৈক্য দুর্গের অজ্ঞানতা অন্ধকূপে অবরুদ্ধ আছে, তাহার সেই বন্ধন-দশা বিমুক্ত করিতে চেষ্টা করুন! চেষ্টা করিলে কখনই ব্যর্থ হইবে না![1]

এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে চৈত্র বা হিন্দুমেলার কার্যক্রম পুরোপুরি আরম্ভ হয়। মেলা-পরিচালকেরা জাতীয় জীবনকে সজীব করতে উদ্বুদ্ধ হলেন। আত্মিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে এঁদের দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। এ বিষয়ে উৎসাহদানের জন্য মেলার কর্মকর্তারা শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পারিতোষিক দিতেন। মেলায় সংস্কৃত রচনা, কবিতা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ এবং শরীরচর্চার অঙ্গ হিসাবে কুস্তি ইত্যাদি প্রদর্শিত হত। মূলতঃ মেলায় স্বদেশীয় চারু ও কারুশিল্পের সমাবেশ ও বিভিন্ন স্বদেশীয় কুস্তি ও কসরৎ প্রদর্শন মেলার বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। এছাড়া মহিলাদের হস্তনির্মিত শিল্পকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। মনোমোহন বসু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান বক্তা ছিলেন। হিন্দুমেলার আদর্শে বারুইপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে জাতীয় মেলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ১২৭৬ বঙ্গাব্দ থেকেই কলকাতার মেলার আদর্শকে অনুকরণ করে বারুইপুরের মেলা আরম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের সভাপতিত্বে জাতীয় মেলার তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বেলগাছিয়ার ডনকিন সাহেবের উদ্যানে। এই অধিবেশনে (১২৭৮, ৩০ ফাল্গুন) মনোমোহন প্রধান বক্তা ছিলেন। এই মেলায় প্রদর্শিত মহিলাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে প্রধান বক্তা মনোমোহন বলেন:

মেলাস্থলে প্রদর্শয়িতব্য দ্রব্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যখন জাতিসাধারণের

১. দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলার বক্তৃতা—মনোমোহন বসু, চৈত্র সংক্রান্তি, শনিবার ১৭৮৯ শক।

উন্নতি প্রার্থনীয়, তখন স্বজাতীয় শিল্পিগণের হস্তসম্ভূত ও যন্ত্রসম্ভূত দ্রব্যাদি প্রদর্শন করাই সর্ব্বাগ্রে উচিত। আমাদের রমণীগণ বিলাতী আদর্শানুবর্ত্তিনী হইয়া যে সকল সূচিকর্ম্ম ও সামান্য সামান্য কারুকার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন এবং যে সকল ইউরোপীয় প্রতিরূপ দেখিয়া চিত্র করিতে শিখিতেছেন, তাহার প্রদর্শন দ্বারা সম্যক্ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ব্যবস্থার পক্ষে সেই সকল শিল্পকর্ম্মের উপযোগিতা অতি অল্প—না সংসারের কাজে লাগে, না সমাজের উপকারের আইসে…যাহাদিগের পূর্ব্ব সমাজ ও পূর্ব্ব সভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত। এবং যদি বিদেশীয় এমন কোনো কারুকার্য্য থাকে, যাহা আমাদের সংসারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সুষমা ও রুচিবর্দ্ধক, তবে তাবন্মাত্রকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুধু স্ত্রী শিল্পী কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটি আমাদের অনুকরণীয় বটে কিন্তু কার্য্যসাধন প্রণালী ও ঘর সংসারের রীতিনীতি সম্যক্ গৃহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন গৃহসজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশ্যেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্পবিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নব যৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে।

এই অধিবেশনে মনোমোহন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে সামাজিকতার প্রচলিত অর্থ ছাড়া ;জাতীয়তাবোধ' অর্থাৎ 'স্বাজাত্যবোধ বা স্বধর্মের উন্মেষ'—এই হল মেলার লক্ষ্য। তিনি এসম্বন্ধে বলেন ঃ

সামাজিক উন্নতি বলাতে সমাজের নিয়মাদি পরিবর্ত্তন অথবা নূতন প্রথা প্রচলন দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্য নহে; সাধ্যায়ত্তও নহে। সমাজবন্ধন দৃঢ় করা এবং সামাজিকতার নষ্টোদ্ধার করাই যার অভিপ্রায়। …স্বজাতীয় সকল শ্রেণীস্থ লোকের একত্র অধিবেশন, পরস্পর সৎসম্ভাষণ,পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের মনোগত ভাব বিনিময়, গত সম্বৎসর মধ্যে সমাজের কি বা উন্নতি আর কি বা অনুন্নতি হইয়াছে তদালোচনা পূর্ব্বক উন্নতিকে উৎসাহ দেওয়া আর অনুন্নতিকে নিরুৎসাহ করা এবং স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতীয়ের অনুরাগ বর্দ্ধন ও স্বজাতীয় শিল্প সাহিত্যাদির প্রতি সমুচিত আস্থা জন্মাইয়া দেওয়া যখন মেলার কার্য্য হইল, তখন এই মেলা যে সামাজিকতা উদ্ধারের যোগ্য এবং স্বাবলম্বনরূপ অমূল্যনিধির আকরস্থল হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আলোচ্য তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলায় 'মেলার কর্ত্তব্য-বিষয়ক ও উৎসাহসূচক বক্তৃতা'য় মনোমোহন প্রথমে প্রদর্শনের সামগ্রী, দ্বিতীয় শারীরিক বল-বিধান, তৃতীয় সামাজিক উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

হিন্দুমেলার চতুর্থ অধিবেশন (১৮৭০ খ্রী.) চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্ত্তে মাঘ-সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়।[১] শুধু তাই নয় এ বৎসর থেকে 'চৈত্রমেলা' নাম পরিবর্ত্তন করে 'হিন্দুমেলা' নাম গ্রহণ করে। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সম্পাদকীয় প্রস্তাবে বলেন ঃ

> অদ্যকার এই যে অপূর্ব সমারোহ ইহা এতদিন পরে ইহার প্রকৃত নাম ধারণ করিয়াছে ; ইহা হিন্দুমেলা নামে আপনাকে লোক সমক্ষে পরিচয় দিতেছে ; বিহঙ্গশাবক যেমন অল্পে অল্পে আপনার বল পরীক্ষা পূর্বক ক্রমে উচ্চতর নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইতে সাহসী হয়, সেইরূপ প্রথমে জাতীয়মেলা চৈত্রমেলা এইরূপ অস্ফুট শব্দ আমাদের প্রাণে আনন্দ বর্ষণ করিয়াছিল, এক্ষণে "হিন্দুমেলা" এই সুস্পষ্ট নাম দ্বারা মেলার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে।[২]

বেলগাছিয়ার আশুতোষ দেবের উদ্যানে হিন্দুমেলার চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১২ ও ১৩ ফেব্রুআরি ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। এই মেলায় ইংরাজ, হিন্দুস্থানী, বাঙালী ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক অংশ গ্রহণ করে। এই চতুর্থ বৎসরের মেলার সমালোচনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়,—"এটি ক্রমে ইংরাজ মেমদিগের ফ্যান্সি ফিয়ারের ন্যায় একটি আমোদের স্থান হইয়া উঠিয়াছে।" চতুর্থ অধিবেশনে মনোমোহন কোন বক্তৃতা করেন নি।

নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানবাড়িতে ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুআরি ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর থেকে মেলা মফঃস্বলে প্রসার লাভ করে। যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন ঃ

> …নবগোপাল মিত্র মহাশয় চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বারুইপুরে স্থানীয়

১. 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র বাগল সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৬ ফেব্রুআরি ১৮৭০) থেকে উদ্ধৃতি সহযোগে লিখেছেন—১৮৬৭ খৃস্টাব্দে গবর্নমেণ্ট চড়ক পুজোয় পিঠ ফোঁড়া, বাণ ফোঁড়া প্রভৃতি শারীরিক কষ্টদায়ক প্রথা সকলি তুলিয়া দিলে, এই সময় হইতে তদ্বিনিময়ে চৈত্র মেলার সূত্রপাত হয়।

"কলিকাতার সুসভ্য যুবকবৃন্দ গাজন পর্ব্বের বিনিময়ে সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃঃ হইতে চৈত্রমেলা বাহির করিয়াছিলেন…

"যখন চড়ক পর্ব্বের বিনিময়ে চৈত্র মেলার সৃষ্টি হইয়াছে, তখন এ বৎসর একেবারে তাহার নাম ও দিন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। লোকের কষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রসঙ্গত পর্ব্বদিন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।"—পৃ. ১৯২

২. হিন্দুমেলার বিবরণ—শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-সংকলিত ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; পৃ. ১০৩।

জমিদারগণের সহায়তায় একটী জাতীয় মেলা স্থাপন করেন। এ বৎসর ১লা হইতে ৭ই মে পর্যন্ত দিনাজপুরে রাজবাটীতে সম্মুখস্থ ময়দানে কলিকাতার জাতীয় মেলার আদর্শে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিবিধ কৃষিদ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য এখানে প্রদর্শিত হয়। বিদেশী দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইয়াছিল। কৃষক ও শিল্পীদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিয়াছিল তাঁহাদিগকে পাঁচশত পরিমিত পারিতোষিক প্রদান করা হয়। উভয়ত্রই মেলা কয়েক বৎসর চলিয়াছিল।[১]

১৮৭২ সালের ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুআরি এই তিনদিন হিন্দুমেলার ষষ্ঠ অধিবেশন শুরু হয় রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের কাশীপুরের বাগানবাড়িতে। গত বৎসরের মত এ বৎসরও মেলা মাঘ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার সাধারণ সভার সভ্য নির্বাচিত হন—বর্ধমানের মহারাজা, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিজয়কেশব রায়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, দুর্গাচরণ সাহা, হীরালাল শীল, কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন যথাক্রমে কুমার স্বরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।[২]

মেলার প্রথম দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজা কমলকৃষ্ণ দেব। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, ঈশানচন্দ্র বসু, বাণীনাথ নন্দী প্রমুখ সাহিত্যিক সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। এ মেলায় মনোমোহন বসু 'হিন্দুমেলার উৎসাহ-সূচক বক্তৃতা' করেন। অনন্য বারের ন্যায় এবারেও তিনি মেলার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান ঃ

পুনর্মিলন মাত্রই সুখজনক। তাহাতে এরূপ মিলন যে কত সুখের তাহা বলা যায় না। সম্বৎসর পরে আজ আমরা পুনর্ব্বার মিলিত হইলাম, অতএব আজ কি সুখের দিন, নানাপ্রকার বাসন্তী পক্ষীগণ অন্য ঋতুপতি বসন্ত সমাগমে কুঞ্জবনে সকলে মিলিত হইয়া কাকলিরূপ যেমন আনন্দ প্রকাশ করে! সেইরূপ, বিবিধ শ্রেণীর বিবিধ জীবন পথালম্বী আমরা গত দ্বাদশ মাস কে কোথায় থাকি, কে কি করি, পরস্পর তাহা কিছুই জানিনা, অদ্য চতুর্দ্দিক্ হইতে জগন্নাথের রথোৎসব-দর্শনার্থী তীর্থযাত্রীর ন্যায় এই মহাতীর্থে এই আনন্দ কুঞ্জধামে এই মহা মেলায় একত্রীভূত হইলাম।

...কলিকাতায় যে সকল মহাশয়কে সামাজিক ও রাজকীয় ব্যাপারে এবং অন্যান্য অনেক উচ্চ বিষয়ে অগ্রবর্তী অথবা মধ্যবর্তী দেখা যায় কৈ তাঁদের অনেকের উদ্যমগামী উৎসাহশীল বন্ধন তো এস্থলে দেখিতে পাইতেছিনা? প্রদেশ মধ্যে

১. হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত—যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ২৬-২৭।
২. তদেব ; পৃ. ২৮-২৯।

তাঁহাদিগের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা দক্ষতা ও অধ্যক্ষতা জজ মাজিস্ট্রেটাদির মনোরঞ্জক কার্য্যে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান দেখা যায়—রাজপুরুষেরা কোন মেলাদি ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহারা অর্থে সামর্থ্যে স্বতঃ পরতঃ প্রাণপণে লাগিয়া থাকেন, কৈ ? তাঁহাদের কয়জনের শুভাগমন অদ্য হইয়াছে বা অন্যবারে হইয়া থাকে ? আগমনের যদি প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তবু তো সাহায্য প্রদানের বাধা নাই।

…অনেকের বিরতির শ্রেষ্ঠ কারণ এবং দেশের দুর্ভাগ্যেরও প্রধান কারণ এই যে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা যে বিষয়ের অনুষ্ঠাতা নন, যে কর্ম্মে উৎসাহী নন, যাহাতে লিপ্ত নন, তাহাতে লিপ্ত হইতে অনেকের বড় একটা রুচি হয় না। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের অন্তস্তল মধ্যে অজ্ঞাতসারে এরূপ একটী ভাব নিহিত আছে, যে রাজা বল, সভ্যবল, কৃতী বল, পুরুস্কর্ত্তা বল প্রভুবল, যাই বল, সব হলেন ইংরাজ। তাহারা যাহা করিলেন না, যাহা দেখিলেন না, যাহা শুনিলেন না, যে কাজ করিয়া কি লাভ হইবে ? ইংরাজের অজানিত হইয়া দেশে সৎকর্ম্মা রূপে পরিচিত হইলেই বা কি কাজ দর্শিবে ? যে অবস্থায় সুমেরু সমান স্বর্ণ-দান করিলেও পুরুষার্থ নাই ; তাহাতে রাজাবাহাদুর রাজা অথবা ষ্টার অব্ ইন্ডিয়া উপাধি পাইবার কিছুমাত্র সোপান নাই ; কাজে কাজেই সেরূপ কর্ম্মে তাঁদের মতে তাঁদের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হয়, অর্থদান অনর্থ হয় ; আনুকূল্য মাত্রই ভস্মে ঘৃতাহুতি হয়। তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ অসৌজন্যময় দোষারোপ বাক্য বিশেষ হেতু ভিন্ন আমরা যদৃচ্ছাতে বলিতেছি না। যদি তাঁহাদের মনের গতি এইরূপ না হইবে, তবে যে সকল সমাজ চূড়ামণি খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিবসে গুপ্ত বৃন্দাবনের মেলা স্থলে গিয়া থাকেন ; এই মেলাস্থলে তাঁহাদের মধ্যে কোনো কোনো মহাশয়ের পদার্পণ এবং কিঞ্চিৎ মাত্রও চিত্তার্পণ হয় না কেন ?

ইংরাজ শাসনে দেশের যে উন্নতি সে উন্নতিতে এ দেশীয়দের কি এসে যায় ? ভারতবর্ষে কলের গাড়ি, কলের জাহাজ, কলের জল, কলের নলে গ্যাস জবালা, কলের তারে সংবাদ আদান-প্রদান ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উন্নতি হচ্ছে। শহরে সুরম্য অফিস, কাছারি এসবে আমাদের কি অধিকার ? মনোমোহন নববঙ্গকে উদ্দেশ করে বললেন :

ওহে অহংবাদি সভ্যতাভিমানি নববঙ্গ ! তোমরা কিসের বড়াই করিয়া বেড়াও ? তোমরা বাক্যাড়ম্বর ভিন্ন আর কি কাজের যোগ্য ? তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষ অপেক্ষা তোমরা উন্নত হইয়াছ, একথা কোন্ সাহসে ব্যক্ত কর। যে ইংরাজ জাতির দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছে, ইহা তাহাদের উন্নতি, তোমাদের কি ? শ্রীফল পক্ক হইলে বায়সের কি ? তাঁহারা স্বদেশে উন্নতির সঙ্গে বাস করেন, এখানে ও সেই উন্নতিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্বদেশে এবং অধীন দেশে, উভয় স্থানেই আপনারা আরো উন্নত হইতেছেন, তোমরা কেবল সাক্ষীগোপাল।

তোমরা কেবল দর্শক আর স্তুতিবাদক বৈ আর কি? সুতরাং তোমাদের উচ্চে উত্থান হইল কৈ? তোমাদের প্রখর বুদ্ধিরূপ সুতীক্ষ্ণবাণ আছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞাননামা রাধাচক্রের সুক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া লক্ষ্য ভেদ না করিতে পারিলে যে বুদ্ধি থাকাতে ফল কি?

দেশের অধিকাংশ বিত্তশালী ব্যক্তিরা এই মহৎ কর্মে যোগ না দেওয়ায় মনোমোহন ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রথমেই তাঁদের উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ শ্লেষ হানেন। এই বক্তৃতার শেষাংশেও আক্রমণের মূল লক্ষ্য দেশের ধনী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ঃ

আয়রে সৌভাগ্যশালি প্রিয় পুত্রগণ! আয়রে আমার ধনকুবের প্রধান সন্তানগণ! আয়রে রাজ্যাধিকারি ভুম্যাধিকারি কৃতজ্ঞ কৃতি পুত্রগণ। যদি ভাগ্যক্রমে ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে সৌভ্রাত্রবন্ধনের আর একতা রূপ অতুল্য একাবলিহার ধারণের সুযোগ পাইয়াছ, তবে বৎসগণ! বৃথা অভিমান, অনর্থ গর্ব্ব, সর্ব্বনাশক ইন্দ্রিয়াসক্তির বশীভূত আর থেকো না! স্বদেশানুরাগকে তোমাদের পথপ্রদর্শক কর, তিনি অচিরে নির্ম্মল আনন্দ মন্দিরে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন। হায় বৎস। তোমাদের প্রতিই তোমাদের অভাগ্যবতী জননীর অধিক আশা ভরসা— মধ্যস্থাবস্থা তোমাদের কনীয়ান ভ্রাতারা যেরূপ মাতৃভক্তি পরায়ণ, আর বাসনা ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যেরূপ সুযোগ্য, তাহাদের যদি সেইরূপ সম্পত্তিবল, সম্ভ্রমবল, প্রভুত্ববল থাকিত, তবে বৎস! কোন চিন্তার বিষয়ই হইত না! তোমরা সহায় না হইলে তাহারা কি করিতে পারে! তোমরা অবল হইলে তাহারা অসাধ্য ও সাধন করিতে পারিবে—যন্ত্রাস্ত্রে সকল বিঘ্নের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ফেলিবে! অতএব প্রাণ প্রতিম প্রিয়তম সন্তানগণ! আর ঔদাস্য নিদ্রায় অচেতন রহিও না; জননীর দুঃখ বর্জ্জনে আর বিলম্ব করিও না; জাগরূক হও—উত্থান কর—চক্ষুরুন্মীলন কর—পবিত্র প্রতিজ্ঞা জলে অভিষিক্ত হও—স্বাবলম্বন রূপ বসন পরিধান কর—ঐক্যরূপ শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধর আশারূপ আসাগাছটি করতলে লও—ভ্রান্তি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিস্তীর্ণ কর্ম্মভূমিতে অবতীর্ণ হও—চাহিয়া দেখ, প্রভাত হইয়াছে— শ্রবণ কর, স্বজাতি কুঞ্জের গৌরব শাখীতে ভর করিয়া কর্তব্য কোকিল, উৎসাহ শুক, আর উত্তেজনা শারী জয়জয়ন্তী তালে গান করিতেছে—নববঙ্গের নবোদ্যম কুসুমের যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে—নবোদ্ভিন্ন সুশিক্ষারূপ সুপক্ষধারী সুপবিত্র-চেতা ছাত্রপুঞ্জ মধুকর-শ্রেণী রূপে গুঞ্জরব করিয়া কুঞ্জবনে আসিতেছে—আবার বৃক্ষের অন্তরালে দৃষ্টি কর,

"সৌভাগ্য অরুণ"

তরুণ বেশে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছে! তাহার শোভা দেখাইবার জন্য তোমরা তোমাদের সকল ভ্রাতাকে একত্র কর; সেই অরুণের আশ্চর্য্য আলোক

দেখিয়া পুলক পাইয়া এই ভারত-লোকবাসী সকলেই শব্দ করুক "জয় জয় জয়!" হিমাচলের পবিত্র গিরিগুহা হইতে প্রতিধ্বনি হউক "জয় জয় জয়!" আকাশে শব্দ হউক "জয় জয় জয়!"

"হিন্দু মেলার জয়!"
"হিন্দু মেলার জয়!"
"হিন্দু মেলার জয়!"

মেলার শেষ দিনে লর্ড মেয়োর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেলে মেলার অধিবেশন অকস্মাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লর্ড মেয়োর মৃত্যু সংবাদে গভীর শোক প্রকাশ করে বক্তৃতা করেন।

হিন্দুমেলার সপ্তম অধিবেশন (১৫-১৭ ফেব্রুআরি ১৮৭৩) পাইকপাড়ার নৈনানে হীরালাল শীলের বাগানে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনের পূর্বে সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্রের স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল। এই প্রসঙ্গে মধ্যস্থে লেখা হয়:

আগামী ৬ই ও ৭ই ফাল্গুন পাইকপাড়ার উত্তরে নৈনান নামক স্থানে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল শীল মহাশয়ের বাগানে ঐ মেলা (হিন্দুমেলা) হইবেক। সহকারী সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় এক সাধারণ বিজ্ঞাপন দ্বারা শিল্পী, মালী, কৃষক এবং অন্যান্য প্রকার কারুকর ও ব্যবসায়ীগণকে স্বীয় স্বীয় ক্ষেত্রে উদ্যম ও হস্ত সম্ভূত দ্রব্যজাত প্রদর্শনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রথম দিবসের প্রাতঃকালে উক্ত বাগানে লইয়া যাইতে হইবে। অন্যান্য সামগ্রী ৪ঠা ফাল্গুনের পূর্ব্বে করণ্‌ওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৩ নং ভবনে উক্ত মিত্রজ মহাশয়ের নিকট দিয়া রসিদ লইতে হইবেক। অনিবার্য্য দৈব ঘটনা ব্যতীত আর যে কোন কারণে কাহার কোনো দ্রব্যাদির অপচয় বা ক্ষতি হইবে, উক্ত মহাশয় তাহার দায়ী থাকিবেন এবং ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন। বিনা রসিদে কেহ কিছু লইয়া গেলে তাহার জন্য দায়ী হইবে না। মেলায় অধ্যক্ষগণ প্রদর্শিত দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া পুরস্কার দান করিবেন। প্রদর্শিত দ্রব্যের মধ্যে যাহার যাহা বিক্রয় করিবার আবশ্যক সেই জিনিষের উপর ন্যায্য দর লিখিয়া দিবেন। অনেকে ভ্রম বশতঃ বেশী দর দেওয়াতে বিক্রয় হয় না। মফঃস্বলের প্রদর্শনেচ্ছু কেহ আরো বিশেষ জানিতে চাহিলে উক্ত মহাশয়ের নিকট অথবা আমাদিগকে পত্র লিখিলেই জ্ঞাত হইবেন।

দেশীয় যন্ত্রালয় সমূহ যে সকল সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক, মানচিত্র ও খোদিত চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে তাহার প্রচার ও বিক্রয়ার্থ একখন্ড প্রদর্শিত হইবে। অতএব গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণের উচিত তৎপক্ষে মনোযোগী হয়েন। যে সকল

মহাশয় জাতীয় সভায় গ্রন্থোপহার দিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতা সহকারে গৃহীত ও সমালোচিত হইবে।[১]

সপ্তম অধিবেশনের প্রথম দিনের অনুষ্ঠান মেলার সাহায্যদাতাদের ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়, সভাপতিত্ব করেন কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। প্রারম্ভিক ভাষণের পর অন্যতম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পূর্ব বৎসরের কার্য-বিবরণ পাঠ করেন। এ সম্পর্কে মধ্যস্থে 'হিন্দু মেলা' শীর্ষক সংবাদে লেখা হয়ঃ

> সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিজ্ঞাপনী ও সাধারণ সামাজিক বার্ষিক বিবরণাদি পঠিত হইল। তাহাতে যে যে বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক। কেবল দুই একটি বক্তব্যের কিছু রূপান্তর হইলে ভাল হইত। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমানী ও বাবু গোপালচন্দ্র পাল মহাশয়দ্বয়ের প্রতি বাধ্যতা স্বীকারকালে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হওয়া অনেকের মতে আবশ্যক ছিল। কেননা প্রথমোক্ত বাবু শিল্প প্রদর্শন বিভাগে যে প্রকার প্রগাঢ় যত্ন ও বিশেষ যোগ্যতা সহকারে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম ও কার্য্যের উল্লেখ কিছু বিশেষরূপে অগ্রবর্ত্তী হওয়া প্রার্থনীয়।[২]

পরদিন রবিবার রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের পৌরোহিত্যে সাধারণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্পাদক পূর্ব বৎসরের মেলা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সভায় পাঠ করেন। পরে সভাপতির আহ্বানে মনোমোহন 'হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক'[৩] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মনোমোহনের প্রবন্ধ পাঠকালে সভায় প্রচণ্ড গোলমাল হয়। 'মধ্যস্থ' পত্রিকার বিবরণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য ঃ

> সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বাবু মনোমোহন বসু 'হিন্দু আচার ব্যবহার, দ্বিতীয় ভাগ—সামাজিক' ইতি প্রসঙ্গের প্রবন্ধখানি পাঠ করিলেন। কিন্তু সভা-গৃহের স্থান সংকীর্ণ, ক্রমে বহুলোকের সমাবেশ দ্বারা অত্যন্ত গোল হইতে লাগিল। এমন গোল যে আর পাঠ করা দুরূহ। শেষে অতি উচ্চৈস্বরে বিবৃত হওয়াতে গোল থামিল, কিন্তু অত উচ্চৈরবে মানুষ কতক্ষণ বলিতে পারে? এজন্য মধ্যকার কিয়দংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমোদ আহ্লাদ অর্থাৎ হিন্দুদিগের গীতবাদ্য ক্রীড়া কৌতুক ও পান দোষ ঘটিত শেষ পরিচ্ছেদটি বলিয়া উপসংহার করা হইল।[৪]

বক্তৃতা মঞ্চের পাশেই অন্যান্যবারের মত এবারও দেশজ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এবারের মেলার বিচারক ছিলেন যথাক্রমে গুণেন্দ্রনাথ

১. মধ্যস্থ, ২৭ মাঘ ১২৭৯ ; পৃ. ৭২৭-২৮।

২. মধ্যস্থ, ৫ ফাল্গুন ১২৭৯ ; পৃ. ৭৫৮।

৩. এ সম্পর্কে মধ্যস্থ পত্রিকায় লেখা হয়—'প্রথমভাগে পারিবারিক, দ্বিতীয়ভাগে সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবৃত হইবে। প্রথমভাগ আশ্বিন মাসে পাঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ভাগ আগামীকল্য হিন্দুমেলার সভায় পাঠ করিবার কল্পনা আছে'—মধ্যস্থ; ৫ ফাল্গুন ১২৭৯ ; পৃ. ৭৩৪।

৪. মধ্যস্থ, ৫ ফাল্গুন ১২৭৯ ; পৃ. ৭৫৯।

ঠাকুর ও নীলকমল মুখোপাধ্যায়। পুরস্কার বিতরণ করেন রমানাথ ঠাকুর। এবারও ব্যায়াম ও কুস্তির বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কিন্তু আকস্মিক গণ্ডগোলের জন্য কুস্তি-কসরৎ দেখান সম্ভবপর হয়নি। এ সম্পর্কে মধ্যস্থে প্রকাশিত সংবাদটি উদ্ধারযোগ্য :

> বেলা সাড়ে ৪||০টার সময় খেলা ও তরবারি খেলা আরম্ভ হইল এবং তৎপরে ব্যায়াম ও সোমনাথের কেল্লা-ভঙ্গ ইত্যাদি হওনের কথা ছিল। তদ্দর্শনে অনেকেই টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন ও বহু বহুলোক করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এমতকালে সুসভ্য বাঙ্গালী মহাশয়েরা (অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিম্নশ্রেণীর সংযোগ) পর্দ্দা, খুঁটি ও বেড়া ভাঙ্গিয়া একেবারে ২০০০/৩০০০ হাজার লোক হুড়মুড় করিয়া ভিতর প্রবিষ্ট হইল: পুলিশের এত লোক কিছুই করিতে পারিল না; ব্যায়াম ফ্যায়াম সব অধঃপাতে গেল। লাভে হইতে যে ভদ্রলোকেরা টিকিট কিনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের টাকা গেল। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম, যে, "গিজনীর মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথের দুর্গাক্রমণ" দেখার জন্য ||০ আনা না কি একটাকা করিয়া যেমন দিয়াছেন, তেমন বেড়া ভাঙ্গা রূপ কেল্লা মারা কাণ্ড আপনাদের দেখা হইল—বাঙ্গালীর এত বীরত্ব, একি সাধারণ কথা? এ দৃশ্যের মূল্য লক্ষ টাকা হইলেও যথেষ্ট হয় না।[১]

এরূপ অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য মধ্যস্থ মেলা কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করে।[২] মধ্যস্থের এই পরামর্শ কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর

১. মধ্যস্থ, ৫ ফাল্গুন ১২৭৯; পৃ. ৭৬১।

২. 'আমরা এই মেলার অত্যন্ত হিতাভিলাষী, ইহার কোনোরূপ আভ্যন্তরিক গোলমাল হইলে আমাদের মনে বড় দুঃখ হয়। এজন্য নিম্নে কয়েকটী সুব্যবস্থার নামোল্লেখ করিতেছি, ভরসা করি অধ্যক্ষ মহাশয়েরা আগামী বর্ষের নিমিত্ত তৎপ্রতি চিত্তার্পণ করিবেন।

১। কলিকাতার অতি নিকটে কোন স্থানে মেলা হওয়া বড় আবশ্যক। আমরা জানি স্থানাভাবেই অতদূরে হয়, কিন্তু যাহাতে নিকটস্থান পাওয়া যায় তাহা যেরূপ হউক করিতে হইবেক।

২। গৃহমধ্যে মেলার সভা না হইয়া পাইল টাঙ্গাইয়া প্রসারিত স্থানে হওয়া আবশ্যক।

৩। মেলার কিছুমাস পূর্ব্বে হইতে দেশ বিদেশীয় জমিদার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অনুরোধ করিয়া যেখানে যে দ্রব্য উত্তম জন্মে, তাহার সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়, নতুবা একটি দ্রব্য দর্শনে লোকের সন্তোষ ও উপকার হইতে পারে না। দশজনকে অনুরোধ করিলে অন্ততঃ চারিজনও মনোযোগী হইবেন।

৪। কুমারটুলীর কারিগরগণ দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ এবং শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৌরাণিক প্রতিরূপ গঠিত হওয়া আবশ্যক। যাহা এবারে হইয়াছে তাহা অল্প ও তন্মধ্যে বিবেচনা ও রুচির দোষ আছে। চিত্র বিষয়ে আমাদের বলিতে হইবেক না। আপনাপনা হইতে উন্নতি দেখা যাইতেছে।

৫। নাটক ব্যায়ামাদির টিকিটের মূল্য কম করা উচিত।

৬। আবর্ত্তনও সুদৃঢ় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং এবার যেমন ভিতরে পাহারা ছিল তৎপরিবর্ত্তে বাহিরে পাহারা দেওয়ানো উচিত।

৭। রায়বাঁশ, ঘোড়দৌড়, নৌকাদৌড়, বেদিয়ার উচ্চপ্রকারের খেলা, উচ্চ স্বরবান্ গায়কের দ্বারা গান, ইহার মধ্যে অধিকাংশ বা সমুদয়ের সমাবেশ বড় আবশ্যক।—মধ্যস্থ, ৫ ফাল্গুন ১২৭৯ পৃ. ৭৬২।

হয়েছিল বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে—কারণ পরবর্তী অধিবেশনে এরকম কোন গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায় না।

জাতীয় নাট্যশালার অভিনেতারা মেলায় 'ভারতমাতার বিলাপ' নাটকের অভিনয় করেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়—'এবার হিন্দু মেলাতে নেশন্যাল থিয়েটার যখন 'ভারত মাতার বিলাপ' অভিনয় করিলেন, তখন শ্রোতৃবর্গমাত্র অশ্রুপতন করেন।' এই মেলার তৃতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন রাজনারায়ণ বসু। তাঁর সভাপতিত্বে সীতানাথ ঘোষ "বঙ্গের সংক্রামক জ্বরের কারণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

হিন্দু মেলার পরবর্তী অধিবেশনগুলি কলকাতার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পার্শীবাগানে ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুআরি ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে, মাঘ সংক্রান্তিতে। মধ্যস্থ থেকে জানা যায়:

এ বৎসর মাঘ-সংক্রান্তি বুধবার দিবসে মেলার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত ছিল। অন্যান্য বারে নগরের বাহিরে কোনো দূরস্থ উদ্যানে মেলা হইত, এবারে শহরের মধ্যে মুজাপুরস্থ বিখ্যাত পার্শীবাগানে তাহা হওয়াতে সাধারণের পক্ষে বড় সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু আট আনা হারে প্রবেশ-টিকিট ক্রয়ের নিয়ম হওয়াতে অন্যান্য বারের ন্যায় তত লোক হয় নাই। এই বিষয়টি লিখিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। এই রাজধানীস্থ জনগণের মধ্যে এমন লোক কয় জন আছেন, যাঁহারা আট আনা ব্যয় করিতে অক্ষম? অন্যান্য বৎসর বিস্তর গাড়ী ভাড়া লাগিত, এ বৎসর তাহা বাঁচিয়া গেল, তথাপি স্বজাতীয় অনুষ্ঠানের আনুকুল্যে আট আনা পয়সা দিতে স্বজাতীয় মহাশয়েরা কাতর, ইহার অপেক্ষা লজ্জাকর ও অযশস্কর কথা আর কি? যে জাতির মধ্যে আপনাদিগের সাধারণ হিতকার্য্যে এত দূর অনীহা, সে জাতির শুভ প্রত্যাশা কি শীঘ্র করা যাইতে পারে।…তথাপি সহস্র সহস্র মহাশয়েরা যে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ইহাই পরম ভাগ্য…

প্রথম দিনের অপরাহ্নে জাতীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন সেই স্থলেই হইয়াছিল। তাহাতে আগামী বর্ষের নিমিত্ত নিম্নলিখিত রূপে অবৈতনিক সম্ভ্রান্ত কর্মচারী সমূহ মনোনীত করা হইল। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর অধ্যক্ষ সভার সভাপতি, এবং রাজা চন্দ্রনাথ রায়; বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু রাজনারায়ণ বসু সহকারী সভাপতি; বাবু নবগোপাল মিত্র ও বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত এম. এ, সম্পাদক, বাবু ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় তথা বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংশ্লিষ্ট সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন।

শনিবার দিবসীয় মেলায় নবগোপাল বাবু গত বৎসরের প্রধান প্রধান সামাজিক ঘটনা বিবৃত করেন। এবং অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয় কর্তৃক "বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ও তন্নিবারণ উপায়" সম্বন্ধে একটী

প্রবন্ধ পঠিত হয়। তৎপরে রাজনারায়ণ বাবু মেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঘটিত একটী বক্তৃতা করেন।

রবিবার যে বৃহতী সভা হয় তাহাতে রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুরের প্রধান আসন গ্রহণের কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে তাঁহার পরিবর্ত্তে বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির কার্য্যনির্বাহ করিলেন। বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত কর্ত্তৃক সংক্ষেপে প্রাপ্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তকাদির বিবরণ লিপির পাঠ হইল।

মন্তব্য লিপি পাঠ সমাপ্ত করা হইলে বাবু মনোমোহন বসু "জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান" প্রসঙ্গে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা বিবৃত করিলেন। …তৎপরে সভাপতি মহাশয় মেলার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা দ্বারা ভবিষ্যতের আশা ও উৎসাহের নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।[১]

'জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান' শীর্ষক বক্তৃতার প্রথমে মনোমোহন ব্যায়াম শিক্ষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন :

ব্যায়াম শিক্ষার তাৎপর্য্য কি? স্বাস্থ্য আর বল—সেই সঙ্গে সাহস ও উদ্যম। প্রথম দুইটী হইতে শেষের দুইটী এবং শেষের দুইটী হইতে জাতীয় ভাবের পরিবর্দ্ধন। এই সৎফলই প্রত্যাশার ধন।

ব্যায়ামচর্চার যথেষ্ট উন্নতি না হলে মানুষের মনে যথেষ্ট সাহসের সঞ্চার হয় না। এ প্রসঙ্গে মনোমোহনের বক্তৃতা থেকে সেকালের কলকাতার চিত্রটি প্রণিধানযোগ্য :

কলিকাতার রাজবর্ত্মে একজন পেন্টুলন টুপিধারী যে হউক, যদি তাড়া করে, তবে পঙ্গপাল ভীরু বঙ্গবাসী অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমানরূপ মহাবীরত্ব দেখাইতে পটু! পঞ্চাশ জন বাঙ্গালী পথিক দেখিল একজন স্বজাতীয়কে বিনা দোষে একজন ইংরাজ কি ফিরিঙ্গী প্রহার করিতেছে; সেই অর্দ্ধ শতের মধ্যে এমন এক প্রাণীও নাই, যাহার হৃদয়ে জাতীয় স্নেহ ও জাতীয় মান সম্বন্ধীয় জাতীয় ভাব জাগরূক হইয়া যে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ প্রহার প্রাপ্ত স্বজাতীয়ের পক্ষে ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়—সেই পঞ্চাশজনের সমবেত চেষ্টায় না হইতে পারে কি? কিন্তু কেমন আমরা জাতীয় ভাবে বর্জ্জিত হইয়াছি, যে ঘটনাস্থলের যত দূরবর্ত্তী হইতে পারি, ততই নিরাপদ হই, ততই সন্তুষ্ট থাকি, ততই আত্মরক্ষা ধর্ম্মকে জগতের সার ধর্ম্ম জ্ঞানে তৎপালন দ্বারা কি একটা মহাপুণ্যের কর্ম্মই করিতেছি,…

এই বক্তৃতায় মনোমোহন বাঙালী জাতির ঐতিহ্য স্মরণ করে বলেন :

আমরা সেই বংশে জন্মিয়া কি এই হইয়াছি? আমরা আবার সভ্যতার বড়াই করি! আমরা যে ইংরাজ জাতির পদলেহক কুক্কুর, সেই ইংরাজ জাতীয় কেহ কি ঐরূপ আচরণ করিয়া স্বীয় সমাজে—স্বীয় স্ত্রীর কাছেও মুখ দেখাইতে পারে? আমরা কি তাহা দেখিয়াও জাতীয় ভাব শিক্ষা করিব না? আমরা কি

১. মধ্যস্থ, ফাল্গুন ১২৮০ ; পৃ. ৭৩১-৩২।

কেবল খানা খাইয়া পেন্টুলন পরিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলি চুষিয়া বোতল বোতল ব্রান্ডি বিষ গলাধঃকরণ করিয়া কুক্কুর পুষিয়া আর আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজীতে "ড্যামহুট" বলিয়া সাহেব হইব ? ব্যায়াম চর্চ্চার প্রবর্ত্তক মহাশয়েরা কি অভিপ্রায়ে তাহার সৃষ্টি করিয়াছেন ? সে কি এই সদুদ্দেশ্যে নয় ? ব্যায়ামের চরম ফল যদি সাহস ও জাতীয় ভাবে পরিণত না হয়, তবে তাহার প্রয়োজন কি ?[১]

'জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলা' সম্পর্কে মনোমোহনের ক্ষোভের কারণ—যে উদ্দেশ্য নিয়ে মেলা শুরু হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্য সর্বাংশে পূর্ণ হয় নি ; যাঁদের উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগ প্রত্যাশিত ছিল তাঁদের অনুপস্থিতি, তাঁদের অসহযোগিতার ফলে মেলার যথোচিত উন্নতি ঘটেনি। ফলে আট বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মেলার শৈশবাবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় মনোমোহন দুঃখ করে বলেন :

মেলার সেই আদ্যাবস্থায় মেলাস্থলে যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন, এত দিনে তদপেক্ষা উচ্চতর ও নূতনতর কিছু কি দেখিতে পান ? কোনো বৎসর কোনো কিছু নূতন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আমার অভিপ্রায় তাহা নহে প্রকৃত প্রস্তাবে নূতন বলা যায়, এমন বস্তু কি কিছু দেখিতে পাইতেছেন ? অর্থাৎ জাতীয় প্রদর্শনভূমির উপযুক্ত প্রদর্শন— প্রথম সূত্রপাতের পর দুই তিন বৎসর যে পরিমাণে উন্নতি হইতেছিল, সেই পরিমাণে প্রদর্শন—ক্রমে ক্রমে স্বজাতীয় সমূহ লোক মিলিত হইয়া ইহাকে মহা অনুষ্ঠানে পরিণত করিবেন বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তদনুযায়ী প্রদর্শন কি হইতেছে ?[২]

হিন্দুমেলার নবম অধিবেশন বসে মাঘ সংক্রান্তিতে (১৮৭৫), মেলা এবারও পার্শীবাগানে অনুষ্ঠিত হয়। এই নবম অধিবেশনে বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি ২৫ ফেব্রুআরি ১৮৭৫ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়। রাজা বদনচাঁদের টালার বাগানে হিন্দুমেলার দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (১৮৭৬, ১৯-২০ ফেব্রুআরি)। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেলায় উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীর মধ্যে ছিল 'আন্দুল নিবাসী গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নির্মিত একটি অক্ষর নির্মাণ ও কাগজ প্রস্তুত করার কল'। দশম অধিবেশনেও মনোমোহন জাতীয় ভাব ও জাতীয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। মনোমোহনের বক্তৃতা সম্পর্কে ২৭ ফেব্রুআরি ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের সাধারণীতে লেখা হয় :

বাবু মনোমোহন বসু একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটি মধুরতাময়, উপদেশপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ইনি হিন্দুমেলার প্রধান উদ্দেশ্য সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। শিক্ষা এবং স্বাবলম্বনই মেলার প্রধান উদ্দেশ্য। সুন্দর সুন্দর কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কৃষকগণকে আহ্বান করিয়া উপযুক্ত মত পুরস্কার প্রদান করিলে, কৃষিবিদ্যায় দেশীয় লোকের বিশেষ যত্ন জন্মাইতে

১. মধ্যস্থ, চৈত্র ১২৮০ ; পৃ. ৭৪৬।
২. তদেব ; পৃ. ৭৪৭।

পারে। একটি সূতার কল মেলায় আনীত হইয়াছিল। উহাতে অল্পায়াসে সঠিক পরিমাণ সূতা অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হইতে পারে। মনোমোহন বাবু এই দুটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া মেলার উদ্দেশ্য সফল প্রতিপন্ন করিলেন। যাহাতে এদেশে কোন বিষয়ে অন্য দেশের মুখাপেক্ষা না করে অর্থাৎ যাহাতে আমাদের দেশে স্বাবলম্বন জন্মে, এই বিষয় বলিতে গিয়া মনোমোহন বাবু এই নির্দ্দেশ করেন যে প্রকৃত দেশহিতৈষী আমাদের মধ্যে নাই। উন্নতির যে যে উপকরণ প্রয়োজনীয়, ভারতে সে সমুদয়ই আছে, একজন মনের মত দেশহিতৈষী নাই। যাঁহারা হিতৈষী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত, দেশহিতৈষী বলিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যাঁহাদের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর দেশহিতৈষী, স্বার্থপর দেশহিতৈষী। সব শেষে মনোমোহন বাবু উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে শিল্পচর্চ্চা করিতে অনুরোধ করেন। ইদানিং ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা দিন দিন অতি মন্দ হইতেছে। দেশের ভাল মন্দ অবস্থা এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে সুতরাং যাহাতে অস্মদেশীয় মধ্যবিত্তগণের অবস্থা উন্নত হয়, এরূপ কোন উপায় বিধান করা আদৌ কর্ত্তব্য। মনোমোহন বাবুর মতে এদেশে শিল্পচর্চ্চা বৃদ্ধি পাইলে, এদেশের লোক স্বাবলম্বন শিক্ষা করিলেই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবস্থা ভাল হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি হইবে। এই মর্ম্মে মনোমোহনবাবু বক্তৃতা শেষ করিলেন।[১]

হিন্দুমেলার একাদশ অধিবেশন (১৮৭৭) থেকে শেষ অর্থাৎ চতুর্দশ অধিবেশন পর্যন্ত মনোমোহনের কোন বক্তৃতার খবর পাওয়া যায় না। একাদশ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত 'দিল্লীর দরবার' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। এই অধিবেশনে নবীনচন্দ্র সেনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়।[২] অষ্টম অধিবেশন থেকেই হিন্দুমেলার ক্রমিক অবনতি ঘটতে থাকে। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে মাঘ সংক্রান্তিতে মেলার সময় পরিবর্তন করার ফলেও অনেকের উৎসাহে ভাটা পড়ে। সুলভ সমাচার (১৮৮০) পত্রিকায় হিন্দুমেলার সমালোচনা করে লেখা হয়েছিল,—"বাঙ্গালীর উৎসাহ খড়ের আগুন।" হিন্দুমেলার অবনতির প্রধান কারণ সেই সময় একাধিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। ইন্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫) এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক উদ্দীপনার যে নূতন স্বাদ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দিতে পেরেছিল হিন্দুমেলাতে তার অভাব ছিল। অবশ্য হিন্দুমেলা ছিল দেশজ ঐতিহ্যের অনুসারী; আর উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল বিদেশী ভাবরসে পুষ্ট।

১. 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' থেকে উদ্ধৃত।
২. আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন : ৪র্থ ভাগ, পৃ. ২৬৪।

হিন্দুমেলার পটভূমিকায় মনোমোহনকে পাওয়া যায় একজন সুবক্তা হিসাবে। যে ব্যাপক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চৈত্রমেলার ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন, তার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে মনোমোহনের বক্তৃতা থেকে। বাংলার এই নবীন জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ফলে পরবর্তীকালের বহু মনীষী দীক্ষা নিয়েছেন আত্মনির্ভরতায়, এই আত্মনির্ভরতা থেকেই এসেছে আত্মশক্তি যা জাতিগঠনে সহায়ক হয়েছে। হিন্দুমেলা এবং জাতীয় সভার কর্মাধ্যক্ষের পদে মনোমোহনকে দেখা না গেলেও তিনি ছিলেন এই দুই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ-স্বরূপ। তাঁর বক্তৃতা শুনতে দূর-দূরান্ত থেকে জনসমাগম হত। বিপিনচন্দ্র পাল মনোমোহনের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মনোমোহন ও রাজনারায়ণ বসুই প্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতার সূত্রপাত করেন।

হিন্দুমেলার আদর্শে বারুইপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এর কার্যক্রম প্রসারলাভ করে। ১২৭৮ সালের ফাল্গুন সংক্রান্তিতে হিন্দুমেলার মূল উদ্যোক্তাদের সাহায্যে 'বারুইপুরের মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলার প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন। এখানে মনোমোহন পল্লীবাংলার মানুষের মনের মত বক্তৃতা দিয়েছিলেন—এই আবেগপূর্ণ বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

> এই বৃহৎ জিলার ঘরে ঘরে হয় তো কয়দিন হইতে এইরূপ বলাবলি হইতেছে—মেলা কি ? মেলার অভিপ্রায় কি। বাবুরা কেনই বা এত অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিয়া এই মেলা করিতেছেন ? কোনো দেবতার উদ্দেশ্যে কোন পীরের উদ্দেশ্যে কোন পার্ব্বণ উৎসবে কোন বারুনীর যোগেই তো মেলা হইয়া থাকে। …এই মেলা রাধা-কৃষ্ণের উৎসবের জন্য নয় ; গঙ্গার উদ্দেশ্যেও নয় ; পীরের মহিমাসূচকও নয়। এই মেলার উদ্দিষ্টা দেবী তন্ত্রোক্তা নন—পুরাণোক্তা নন ! ইঁহার নাম "উন্নতি।" উন্নতি দেবীকে প্রসন্না করিবার জন্যই তাঁহার অর্চ্চনা করিবার জন্যই এই মেলা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে। শারদীয়া মহাদেবীর ন্যায় এই উন্নতি দেবীও দশভুজা। তাঁহারও দশ হস্তে দশবিধ অস্ত্র আছে প্রথম হস্তে কৃষি, দ্বিতীয় হস্তে উদ্যানতত্ত্ব, তৃতীয় হস্তে বাণিজ্য, চতুর্থে শিল্প, পঞ্চমে ব্যায়াম, ষষ্ঠে সাহিত্য, সপ্তমে প্রতিযোগিতা, অষ্টমে সামাজিকতার জীর্ণ সংস্কার, নবমে স্বাবলম্বন ; এবং দশম হস্তে ঐক্য ! 'উদ্যম' নামক সিংহের পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া উন্নতি দেবী এই সব অস্ত্র বিশেষতঃ শেষোক্ত অস্ত্র দ্বারা দৈত্যপতি পরবশ্যতার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতেছেন। দৈত্যরাজের সর্ব্বাঙ্গে রুধির ধারা, চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ কম্পিত জর জর, পরাস্ত প্রায়, তথাপি কি আশ্চর্য্য হারিয়াও হারিতেছে না—মরিয়াও মরিতেছে না ! দেখে আতঙ্ক হয় ; ব্রহ্মার বর পাইয়া অমর হইয়া কি দুষ্ট দৈত্য ভারত পীড়নে অবতীর্ণ হইয়াছে ? কিন্তু ভরসা আছে বরদান কালে কোনো গুপ্ত ছিদ্র না রাখিয়া দেবতারা অসুর ও রাক্ষসকে বরদান করেন না।

আমাদের এই দুর্জ্জয় শত্রু দমনেরও অবশ্য কোনো গুপ্ত রন্ধ্র আছে, আমরা তাহার নিগূঢ় জানি না। সেই গুপ্ত ছিদ্র পাইবার প্রয়াসে—অমঙ্গলরূপী অসুর দলের পিতা, ভর্ত্তা ও অধিনায়ক সেই পরবশ্যতার দমন প্রয়াসেই উন্নতি দেবীর ঘটস্থাপন স্বরূপ এই মেলার অনুষ্ঠান![1]

বারুইপুরের এই মেলা উপলক্ষে মনোমোহন একটি গান রচনা করেন। গানটির কিয়দংশ উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ঃ

১

তাই বলি ভাই হিন্দুমেলার জয় জয়
দেশের দুর্গতি দেখ চেয়ে,
যত সব পুরুষ মেয়ে
একি হলো হায়!
ক্রমে বিলাতির গোঁড়া হল সমুদয়।

২

জুতো কাপড় ছাতি, সকল বিলাতী,
এখন ঘুচেছে খাওয়া বসার সাবেক রীতি
আমরা সভ্যতার গ্যাদার চোটে,
হায় মরি কদম ফুটে,
একি হলো হায়,
তবু আপনাদের নিজের বস্তু কিছুই নয়!

৩

দেশে তাঁতী সবার, অন্ন মেলা ভার,
করে হাহাকার, এ দুখে আর
কে করে পার?
ও ভাই আজ যদি ইংরাজ রাজা,
ছেড়ে যায় বঙ্গ প্রজা,
তবে হবে কি!
তখন থান বিনে লজ্জাসরম কিসে রয়?

১. বক্তৃতামালা ঃ বারুইপুরে মেলার বক্তৃতা—মনোমোহন বসু ; ফাল্গুন সংক্রান্তি, সন ১২৭৮ সাল।

৪

বুঁধি তাজা রাখে, হুঁকো তামাকে,
হায়রে তা ছেড়ে এখন চুরোট লাগায় মুখে
ঘরে প্রদীপটী জ্বালতে হ'লে
বিলাতী বাক্স খুলে
জ্বা'লতে হয় গো হয় !
আবার বিলাতী ছুঁচ সুতোয় সব সেলাই হয় !

৫

গেল সকল ম'জে হিন্দু সমাজে,
পেয়ে আদেখ্‌লে ভুলিয়ে খেলে ইংরাজ রাজে
দেখে দুখে তাই মেলার ঠাটে,
ভাই বন্ধু সবাই জুটে,
এস এস হে,
খুলি সুখের হাট, দিশী ঠাট্
যায় বজায় রয় ॥[১]

হিন্দুমেলার পরিচালকদের উদ্যোগে 'জাতীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে মেলায় চতুর্থ অধিবেশনের পর। 'হিন্দু জাতির সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের বর্দ্ধন এবং তাঁহাদিগের স্বাবলম্বিত যত্ন দ্বারা বিবিধ উন্নতি সাধন' করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। 'অন্যূন একমুদ্রা বার্ষিক দান করিলেই হিন্দুনামধারী মাত্রেই এই সভ্যতা পদের অধিকারী হইবেন।'

প্রতি মাসে জাতীয় সভায় সভ্যেরা স্বজাতীয় হিতকর বিষয়ে আলোচনা করতেন। কৃষি; শিল্প, বিজ্ঞান ও শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রেখে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। জাতীয় সভার মোট আটটি অধিবেশনের সংবাদ পাওয়া যায়। সীতানাথ ঘোষের যন্ত্রবিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে জাতীয় সভার কাজ শুরু হয়। জাতীয় সভার দ্বিতীয় বক্তৃতা বাণিজ্য বিষয়ক, বক্তা ছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের 'মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক বক্তৃতা' ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত' বিষয়ক লিখিত বক্তৃতা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত হয়। জাতীয় সভার পঞ্চম অধিবেশনে মনোমোহন বসু 'হিন্দু আচার ব্যবহার —সামাজিক ও পারিবারিক'[২] প্রবন্ধের প্রথম অংশ এখানে পাঠ করেন। (দ্বিতীয়

---

১. মধ্যস্থ, চৈত্র ১২৮০ ; পৃ. ৭৪৮।

২. হিন্দু আচার ব্যবহার, ১ম ভাগ—পারিবারিক। ফাল্গুন ১৭৯৪ শক (ইং ১৮৭০)। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরিবর্ধিত আকারে 'হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক ও সামাজিক' নামে প্রকাশিত হয়।

অংশ হিন্দু মেলায় পঠিত।) জাতীয় সভার কার্যবিবরণ, বক্তৃতার বিষয়বস্তু এমনকি নোটিশ পর্যন্ত মনোমোহন সম্পাদিত মধ্যস্থ পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হত। ১২৭৯-৮২ সালের মধ্যস্থ থেকে জাতীয় সভার বিভিন্ন অধিবেশন সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে।

১৮৭২ সালের ১৪ই জুলাই শ্যামাচরণ সরকার 'হিন্দু-লা' অর্থাৎ হিন্দুবিধি সম্পর্কে জাতীয় সভার অধিবেশনে সুদীর্ঘ দেড় ঘণ্টাকাল যাবৎ বক্তৃতা করেন। জাতীয় সভার তৃতীয় অধিবেশন (১৮৭২, ১১ আগস্ট) নানা কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। এই সভায় ফরাসী অ্যাকাডেমির আদর্শে 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভা' সম্পর্কে জন বীমস্-এর প্রস্তাবের আলোচনা করা হয়। রাজনারায়ণ বসু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উপর এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এ প্রসঙ্গে মধ্যস্থের বিবরণ প্রণিধানযোগ্য :

> বিগত ১১ই আগষ্ট রবিবার সান্ধ চারি ঘণ্টার সময় কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমী বিদ্যালয় গৃহে নেশ্যানাল সোসাইটীর তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক রাজনারায়ণ বসু বীমস্ সাহেবের প্রস্তাবিত 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভা' এই প্রসঙ্গোপরি প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এক সুদীর্ঘ মৌলিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস, উন্নতি প্রভৃতি সুদীর্ঘরূপে বিবৃত করিয়া পরিশেষে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ তর্কবিতর্কের পর সভাপতি মহাশয় এই প্রস্তাব করেন যে সভা কর্তৃক বীমস্ সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হয় যে তাঁহার মতে সাহিত্য-রীতি সংস্থাপনী সভা না হইয়া একটি সমালোচনা সভা হইলে ভাল হয়। এই প্রস্তাব সভ্যগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে রাত্রি ৮॥. ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।[১]

জাতীয় সভার চতুর্থ অধিবেশনে রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। জাতীয় সভার কার্যকরী সমিতির রদবদল ঘটে ১২৮০ সালে। রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই সভার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। সহকারী সভাপতি পদে হাইকোর্টের বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুকে নির্বাচন করা হয়। মধ্যস্থ লেখে—"রাজাবাহাদুর ও রাজনারায়ণ বসু পূর্ব্ব হইতেই সভার প্রতি যথোচিত অনুরাগী ও বিশেষ হিতকরী ছিলেন। এখানে দ্বারকানাথ বাবুর সংযোগে অবিকল মণিকাঞ্চন যোগ হইয়া উঠিল।" ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল জাতীয় সভায় ব্যভিচারিণী হিন্দু বিধবার স্বামী-

১. মধ্যস্থ, ২ ভাদ্র ১২৭৯।

বিত্তে অধিকার সম্পর্কিত রায়ের বিরুদ্ধে আলোচনা হয়। রাজা কমলকৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে এই রায়ের কুফল সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রাণনাথ পণ্ডিত। মনোমোহন বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু ও হাইকোর্টের উকিল ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বক্তৃতা করেন। মনোমোহন তাঁর বক্তৃতায় বলেন,—"আইনে স্পষ্ট লিখিত আছে, যে বিধবা পুনরায় বিবাহ করিলে পূর্ব্ব স্বামীর সম্পত্তিতে সকল স্বত্বে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু আজ এই সিদ্ধান্ত হইল যে, ব্যভিচারিণী হইলে ঐ স্বত্বে সম্পূর্ণ অধিষ্ঠিত থাকিবে।" রাজনারায়ণ বসু বলেন,—'ইউরোপে স্ত্রী প্রভুত্ব যেমন সমাজের ভিত্তি, এদেশে সতীত্ব তেমনি আমাদের সমাজের ভিত্তি। পুরুষের বীরত্ব জন্য তাঁহাদের যেমন, স্ত্রী-সতীত্ব জন্য আমাদের তেমনি বড়াই।' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় বলেন; 'হিন্দুজাতির সমুদয় ভাল ভাল রীতি পদ্ধতিই গিয়াছে, মাত্র স্ত্রীর সতীত্বটিই অব্যাহত ছিল। তাহাও এখন যাইবার উপক্রম হইয়াছে।' হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল ও এদেশে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এই সভায়।[১] এছাড়া মনোমোহন ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় সভার অধিবেশনে 'দেবালয় ও তীর্থস্থান' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। জাতীয় সভার প্রাণপুরুষ নবগোপাল মিত্রের ভ্রাতা তারিণীচরণ মিত্রের একান্ত চেষ্টায় ক্রমশই এই সভার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। হিন্দুমেলার পরিচালকদের সহযোগিতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্যায়ামচর্চার উন্নতির দিকেও এই সভার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল । জাতীয় সভার উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িতে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম বিদ্যালয়ের এবং মুজাপুর, শিমলা, শাঁড়িপাড়া, বেনিয়াটোলা, আহিরিটোলা প্রভৃতি অঞ্চলের ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকেরা এক মহাব্যায়াম প্রদর্শনের আয়োজন করেন। এই 'মহাব্যায়াম প্রদর্শনে'র সভায় রাজনারায়ণ বসু ব্যায়ামবীর ও শিক্ষকদের কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রশংসা করেন। এখানে মনোমোহন যে বক্তৃতা দেন তার মধ্যে তাঁর উদগ্র স্বাধীনতা-স্পৃহার প্রকাশ দেখা যায়:

> বাঙ্গালাদেশে দৈহিক উৎকর্ষের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মনে এইরূপ একটি ভাব উদয় হইতেছে, যেন জ্ঞান নামক পুরুষ বিদ্যা নাম্নী রমণীর সহযোগে একটি অপূর্ব্ব কন্যার উৎপাদন করিলেন। সে কন্যার নাম যুক্তি। যুক্তি দিন দিন বর্দ্ধিতা ও বিবাহের যোগ্য হইয়া উঠিল। তাহার পিতামাতা সুপাত্রের অভাবে মহা উদ্বিগ্ন। এমন সময় ব্যায়ামের বংশধর সাহস নামা সুপাত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে তাহাকে ঐরূপ গুণবতী কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই পবিত্র বিবাহ ঘটনা দৃষ্টি করিয়া আমাদের বিলক্ষণ আশা হইতেছে, "স্বাধীনতা" নাম্নী সুরমনোমোহনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন।[২]

১. এই সভা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, মধ্যস্থ, বৈশাখ-চৈত্র ১২৮০।
২. মধ্যস্থ, ৭ বৈশাখ ১২৮০; পৃ. ৩৮।

মনোমোহন আজীবন বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী। উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকে বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে মনোমোহন দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাদের সাহচর্যে কাল যাপন করলেও মনোমোহন ব্রাহ্ম আন্দোলনের শরিক হননি। তবে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল নমনীয়। কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র ছদ্মনামে মনোমোহনের লেখা 'নাগাশ্রমের অভিনয়' প্রহসনে কেশবচন্দ্র সেনের ভারত আশ্রমের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। মহর্ষি পরিবারের সঙ্গে মনোমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যৌবনের প্রারম্ভেই। দেবেন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর পুত্রদের সঙ্গেও (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ) মনোমোহনের হৃদ্যসম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সভা-সমিতি গঠনে মনোমোহনের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি 'মধ্যস্থ সভা' (১২৭৯) স্থাপন করেছিলেন মধ্যস্থ কার্যালয়ে। মনোমোহন 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভা'র অন্যতম উৎসাহী কর্মী ছিলেন। 'জাতীয় নাট্য সমাজ', 'ছোট জাগুলিয়া হিতৈষী সভা'[১] এবং 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচারে'র সঙ্গে মনোমোহনের ঘনিষ্ঠ যোগের কথা জানা গেছে।

৫

আমরা পূর্বে বলেছি, একমাত্র মনোমোহনই গুরুর পথানুসরণে সাহিত্যের প্রাচীন ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের অন্য খ্যাতিমান শিষ্যদের মত তাঁর সাহিত্যে নবীন যুগের বার্তা পাওয়া যাবে না। বঙ্কিম যুগ ও রবীন্দ্র যুগের অভিঘাতেও তিনি নিজস্বতা হারাননি, পথভ্রান্ত হন নি যুগের হুজুগে; নিজস্ব ভাবাদর্শে ছিলেন অচলপ্রতিষ্ঠ। তাঁর এই আত্মস্থতার মূল্য নেহাৎ কম নয়। এ প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু যদি সদর রক্ষা করিয়া থাকেন, কবি মনোমোহন খিড়কি-দ্বার রক্ষা করিয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। যাত্রাগান, পাঁচালী ও হাফ-আখড়াই প্রভৃতি রচনায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বস্তুতঃ, নিধুবাবু দাশরথি রায় প্রভৃতির পর বাংলা দেশের উল্লেখযোগ্য লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওই জাতীয় রচনার রেওয়াজ পুরামাত্রায় বজায় রাখিয়াছিলেন।[২]

চৈত্রমেলার জন্ম বৎসরেই রামাভিষেক (১৮৬৭) নাটক দিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে মনোমোহনের অভিষেক হল। শুধু তাই নয়—'রামাভিষেক নাটক লইয়া বহুবাজার নাট্য সমাজের উদ্বোধন।[৩] বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে

---

১. কবিবর মনোমোহন বসু—প্রবোধচন্দ্র বসু; নাট্যমন্দির, মাঘ-ফাল্গুন ১৩১৮; পৃ. ৫৬৯-৮০। এছাড়া তাঁর ডায়েরিতে অনেক তথ্য জানা যাবে।

২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা: মনোমোহন বসু—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ৩০-৩১।

৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: ২য় খণ্ড—সুকুমার সেন; পৃ. ১৪।

মনোমোহনের আবির্ভাব ঘটে। নাট্য সাহিত্যে যুগান্তর ঘটে গেল ; মনোমোহন নাটকে অধিক পরিমাণে সংগীত যুক্ত করে 'গীতাভিনয়' সৃষ্টি করলেন। সেকালের যাত্রাপালা নূতন রূপ পেল গীতাভিনয়ের সংস্পর্শে। বস্তুতঃ মনোমোহনের এই সৃষ্টি কবিযাত্রা-পাঁচালীর যুগে ইংরাজী ভাবধারায় লেখা নব্যনাট্যের জনপ্রিয়তাকে অনেকাংশে ম্লান করে দিয়েছিল। সুকুমার সেন এই যুগসন্ধির উল্লেখ করে মনোমোহন সম্পর্কে লিখেছেন :

> মনোমোহন যখন নাটক রচনায় হাত দিলেন তখন স্বভাবতই যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার ঢঙ এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার নাট্য-রচনা পূর্বতন নাটগীতির সঙ্গে অধুনাতন নাটকের যোগাযোগ ঘটাইয়া জনসাধারণের আরো গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিল। মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকের মধ্য দিয়া নাটকে পুরাতন যাত্রা-পাঁচালীর কারুণ্য ও ভক্তিভাব এবং কথকতার বাক্যবয়ন দেখা দিল নূতন সংস্থায় নূতনতর ভঙ্গিতে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে এবং ব্রজমোহন রায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায় প্রভৃতির যাত্রা-পালায় মনোমোহনের আদর্শেরই অনুসরণ। মনোমোহনের গানের সুরও প্রধান ভাবে দেশি। এইভাবে মনোমোহনের নাট্যরচনা পুরাতন-নূতনের সন্ধিবন্ধন করিয়াছে, এবং বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাসে আদি ও মধ্যযুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিয়াছে।[১]

রামাভিষেক নাটক প্রকাশিত হলে সাময়িক পত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।[২] এডুকেশন গেজেটে লেখা হয়,—"রামের রাজ্যাভিষেক ঘোষণা অবধি বনগমন পর্য্যন্ত তাবৎ বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নাটকখানি অতিউৎকৃষ্ট হইয়াছে। বিষয়টি যেমন করুণ রস পরিপূর্ণ লিপিচাতুর্য্য ও সেরূপ হৃদয়দ্রবকারী হইয়াছে। রামাভিষেক নাটকখানি পড়িতে পড়িতে বাস্তবিক আমাদিগকে অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে হইয়াছিল। ফলত ভাষায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নাটক অদ্যাপি আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।" মনোমোহন ছোট জাগুলিয়ার গ্রামবাসীদের অনুরোধে রামাভিষেক রচনা করেন। ছোট জাগুলিয়ায় একটি নাট্যশালা তৈরি করবার জন্য উৎসাহী গ্রামবাসীরা ৬০০ টাকা চাঁদা তোলেন। প্রস্তাবিত এই নাট্যশালায় রামাভিষেক অভিনীত হবার কথা ছিল। কিন্তু সেবৎসর উড়িষ্যায় বন্যার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সংগৃহীত চাঁদা পাঠিয়ে দেওয়া হল দুর্গতদের সাহায্যার্থে। রামাভিষেকের অভিষেক হল না ছোট জাগুলিয়ায়। গোবিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত 'বহুবাজার নাট্যসমাজে'

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ২য় খণ্ড—সুকুমার সেন, পৃ. ৯৪।

২. রামাভিষেক নাটক : সংবাদ প্রভাকর, ২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ ; সোমপ্রকাশ ৪ আষাঢ় ১২৭৪ ; এডুকেশন গেজেট ১৫ আষাঢ় ১২৭৪ ; ভারতরঞ্জন, ৩২ আষাঢ় ১২৭৪ ; ঢাকাপ্রকাশ ; ৬ শ্রাবণ ১২৭৪ ; অবলাবান্ধব, ১৮ পৌষ ১২৭৭ ; মিত্রপ্রকাশ, মাঘ ১২৭৭। —নাগাশ্রমের অভিনয় প্রহসনের শেষ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃত।

বহুবাজারস্থ বঙ্গ-নাট্যালয়।

সতীনাটকাভিনয়।

নং ২৫ বিশ্বনাথ মতিলালের লেন।

শনিবার মাঘ ১২৮০।

অভিনয়ারম্ভ রাত্রি ৮৷৷০ ঘণ্টার সময়ে।

এক টিকিটে এক জন মাত্র স্ত্রীলোক।

প্রবেশদ্বারে ইহা দিতে হইবে।

বাংলা থিয়েটারের গোড়ার যুগের একটি টিকিট
এর চেয়ে পুরনো কোন টিকিটের
সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি

রামাভিষেকের সংশোধিত রূপটি অভিনীত হয় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে।[১] 'বহুবাজার নাট্যসমাজে'র জন্য সতীনাটক (১৮৭৩) এবং হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫) রচনা করেছিলেন মনোমোহন। এই নাট্যসমাজের অর্থানুকূল্যেই রামাভিষেক ও হরিশ্চন্দ্র নাটক প্রকাশিত হয়। সেকালের বিখ্যাত অভিনেতা চুনিলাল বসু রামাভিষেক নাটকে কৌশল্যার ভূমিকায় অভিনয় করেন।[২] রামাভিষেকের প্রথম রজনীতে উপস্থিত ছিলেন সেকালের গণ্যমান্য বাঙালী ও ইংরাজ সম্প্রদায়। সেদিন বিনামূল্যে শুধু যে টিকিট বিতরণ করা হয় তা নয়, —'অভিনয় রাত্রে দর্শকদিগকে পান, তামাক ও জলযোগে আপ্যায়িত করা'ও হয়েছিল। শুধু তাই নয় ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে নাট্যশালা পর্যন্ত সজ্জিত করা হয়েছিল ফুলমালার তোরণে। সেকালের বিখ্যাত অভিনেতাদের সুনিপুণ অভিনয়ে, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সঙ্গীত ও বেহারী বোষ্টমের কণ্ঠসঙ্গীতে রামাভিষেকের অভিনয় সাফল্যলাভ করেছিল। রামাভিষেকে মোট নয়টি গান ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে সেকালের বিখ্যাত পটুয়া ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর ভাগিনেয় মধু পটুয়া রামাভিষেক নাটকের দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন। 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ' প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন চুনিলাল বসু ও বলদেব ধর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চুনিলাল বসু ও বলদেব ধর উভয়েই ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলী ও জানকীনাথ ঘোষালের চেষ্টায় এঁরা দুজন এই অভিনয়ে যোগ দেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ৭ জানুআরি গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে 'নবনাটক' দেখবার জন্য বিশেষ দর্শক হিসাবে আমন্ত্রিত হন বলদেব ধর ও চুনিলাল বসু। কিন্তু যথাসময়ে পেঁছিতে না পারায় তাঁরা স্থানাভাবে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ফিরে আসতে হওয়ায় তাঁরা খুবই অপমানিত বোধ করলেন। এই অপমানের ফলে গোবিন্দলাল সরকারের অর্থে, তাঁরই বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হল 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ।'

বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজের ইতিহাসের সঙ্গে মনোমোহনের নাম ওতপ্রোতভাবে

১. মনোমোহন বসু—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতবর্ষ, মাঘ ১৩৩৭, পৃ. ৩০৩-৯।

২. রামাভিষেক নাটকের অভিনেতৃ-তালিকা পাওয়া যায় শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের 'বহুবাজারের প্রাচীন নাট্যসমাজ' প্রবন্ধে। নিম্নে তালিকাটি দেওয়া হল :
দশরথ—অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাম—উমাচরণ ঘোষ (রাজপুরের), লক্ষ্মণ—বলদেব ধর, বশিষ্ঠ—হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত্র—প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদূষক—মতিলাল বসু, বন্দিদ্বয়—বিহারী দাস ও কানাই দে, রাজদূত—কালী হালদার, নট—নন্দলাল ধর, কৌশল্যা—চুণিলাল বসু, সুমিত্রা—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সীতা—আশুতোষ চক্রবর্তী (শিবপুরের), ঊর্ম্মিলা—বিহারী ধর, মন্থরা—ক্ষেত্রমোহন দে, নটী—নন্দ ঘোষ।
—দ্র. বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩০, পৃ. ৭৬৬।

জড়িত। এই নাট্যালয়ে রামাভিষেক ছাড়া ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সতী ও ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনীত হয়। রামাভিষেক ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের শারদীয়া পূজার পর থেকে সারা শীতকাল ধরে অভিনীত হয়েছিল। রামাভিষেকের অভিনয় সাফল্যের পর প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দলাল ধর প্রমুখ সদস্যদের অনুরোধে মনোমোহন সতী নাটক (১৮৭১) রচনা করেন। এদিকে রামাভিষেক অভিনয়ের পর গোবিন্দচন্দ্র সরকার তাঁর বাড়ি সংস্কারের জন্য নাট্যশালার স্থান পরিবর্তন করার নোটিশ জারি করলেন। তবুও সদস্যদের উৎসাহে ভটা পড়লো না। দুবছর অভিনয় বন্ধ রইল, উৎসাহী সদস্যেরা নতুন বা ড়র খোঁজে হন্যে হয়ে উঠলেন। বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে পাওয়া গেল বসু বাড়ির সংলগ্ন কিছু জমি। সেখানে তৈরি হল নতুন রঙ্গমঞ্চ। নারকেল গাছ কেটে মাটির প্রলেপ দিয়ে সাদা রঙের থাম তৈরি করা হল। 'দক্ষ' রাজার সাজ-সজ্জা আনা হল হাটখোলার দয়ালচাঁদ দত্তের বাড়ি থেকে। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুআরি শীতের প্রথম দিকে শুরু হল অভিনয়। দূরদূরান্ত থেকে দর্শক সমাগম হয়েছিল এই নাটক দেখতে। সতীনাটক দেখেছিলেন কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, ছাতুবাবু, ডবলু. সি. ব্যানার্জি, চন্দ্রমাধব ঘোষ, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সতী নাটকের অভিনয় রামাভিষেকের অভিনয়কে অনেকাংশে ছাপিয়ে গিয়েছিল। এই হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যগুলিকে ধরে রাখবার জন্য উদ্যোক্তারা তৈলচিত্র করিয়ে রেখেছিলেন। সেকালের বিখ্যাত চিত্রকর বিনোদবিহারী দাস চিত্রগুলি অঙ্কিত করেছিলেন।

বিয়োগান্তক সতী নাটকে মনোমোহন দর্শকদের অনুরোধে 'হরপার্ব্বতী মিলন' নামে একটি অতিরিক্ত অঙ্ক যোগ করেছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন,—

> সতীনাটকের বিয়োগ দৃশ্যের বিষাদ বেদনা দর্শকের পক্ষে অসহ্য হওয়াতে উত্তরকালে গ্রন্থকার ইহাতে একটি মিলনাত্মক অঙ্ক ('হরপার্ব্বতী মিলন') সংযোগ করিতে বাধ্য হন।[১]

সতী নাটকে শান্তে পাগলার চরিত্র একটি মৌলিক সৃষ্টি। পরবর্তীকালের বহু নাটকে এই শান্তে পাগলার চরিত্র অবলম্বনে গাঁজাখোর পাগল চরিত্র রচিত হয়েছে। সতীনাটকে বিহারীলাল সরকারের সঙ্গীত সম্পর্কে মধ্যস্থে লেখা হয়:

> বহুবাজারের ঐকতান বাদ্য এবং বিহারীবাবুর গান যে বিশেষ সুশ্রাব্য তাহা সকলেই জানেন। এবারে ঐকতান আরো উত্তম হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ বলিতে গেলে, গান গাওয়া রামাভিষেকের সময়ের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। অন্যের কানে কিরূপ শুনায় বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা নাকি যে যে সুরে

১. বহুবাজারের *প্রাচীন নাট্যসমাজ—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্গবাণী,* মাঘ ১৩৩০ ; পৃ. ৭৬৯।

সতী নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য : তৈলচিত্র।
শিল্পী : বিনোদবিহারী দাস

> গ্রন্থকর্ত্তা গান রচনা করিয়াছিলেন পূর্ব্বে তাহা শুনিয়াছি, সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় যে প্রকার সুরে প্রথম রচিত হইয়াছিল, অবিকল সেই সেই সুরে গান কয়টী গাওয়া হইলে সেই পূর্ব্বকার উৎকৃষ্টতাই প্রাপ্ত হইত। বিহারীবাবু উত্তম গায়ক সুতরাং যাহা গাহিয়াছিলেন তাহাও উত্তম হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে আমরা যতদূর আশা করি, ততদূর মোহজনক হয় নাই। পূর্ব্বশ্রুত সুরের অপেক্ষাকৃত অধিক পারিপাট্যই যে উহার একমাত্র কারণ, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি।[১]

সতীনাটক প্রকাশিত হলে সেকালের পত্র পত্রিকায় এর সমালোচনা করা হয়। সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়, দেব-নাটককে অতিমাত্রায় গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বী করায় চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হয় নি, তাছাড়া সংলাপও বহুস্থানে দীর্ঘ হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে মনোমোহন 'দীর্ঘ উক্তি'কে খর্ব করেন। অভিনয়ের সমালোচনা করা হয়েছিল সেকালের কাগজে।[২] এ নাটকে অভিনেতৃগণ[৩] অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'বহুবাজার নাট্য সমাজের' অনুরোধে মনোমোহন হরিশ্চন্দ্র নাটক রচনা করেন। 'তত্ত্বজ্ঞানানুকূল্যে মুদ্রিত' হয়েছিল নাটকখানি। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হরিশ্চন্দ্র নাটকে মনোমোহনের স্বদেশ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকেই মনোমোহনের সেই বিখ্যাত 'দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন' গানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া করভারে পীড়িত দেশের প্রকৃত দুঃখ তুলে ধরা হয়েছিল 'দে কর দে কর, রব নিরন্তর' গানটিতে।

হরিশ্চন্দ্র নাটক জনপ্রিয় হলেও বেশি দিন অভিনীত হতে পারে নি। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র লিখেছেন:

> হরিশ্চন্দ্রের অভিনয় অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। যে সময় 'হরিশ্চন্দ্রে'র

---

১. সতী নাটকের অভিনয়, মধ্যস্থ, মাঘ ১২৮০ ; পৃ. ৬৯৫।

২. মধ্যস্থে লেখা হয়—'শিব, দক্ষ, নারদ, সভাপাল, শান্তিরাম এবং নগরপাল—বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন ; ···স্ত্রীগণের মধ্যে প্রসূতী ও সতীই প্রধান। শুনিলাম, প্রসূতি বেশধারী যুবক অভিনয়ের পূর্ব্বে দুই তিন দিন মাত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাহা স্মরণ করিয়া তিনি যতদূর করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হইতেছে সেবারে ভঙ্গী ত্রুটি যাহা ছিল পরে তাহা আর থাকিবে না। · সতীর যেমন মিষ্ট কথা, তেমনই চরিত্রানুযায়ী ভাব'—সতীনাটকের অভিনয়, মধ্যস্থ, মাঘ ১২৮০ পৃ. ৬৯২-৯৩।

৩. সতী নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে 'সতীর' ভূমিকায় আশুতোষ চক্রবর্তীর অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—দক্ষ—চুনিলাল বসু, শিব—চুনিলাল বসু, নারদ—প্রতাপচন্দ্র বসু, শান্তিরাম—মতিলাল বসু, সভাপাল—নিত্যানন্দ ধর, নগরপাল—বলদেব ধর, নন্দী—কুঞ্জবিহারী ধর, বৈষ্ণব—বেণীমাধব দে, শৈব—ক্ষেত্রমোহন দে, নট—নন্দলাল ধর, প্রসূতি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, সতী—আশুতোষ চক্রবর্তী, অম্বিকা—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অযোধ্যা—বিহারীধর, মধ্য—কালী চট্টোপাধ্যায় (শিবপুরের), সনকা—নন্দ ঘোষ, বিজয়া—কালী চট্টোপাধ্যায়, নটী—নন্দ ঘোষ।—বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩০ ; পৃ. ৭৬৮।

> অভিনয় চলিতেছিল সেই সময় প্রতাপ বাবুর স্ত্রী ও চুনি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র মারা যাওয়ায় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই এইরূপ অনুভূতি হইল যে বুঝিবা হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্রের বিষাদময় জীবনের অনুকৃতি করিতে গিয়া তাঁহাদেরও সাংসারিক জীবন বিষাদময় হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা অভিনয় ব্যাপারে একেবারে যত্নহীন হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে লাগিল। অবশেষে 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্য সমাজ' চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরিশ্চন্দ্র নাটকে অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চুনিলাল বসু।[২] শুধু অভিনেতাই ছিলেন না; এই নাট্যসমাজের এঁরা ছিলেন প্রাণপুরুষ। তাঁদের এই পারিবারিক দুর্ঘটনার ফলে 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজ' উঠে গেল। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে 'বহুবাজার অবৈতনিক নাট্যসমাজের' দান স্মরণীয়। এই নাট্যসমাজের প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যই মনোমোহন নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। 'বহুবাজার নাট্যসমাজের' অভিনেতা চুনিলাল বসুর সতীনাটকে শিব ও দক্ষের ভূমিকায় অভিনয় সেকালের দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। এছাড়া রামাভিষেকে কৌশল্যা এবং হরিশ্চন্দ্রে নামভূমিকায় চুনিলাল বসুর অভিনয় তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। সেকালের সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামাভিষেকে 'সুমন্ত্র,' সতীনাটকে 'নারদ' হরিশ্চন্দ্রে 'বিশ্বামিত্র' চরিত্রে অভিনয় করে যশ লাভ করেন। এই সম্প্রদায়ের আর একজন উল্লেখযোগ্য অভিনেতা ছিলেন মতিলাল বসু। এঁর খ্যাতি ছিল অনাবিল হাস্যরসের অভিনয়ে। রামাভিষেকে বিদূষক, সতীনাটকে শাস্তে পাগলা অর্থাৎ শান্তিরাম, হরিশ্চন্দ্রে পাতঞ্জল চরিত্রে ইনি অভিনয় করেন। অবিনাশচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সমালোচনা থেকে জানা যায় সতীনাটকে প্রসূতি ও হরিশ্চন্দ্রে শৈব্যার ভূমিকায় অবিনাশচন্দ্র যেমন অভিনয় করেছিলেন তেমন অভিনয় নাকি স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্ভব ছিল না। মনোমোহনের দ্বিতীয় রচনা 'প্রণয়পরীক্ষা নাটক' (১৮৬৯) ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ জানুআরি তারিখে বিডন স্ট্রীটের গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। সুকুমার সেন প্রণয়পরীক্ষা নাটক সম্পর্কে লিখেছেন:

> 'প্রণয় পরীক্ষা নাটক'-এর বিষয় কতকটা রামনারায়ণের নবনাটকের মতো;

---

১. বহুবাজারের প্রাচীন নাট্যসমাজ—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, বঙ্গবাণী, মাঘ ১৩৩০; পৃ. ৭৬৯।

২. হরিশ্চন্দ্র নাটকের অভিনেতৃতালিকা—হরিশ্চন্দ্র—চুনিলাল বসু, বিশ্বামিত্র—প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈব্যা—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, রোহিতাশ্ব—ননীলাল দাস, পাতঞ্জল—মতিলাল বসু, কমলা—বিহারী ধর, খগেন্দ্র—বেণীমাধব দে, নগরপাল—বলদেব ধর, মল্লিকা—নন্দ ঘোষ, নাগেশ্বর—নিত্যানন্দ ধর, ভঁদো—গোষ্ঠবিহারী লাহা, বসন্ত—চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অর্থাৎ বহুবিবাহের দোষ ইহার উপপাদ্য। তবে প্রণয় পরীক্ষার প্লট রামনারায়ণের নাটকের মতো অকিঞ্চিৎকর নয়। প্লটের গাঁথুনিতে মনোমোহনের কল্পনা চাতুর্যের পরিচয় আছে।...প্রণয় পরীক্ষার চরিত্রগুলি সবই যেন বইয়ের পাতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। শুধু নটবরের ভূমিকাতেই কিছু স্বাভাবিকতা দেখি। এই চরিত্রে দীনবন্ধুর লীলাবতী নাটকের হেমচাঁদের ছায়া পড়িয়াছে। এইরূপ নেশাখোর পাগলাটে উন্নত হৃদয় শাস্তরসাস্পদ ভূমিকার মধ্যস্থতায় নাটকীয় ঘটনার পরিচালনা মনোমোহনের এই নাটকেই প্রথম দেখা গেল।[১]

এই নাটকে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা স্ত্রী চরিত্রগুলি বেশী প্রাধান্য লাভ করায় পুরুষ চরিত্র অপেক্ষাকৃত ম্লান হয়ে পড়েছে। সেকালের সাময়িক পত্রে এই নাটকের দীর্ঘ আড়ম্বরপূর্ণ সংলাপের সমালোচনা করা হয়।[২] সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারত সংস্কারকে লেখা হয়, 'নটবরের কালীমন্দিরের দৃশ্যাভিনয়টি আমরা শীঘ্র ভুলিব না। ইহার স্বাভাবিক অভিনয় আমরা এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতেছি দাসী কাজলার অভিনয় ও প্রশংসনীয় বটে।'[৩]

কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র ছদ্মনামে মনোমোহন নাগাশ্রমের অভিনয় প্রহসন (১৮৭৪) রচনা করেন। সেকালের ব্রাহ্ম সমাজের কুৎসিত চিত্রকে তুলে ধরাই এ প্রহসনের মূল লক্ষ্য ছিল। নাগ-নাগিনীর নামকরণ ও তাদের ব্যবহার সম্প্রদায় বিশেষের উপর কটাক্ষপাত করা হলেও ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রটি এমনভাবে ফুটে উঠেছে যাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে চিনতে অসুবিধা হয় না। এই নাটকে সম্প্রদায়কে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করেছেন বেশি। পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে নাগাশ্রমের অভিনয় মধ্যস্থ পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।[৪] এই সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কঠোরভাবে মধ্যস্থ সম্পাদককে সমালোচনা করা হয়। ভারত সংস্কারকে এ প্রসঙ্গে লেখা হয়:

মধ্যস্থ পত্রে "নাগাশ্রম" নামে নাটকাকারে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের উপর অজস্রধারে অযশস্কর বিদ্রূপ ও গালি বর্ষণের ত্রুটী হইতেছে না বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে কেশববাবু ও তাঁহার বন্ধুগণ কতদূর দোষ স্পর্শ শূন্য তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। সে যাহাই হউক প্রবন্ধ লেখক ভদ্রলোক। তাঁহাদের কোন দোষ যদি তিনি যথার্থই বুঝিয়া থাকেন, ভদ্রভাবে

---

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) সুকুমার সেন; পৃ. ৯৬।

২. প্রণয়পরীক্ষার সমালোচনা করা হয়—এডুকেশন গেজেট, ২৮ কার্তিক ১২৭৬; ভারত রঞ্জন, ১০ অগ্রহায়ণ ১২৭৬; মিত্র প্রকাশ, আশ্বিন ১২৭৭; হিন্দু হিতৈষিণী, ১০ বৈশাখ ১২৭৮ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায়।

৩. নাট্যাভিনয় ও পুস্তক সমালোচনা: প্রণয় পরীক্ষা অভিনয় রাত্রি। শনিবার ৫ মাঘ ১২৮০ ভারত সংস্কারক, ১১ মাঘ ১২৮০।

৪. মধ্যস্থ ১২৮১ দ্রষ্টব্য।

অনুযোগ করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে অতি অভদ্র ও বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিতেছেন। অন্যায় দেখিলে ও পরিহাস দ্বারা তাহার শাসন চেষ্টাকে আমরা মন্দ বলি না, কিন্তু সুরুচি বিরুদ্ধ অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রূপকে ভদ্রলোকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। কেশববাবু মনুষ্য, তাঁহার কোন দোষ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু মধ্যস্থের প্রস্তাব লেখক বোধ হয় ইহা অস্বীকার করিবেন না; যে তিনি আমাদের দেশের বাস্তবিক একটী অলংকার। এরূপ লোককে অতি নীচভাবে ও অন্যায় রূপে আক্রমণ করা যে নীতিসঙ্গত কার্য্য নহে তাহা কে না স্বীকার করে।[১]

ভারত সংস্কারক পত্রিকার সমালোচনার যথোচিত উত্তর মধ্যস্থ পত্রিকায় দেওয়া হয়।[২] এই উত্তরে ভারত সংস্কারক ক্ষুণ্ণ হলেও খুব সংযত ভাষায় মধ্যস্থ সম্পাদককে এরূপ প্রহসন প্রকাশের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছেন। এপ্রসঙ্গে লেখা হয়ঃ

মধ্যস্থ সম্পাদক "নাগাশ্রম" নাম দিয়া যে একটী প্রস্তাব লিখিতেছেন আমরা তাহার প্রতিবাদ করাতে তিনি আমাদিগের প্রতি এক দীর্ঘ উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আর কিছু বলিতে চাই না; তিনি অবশ্যই বিজ্ঞ ও সুবিবেচক, নতুবা মধ্যস্থ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেন কেন ? এখন ভদ্রমহিলাগণকে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি যেরূপ অভিনয় করিতেছেন; ইহা কতদূর সুরুচিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত কার্য্য হইতেছে তিনি একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি ব্রাহ্মদিগকে লইয়া পরিহাস করিতে চান করুন, কিন্তু স্ত্রী জাতির প্রতি যে সম্মান রক্ষা করা হিন্দু জাতির চিরপ্রথা তাহার উল্লংঘন করিয়া কি আপনাকে অপদস্থ করিতেছেন না ?[৩]

'পার্থপরাজয় অর্থাৎ বভ্রূবাহনের যুদ্ধে অজ্জুনের পরাভব' (১৮৮১), রাসলীলা নাটক; (১৮৮৯) এবং আনন্দময় নাটক (১৮৯০) এই তিনখানি নাটকের মধ্যে রাসলীলা নাটক অভিনীত হয়েছিল ৮ জুন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এমারেল্ড থিয়েটারে। এ বছর এমারেল্ড থিয়েটারে মনোমোহন ডিরেক্টর হয়েছিলেন।[৪] পার্থপরাজয় নাটকটির দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকটি বারাসতের বাদু গ্রামের কোন এক অবৈতনিক গীতাভিনয় সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হবার কথা ছিল, কিন্তু হয়নি। এই নাটকে মনোমোহন গীতাভিনয়ের জন্য নূতন গান সংযোজিত করেছিলেন।

মনোমোহনের নাটকের অভিনয় শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না, মফঃস্বলের অনেক

১. ভারত সংস্কারক, ৭ আগস্ট ১৮৭৪ (২৩ শ্রাবণ, শুক্রবার ১২৮১) পৃ. ১৯৩।
২. মধ্যস্থ, ভাদ্র ১২৮১ দ্রষ্টব্য।
৩. ভারত সংস্কারক, ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ (২৭ ভাদ্র শুক্রবার ১২৮১) পৃ. ২১৭।
৪. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ১৩৬।
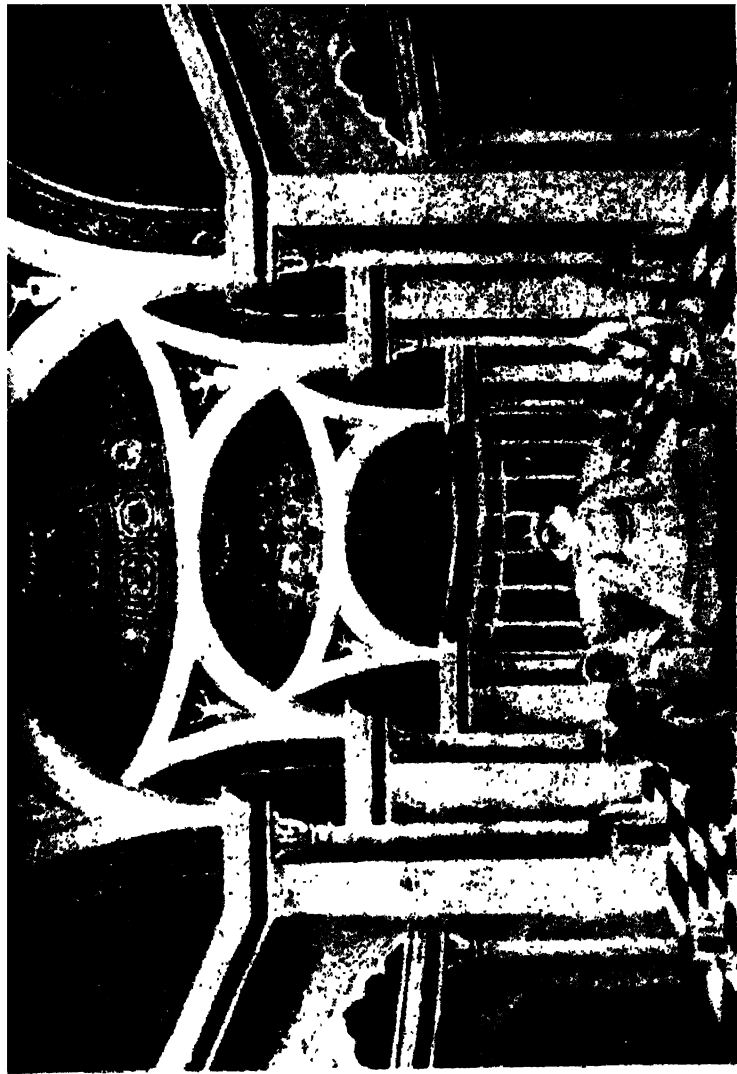
সতী নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য : তৈলচিত্র।
শিল্পী : বিনোদবিহারী দাস

সখের থিয়েটারেও তাঁর নাটক বহুবার অভিনীত হয়েছিল। তিনি শুধু নাটকই রচনা করেন নি, জাতীয় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির পশ্চাতেও মনোমোহনের কৃতিত্ব বড় কম ছিল না। জাতীয় নাট্যশালার প্রথম বার্ষিক উৎসব সভায় মনোমোহনের বক্তৃতা থেকে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব জাতীয় নাট্য সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রধান বক্তা ছিলেন মনোমোহন। এই সভায় মনোমোহন বলেছিলেন :

> …আজ আমাদের স্বজাতীয় নাট্যসমাজের বর্ষোৎসব! জাতীয় নাট্যাভিনয়ের জন্মদিন! গত বৎসর এই দিনেই জাতীয় নাট্যাভিনয়ের প্রথম অভ্যুদয় হয়। "জাতীয়" এই বিশেষণটী আমাদের কর্ণে কি মধুর কি আশাতিরিক্ত শ্রুতিসুখময় ও আশাজনক ভাবপ্রকাশক! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কাহার মনে ছিল, শীঘ্র আমরা এমন সকল অনুষ্ঠান করিতে পারিব, যে সব অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে "জাতীয়" বিশেষণটী বসাইতে যোগ্য হইব? তখন বঙ্গদেশের অন্যত্রের কথা দূরে থাকুক, এই রাজধানীতেই যাহা কিছু করা হইত, তাহা কাহাদের উদ্যোগে? কাহাদের দ্বারা? কাহাদের প্রকৃত সাহায্যে? কাহাদের অধিকাংশ আনুকূল্যে? কাহাদের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বে? সে সব কি ইংরাজ পুরুষগণের যত্নে, পরিশ্রমে, উদ্যোগে, মূল সাহায্যে, প্রকৃত কর্ত্তৃত্বে নয়? যাহা কিছু হইত; সকল তাতেই তাঁহাদের হস্ত, তাঁহাদের অধ্যবসায়, তাঁহাদেরই সব! আমাদের বড় বড় সামাজিকগণ কেবল সাক্ষীগোপাল অথবা ধামাধরার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন মাত্র! বিদ্যাশিক্ষার অনুষ্ঠান হউক, রাজনৈতিক সভাই হউক, কোনো সাধারণ বৃহৎ আমোদের কাজই হউক; যাহাতে দশজনের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন, তাহার একটীও বাঙ্গালী দ্বারা স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হইত না, সমস্তই ইউরোপীয় যত্ন-সম্ভূত? এখন আর আমাদের তত হীনাবস্থা নাই—জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বন ও স্বাধীন উদ্যম দেখা দিতেছে—এখন অনেক প্রার্থনীয় কাজ আমরা স্বয়ং করিতেছি! আমাদের নিজের চেষ্টায় রাজনৈতিক সভাসমূহ এবং জাতীয় সামাজিক সভাসমূহ সংস্থাপিত হইতেছে, জাতীয় শিক্ষালয়েরও সূত্রপাত হইয়াছে, জাতীয় সঙ্গীত অধ্যাপনারও প্রকাশ্য অনুষ্ঠান দেখা যাইতেছে, তৎসঙ্গে সংশোধিত বিশুদ্ধ প্রণালীর জাতীয় আমোদের পথও পরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!
>
> সেই সব আমোদের মধ্যে নাট্যাভিনয় ক্রিয়া যেমন নির্দ্দোষ, উপাদেয়, উপকারক আমোদ তেমন আর কি আছে? ইহাতে সুদ্ধ আমোদ নয়, সুদ্ধ কৌতূহল চরিতার্থতা নয়, সুদ্ধ রঙ্গদর্শন নয়, ইহার দ্বারা রুচির সংস্কার; নীতির সংস্কার, সামাজিক রীতির সংস্কার পাপের প্রতি ঘৃণা; পুণ্যের প্রতি আস্থা; কবিতামৃতের উৎকৃষ্ট আস্বাদন এবং সঙ্গীত-সুধার সুমার্জ্জন প্রভৃতি যে কত সকল সমুদিত হইয়া থাকে, তাহার কত ব্যাখ্যা করিব?…প্রসিদ্ধ কবি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের দ্বারা অনেক

বড় বড় লোক "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটক বাঙ্গালায় রচনা করাইয়া লইলেন। কিন্তু তাহার গানগুলি যত উত্তম হইল, কথোপকথন তেমন সৌকর্য্যসাধক হইল না। যাহা হউক মহা ধুমধামপূর্ব্বক কয়েক মাস তাহার আখড়া চলিল—রাশি রাশি অর্থ ব্যয়িত হইল—কিন্তু পরিণামে হরি নাম বই আর কিছুই ফল দর্শিল না !…

শুনিতে পাই এক ব্যক্তি বিদ্যাসুন্দরের থিয়েটর করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও স্বদেশে নাট্যাভিনয়ের সদাস্বাদ ও সৎপ্রথা জন্মাইয়া দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। অর্থাৎ তখন জাতীয় ভাষার প্রতি শিক্ষিত যুবকগণের যথোচিত উৎসাহ ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হয় নাই।

তাহার পর কোনো মহাশয় 'ভদ্রার্জ্জুন' নামা সুভদ্রা-হরণের পালাটী নাটকচ্ছলে রচনা ও প্রচার করিলেন। তাহার অধিকাংশ পয়ারে লিখিত হওয়াতে কার্য্যকারক হইতে পারিলেন না। এ সময় কি কিছু পরে আরো দুই একখানি ভাষান্তরিত নাটক দেখা দিল, কিন্তু তাহার একখানিও মনোমত; কার্য্যসাধনের মত এবং অভাব পূরণের মত হইয়া উঠিল না।

প্রথমে বড়লোক না লাগিলে কোনো দরূহ বিষয় সিদ্ধ হওয়া ভার। এ বিষয়েও তাহাই ঘটিল। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজভ্রাতৃদ্বয় এবং যোড়াসাঁকোস্থ মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ই বঙ্গদেশে নাট্যাভিনয়ের প্রথম প্রদর্শক হইলেন। সেই সময় প্রজাবন্ধু মৃত মহাত্মা দীনবন্ধুবাবু সুবিখ্যাত "নীলদর্পণ" নাটক প্রচার দ্বারা বঙ্গভাষায় প্রথম ও প্রকৃত একখানি নাটক স্বীয় সমাজে অর্পণ করিলেন। (হায় ! আ'জ তাঁহার নামের পূর্ব্বে "শ্রীযুক্ত" বিশেষণটী বসাইতে পারিলে কি অতুল আনন্দই উপভোগ করিতে পারিতাম ! হায় ! সেই সরল বন্ধু কোথায় গেলেন ? আমরা এত অল্পকালেই যে সেই মিত্রধনে বঞ্চিত হইব ইহা স্বপ্নের অগোচর !!) তিনিই যে আমাদের মাতৃভাষার দৃশ্যকাব্যের প্রথম জন্মদাতা ছিলেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব এবং তাঁহার একীর্ত্তি বঙ্গীয় নাটকেতিহাসের প্রথম পত্রে চির অঙ্কিত থাকিবে, সন্দেহ মাত্র নাই !

তাঁহার পর কবিবর রামনারায়ণ তর্করত্ন কৃত "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" ও অদ্বিতীয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় কৃত "শর্ম্মিষ্ঠা" ও "কৃষ্ণকুমারী" প্রভৃতি নাটক ও কয়েকখানি প্রহসনাদি লিখিত হইয়া বঙ্গভাষার শ্রীসম্পাদন এবং বঙ্গ রঙ্গ ভুমির গৌরব বৃদ্ধি করিল ! (হায়; তিনিও অকালে আমাদিগকে ফেলিয়া পলাইয়াছেন !)

তৎপরে "রামাভিষেক" ও "নবনাটক" প্রভৃতি কয়েকখানি দৃশ্যকাব্য রচিত হয় ! তৎপরে হু হু শব্দে দুঃখ শেষ (Tragecy), সুখ শেষ (Comedy) ও প্রহসনাদি

ভাল মন্দ বহু বহু দৃশ্য-কাব্যের স্রোতে বঙ্গদেশ এককালে প্লাবিত হইয়া পড়িল। দুঃখের বিষয়, ঐ সব নাটকের অধিকাংশই না টক, না মিঠে!

এ স্থলে প্রধান প্রধান রঙ্গভূমির নামোল্লেখ করা আবশ্যক। রাজধানী ও প্রদেশ মধ্যে অগণিত রঙ্গভূমি স্থায়ী ও অস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আজো হইতেছে। তন্মধ্যে অস্থায়ী রঙ্গই অধিক, স্থায়ী অতি অল্প। সেই অসংখ্য অভিনয়-স্থলের মধ্যে বেলগাছিয়ার রাজভবন, যোড়াসাঁকোস্থ সিংহ মহাশয়দিগের প্রাসাদ, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীর নবনাটকের রঙ্গস্থল, কাঁসারিপাড়ার শকুন্তলাভিনয়ের রঙ্গ, পাথুরিয়াঘাটাস্থ রাজভবন এবং বহুবাজারস্থ রামাভিষেকের রঙ্গভূমিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এই যত নাম ব্যক্ত করা গেল, তত্তাবতই অবৈতনিক রঙ্গভূমি হইয়াছিল। তাহাতে সমাজের দর্শনেচ্ছা, সম্যগ্রূপে চরিতার্থ হইতে পারে নাই। তাহাতে প্রদর্শক মহাশয়েরা বিপুলার্থ ব্যয়ের দায়ে পতিত হইয়াছিলেন। অথচ যে সে যাইয়া যা দেখিয়া আসিবেন, সে যো ছিল না। তাহাতে পূর্ব্ব অভাব কিয়দংশ বই সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হয় নাই। তাহাতে যে বিষয় সভ্য সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত, সে বিষয় সেরূপ না হইয়া যেন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিরূপে গণ্য হইত, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তি-সাধনের পক্ষে বিপুল বাধা ছিল। যে কয়েক বৎসর সেই সমস্ত অবৈতনিক রঙ্গভূমি প্রতি বৎসর নূতন নূতন রঙ্গ প্রদর্শনে তৎপর ছিল, সেই কয় বৎসর সর্ব্বদা সকলের মুখে শুনা যাইত, যে যদিও ইহা মন্দের ভাল হইল বটে, কিন্তু যত দিন কোনো বৈতনিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রঙ্গভূমি নির্ম্মিত না হইতেছে, ততদিন অভাব নিবারণ ও আশা পূরণ হইল বলিয়া কোনো মতেই স্পর্দ্ধা করা যাইতে পারে না।

এই জল্পনা চলিতেই ছিল, কোনোদিগে প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার লক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল না। বান্ধবমণ্ডলী যখনই মিলিতাম, এই কথা উঠিবা-মাত্র সকলেই এই বলিয়া নিরাশ্বাস হইতাম, "আমাদের সমাজ ততদূর উন্নত হয় নাই; যে বৈতনিক রঙ্গভূমিকে প্রতিপোষণ করিতে পারে।" আমরা আরো ভাবিতাম, যে যদিও তাহার দর্শক শ্রেণীতে সাধারণে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইতে পারে; কিন্তু এমন বুকওয়ালা সম্প্রদায় বাঙ্গালীর মধ্যে কৈ আছে, যাহারা সাহস করিয়া অগ্রসর হয়?

মনে ও বাক্যে আমরা এইরূপে ভাবিয়া ও প্রকাশ করিয়া একপ্রকার নিশ্চিত হইয়াছিলাম। ওমা! এমন সময় গত বৎসর (ঠিক এমুনি সময়ের কিছু পূর্ব্বেই) শুনিতে পাইলাম, যে একদল সুসভ্য যুবক তদনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন!… দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও ঐ বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া দেখিলাম, দেখিলাম সত্য সত্যই এমন সাহসী সম্প্রদায় দলবদ্ধ হইয়াছেন! সে সম্প্রদায় আবার বঙ্গীয় যুবক সম্প্রদায়!

দেখিয়া পরমাহ্লাদিতও তৎসঙ্গে একটু বিস্ময়ান্বিতও হইলাম।…বাঙ্গালীর অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই।…এই জাতীয় নাট্যালয় সংস্থাপিত ও মুক্ত হওয়াতে পূর্ব্বে এদেশে এ বিষয়ে যত কিছু অভাব ছিল, তাহা নিরাকৃত হওনোন্মুখ হইয়াছে।… দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা আপাততঃ অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করিতেছি। তাহার প্রথমটী গীতের প্রসঙ্গ। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, যে, নাট্যাভিনয়ে গানের বড় আবশ্যক করে না। ইউরোপীয় রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয় কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাঁহারা এই সংস্কারের বশতাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি সম্যক্ স্বতন্ত্র পদার্থ তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। যে দেশে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্য্যেই গান নইলে চলে না—আনন্দের কার্য্য দূরে থাকুক, মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার সময়েও সুস্বরের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন যে দেশে বহুকালের প্রথা—যে দেশে কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না বলিয়া অপর সাধারণের তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালি, মরিচা, তর্জ্জা, ভজন, কীর্ত্তন; ঢব, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পদাবলী, বাউলের গান প্রভৃতি বহু বহু প্রকার গীতি কাব্যের প্রচলন—অধিক কি, যে দেশে দিন ভিকারী ও রা'ত্ ভিকারীরাও গান না গাইলে বেশী ভিক্ষা পায় না; সে দেশের হাড়ে হাড়ে যে সংগীতের রস প্রবিষ্ট হইয়া আছে, তাহাও কি আবার অন্য উপায়ে বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাত্রাওয়ালারা স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া অপ্রাকৃত সং, রং, ঢং ইত্যাদি তামাসা দেখাইবার পরেও সহস্র সহস্র লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়, সে নহে। কি সুধু দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞতা ও গুণ গ্রহণের অক্ষমতা প্রযুক্ত? কদাচ স্বভাবের বৈপরীত্যে মনুষ্য লোকে যে যাহা করিবে, তাহা সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত মনুষ্য মাত্রেরই ভাল লাগিবে না, তবে যে যাত্রাওয়ালারা সুসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই না! যাত্রার দোষের মধ্যে স্থানকাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ও পক্ষে আবার বর্ত্তমান অনেক নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটী মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই বোধ হয়, যে, অভিনেতৃগণ অধুনা যেরূপে অভিনয়ের নিমিত্ত যত্ন পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রূপ মনোযোগী হইতে পারেন; তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এককালে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়া যাইবেন! আমি এমন বলিতেছি না যে, যাত্রাওয়ালারা যেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর কেবল গানের আধিক্য করিয়া থাকে, নাটকের ও তদ্রূপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে; স্বভাবোক্তির পর যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত

স্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন হউক না, ফলতঃ যে কয়টী গান হইবে, সে কয়টী যেন উত্তম রূপে গাওয়া হয়। ফল কথা, আমরা মধ্যস্থ মানুষ ; আমরা চাই দেশে পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই, সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক ! এরূপে কোনো কোনো অভিনেতৃ-সম্প্রদায় যে কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহাও দেখা গিয়াছে। ভরসা করি, জাতীয় নাট্যসমাজ সর্ব্বাগ্রে এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় উপনীত হইবেন, সেই মীমাংসানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া এ বিষয়ের অংগরাগ বাড়াইয়া তুলেন !

আমার বক্তব্য দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক শ্রেণীও আছেন, যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, রঙ্গ-ভূমিতে সত্যকারের স্ত্রী অভিনেত্রী ব্যতীত স্ত্রীলোকের অভিনয়ার্হ অংশগুলি কোনোমতেই প্রকৃত প্রস্তাবে অভিনীত হইতে পারে না। একথা আমরা আংশিক রূপে স্বীকার করি। কি আকৃতি, কি প্রকৃতি, কি স্বর, কিছুতেই কর্কশ ও রুক্ষ্মস্বভাবী পুরুষেরা কোমলাঙ্গী, কোমল-হৃদয়া ও মধুরভাষিণী কামিনীগণের ন্যায় হইতে পারে না। সত্যকার রমণীকে রমণী সাজাইলে দেখিতে শুনিতে সর্ব্ব প্রকারেই ভাল হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যেমন উত্তম হইল, অন্যান্য বিচার্য্য যে বিষয় আছে, তাহাতেও উপেক্ষা করা উচিত নয়। দৃশ্যমনোহারিত্ব ও আমোদ-সুখ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু সমাজের ধর্ম্মনীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় কিনা তাহা কি আর বহু বাক্যে বুঝাইয়া দিতে হইবে ? এদেশে কুলজা কামিনীকে অভিনেত্রী রূপে প্রাপ্ত হওয়া এক কালেই অসম্ভব, স্ত্রী অভিনেত্রী সংগ্রহ করিতে গেলে কুলটা বেশ্যা-পল্লী হইতেই আনিতে হইবে। ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শুনা যায় ? ইহাও কি সহ্য হয় ? ইহাও যে এই রাজধানীতে এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনো সম্প্রদায় কর্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে ? শতবর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এদেশে নাটকাভিনয় রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল ; তবু যেন এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্ম্মনীতি-ঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃ সমাজ অবলম্বন না করেন ! অধিক আর বলিতে চাহিনা।...

এক্ষণে উপসংহার কালে এই প্রার্থনা, যে, তাঁহারা যত আমোদ করুন; যত প্রকার দৃশ্যকাব্যের অভিনয় প্রদর্শন দ্বারা সাধারণের যত অনুরাগভাজন হউন ধনে মানে ও নামে পূর্ব্বাপেক্ষা পুনর্ব্বার শতগুণে কৃতকার্য্য হউন ; কিন্তু যেন

তাঁহাদের আদ্যাবস্থার প্রতিজ্ঞা ও উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়েন—যেন জাতীয় নাট্য-সমাজ রূপ মহোচ্চ উপাধির কার্য করিতে ত্রুটী না করেন—যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কুপ্রথা, কুব্যবহারের সংশোধনে তিলমাত্র শিথিলযত্ন না হয়েন—আবার যেন সেই কুরীতি প্রভৃতি দূরীভূত করিতে গিয়া ওপক্ষের অন্তিম সীমায়, অর্থাৎ একবারে স্বদেশের পূর্ব্ব সর্ব্ব অতি মন্দ, ইউরোপীয় সকলেই উত্তম, আমাদের যত রীতি নীতি সব অধম, সকলেই সংস্কার, পরিবর্তন, বা মূলোৎপাটনের যোগ্য এরূপ অতিগমনশীল ভয়ংকর বুদ্ধির লোনাপানি খাইয়া রুগ্ন হইয়া না পড়েন !—যেন কেবলই আমোদের দিগে লক্ষ্য রাখিয়া দেশের রুচিকে কদর্য্য পথে চালিত না করেন—যেন কুরসিকতা ও ভণ্ড রসিকতা অধিকাংশ লঘুচেতা শ্রোতৃবর্গের আপাততঃ ভাললাগে বলিয়া কুরসিক লেখকদিগকে উৎসাহ না দেন—যেন যথার্থ সৎকবি, সুরসিক, সুভাবুক নাট্যকারগণকেই আপনাদের প্রিয় লেখক ও প্রিয় নিয়ন্তা করিয়া তুলেন—যেন মাদকোন্মত্ততাদিরূপ সামাজিক পাপে আপনাদের কাহাকেও লিপ্ত হইতে না দেন এবং যাহাতে দেশমধ্যে ছোট বড় তাবৎ লোকে সেসব পাপের প্রতি ঘৃণা করে, এমন তেজস্বী, যশস্বী ও মনস্বী, অভিনয় দ্বারা যথার্থই স্বজাতির পরমহিতৈষী নটসমাজ রূপে সভ্য অবনীতে পরিচিত হইতে পারেন। ...[১]

মনোমোহনের এই বক্তৃতাটির গুরুত্ব নানা কারণে। বঙ্গীয় নাট্যশালার আদিপর্বের ইতিহাস রচনায় অনেকেই এই বক্তৃতার সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর নাট্যচিন্তার দলিল হিসাবেও এর মূল্য যথেষ্টই। শুধুমাত্র নাট্যকার রূপেই নয়, নাট্য-আন্দোলনের উৎসাহী কর্মী হিসাবেও মনোমোহনের ভূমিকা স্মরণীয়। আজকের পাঠক এই বক্তৃতার সাক্ষ্যে সেই নাট্যকর্মীকেও বুঝতে পারবেন।

৬

মনোমোহনের রচনার মধ্যে নাটকের সংখ্যা অধিক হলেও তাঁর রচিত 'পদ্যমালা' (৩ খণ্ড), 'দুলীন' (১৮৯১), সত্যনারায়ণ-কথা (১৯২১) ইত্যাদি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিশুপাঠ্য পদ্যমালা তিন খণ্ডে (১৮৭০, ১৮৮২, ১৮৯৪) প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য লেখা হলেও পদ্যমালায় মনোমোহনের কবিত্বশক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলি গ্রাম্যজীবনের নিত্যদিনের চোখে দেখা সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা। 'নিদ্রাভঙ্গ', 'ঝড় ও বৃষ্টি', 'বর্ষা', 'বুধিগাই'—'মাতৃস্নেহ, 'আনারস', 'পেয়ারা', প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য। 'নিদ্রাভঙ্গ' কবিতাটি সেকালে সকলের মুখে মুখে ফিরত। নিচে কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত হল :

রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয়ধন,
কাক ডাকিতেছে, কর রে শ্রবণ

১. জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতা ; মধ্যস্থ, পৌষ ১২৮০। পৃ. ৬১৩-২৫।

উঠেছে প্রবোধ, উঠেছে বিপিন,
চারু, চুণী, মতি, উঠেছে নবীন ;
সেজে এসে অই ডাকিছে তোমায়
তুমি গেলে তা'রা বিলম্বে তোমার
তাই বলি, যাদু ঘুমিও না আর ।

'ঝড় ও বৃষ্টি' কবিতাটির কয়েক পংক্তিও উদ্ধার করা যেতে পারে ঃ

হুড়্ হুড়্, দুড়্, দুড়্, মেঘ ডাকিছে ;
মাঠ পথ ছেড়ে লোক বাড়ী আসিছে ।
চিক্ মিক্ বিদ্যুতের আলো জ্বলিছে,
'চোক্' গেল ব'লে লোক চোক্ ঢাকিছে ।
কড় কড়্, হড় হড়, বাজ পড়িছে,
কাণ ধায়, প্রাণ যায়, বুক কাঁপিছে । ইত্যাদি

সেকালের প্রায় বিদ্যালয়েই 'পদ্যমালা' পাঠ্যতালিকায় স্থান পেয়েছিল । সুকুমার সেন মনোমোহন ও যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

'সরল শিশুপাঠ্য কবিতা পুস্তকের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের তিন ভাগ 'পদ্যপাঠ' (১৮৬৮-৬৯) এবং নাট্যকার মনোমোহন বসুর পদ্যমালা (১৮৭০) ।[১]

মনোমোহনের জীবৎকালের মধ্যেই এই সচিত্র শিশুপাঠ্য 'পদ্যমালা' গ্রন্থের ৪৭শ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল । মনোমোহনের ডায়েরিতে পদ্যমালা সম্পর্কে অনেক অজানা খবর পাওয়া যাবে ।

মনোমোহনের জীবৎকালে প্রকাশিত ৩২শ সংস্করণ পদ্যমালা (১ম ভাগ) আমরা দেখেছি ।[২] পদ্যমালা দ্বিতীয় ভাগের নবম সংস্করণে (মাঘ, ১৩১৯) শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে অর্থাৎ

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খন্ড)—সুকুমার সেন ; পৃঃ ১৬৮ ।

২. মনোমোহন এই দ্বাত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (১৮১৯ শক । ৬ই চৈত্র ১৩০৪ সাল ।) লিখেছেন ঃ 'পাঠ্য নির্ব্বাচন সমিতির (Text Book Committee) অভিপ্রায় অনুসারে এবারে কয়েকটি গ্রাম্য এবং যাহাতে অল্পাংশেও বীভৎস রসের সঞ্চার করিতে পারে, এমন পদ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যে ও পুস্তকের সাধারণ উন্নতিসাধনার্থ বিশেষ মনোযোগে স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন, সংশোধন সংবর্দ্ধন করিবার পর শিক্ষাসমিতির অনুমোদিত হইয়াছে । ভরসা করি, তৎফলস্বরূপ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয়গণের অধিকতর কৃপাকর্ষণে সমর্থ হইবে । শ্রীমনোমোহন বসু / ৭৩।৩ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

মনোমোহনের মৃত্যুর ঠিক একবছর পরে পদ্যমালা প্রথম ভাগের ৪৮টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

সেকালের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে 'পাঠ্যপুস্তক' নির্বাচিত হওয়ায় পদ্যমালার এক একটি সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হত। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকেও এর জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল।[২] নুটবিহারী মজুমদার, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এবং সারদাচরণ দে, এই তিনজন বেআইনীভাবে পদ্যমালা (১ম ভাগ) প্রকাশ ও বিক্রয় করবার অপরাধে হাইকোর্টে অভিযুক্ত হন। এই মামলার ফরিয়াদী ছিলেন মনোমোহনের প্রপৌত্রগণ।[৩]

মনোমোহনের ঐতিহাসিক নবন্যাস 'দুলীন' (১৮৯১) মহারাজা রণজিৎ সিংহের জীবনাবলম্বনে রচিত। 'দুলীনের আশ্চর্য্য জীবন' ধারাবাহিক মধ্যস্থে ছাপা হয়। সাপ্তাহিক পর্বে এবং অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে যায়, পরে মধ্যস্থ মাসিকে পরিণত

১. 'পদ্যমালা দ্বিতীয় ভাগ' নবম সংস্করণ গ্রন্থের শেষ মলাটের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় মনোমোহনের জীবদ্দশায় তাঁর বইয়ের কতগুলি সংস্করণ হয়েছিল। রামাভিষেক নাটক ও প্রণয় পরীক্ষা নাটক পঞ্চম, সতী নাটক সপ্তম, হরিশ্চন্দ্র নাটক অষ্টম, পদ্যমালা ১ম ভাগ ৪৮শ ঐ দ্বিতীয় ভাগ ৮ম, ঐ তৃতীয় ভাগ ১ম সংস্করণ হয়েছিল। এছাড়া 'দুলীন, অর্থাৎ মহারাজ রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত সর্ব্ব প্রশংসিত অতি উচ্চ-ধরনের ঐতিহাসিক বৃহৎ নবন্যাস, বিলাতী বাঁধাই'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ, পার্থপরাজয় ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর জীবৎকালের মধ্যেই। কিন্তু রাসলীলা, আনন্দময় নাটক, হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক ও সামাজিক, বক্তৃতামালা, নাগাশ্রমের অভিনয়, এবং মনোমোহন গীতাবলীর কোন সংস্করণ তাঁর জীবৎকালে হয়নি। এই বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হয় 'বসু এণ্ড কোং, মনোমোহন লাইব্রেরী, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা' থেকে। এই বিজ্ঞাপনের শেষাংশ থেকে জানা যায়—'মনোমোহন বাবুর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ প্রোফেসর বসু প্রণীত 'অপূর্ব্ব ভ্রমণ বৃত্তান্ত' ২য় সং (অতি উপাদেয় চিত্তহর গ্রন্থ) মাত্র একটাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানা যায় যে—'খৃঃ ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে উল্লিখিত সমস্ত পুস্তক রেজিষ্ট্রার জেনারেল অফিসে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে, সুতরাং যে কেহ ঐ সকল পুস্তকের কপিরাইটে-র বিরুদ্ধে কোনরূপ অপরাধ অর্থাৎ পুনর্মুদ্রাঙ্কণ, আংশিক অপহরণ, রূপান্তর ভাবে গ্রহণ বা বিনানুমতিতে অনুবাদিত করিবেন, তিনি আদালতে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।'

২. ১৩৫১ সালে পদ্যমালার (১ম ভাগ) ৭১তম সংস্করণ হয়। এই সংস্করণ সৌরেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর দি পাবলিসিটি ষ্টুডিও (১৬৭/২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট) থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. এ প্রসঙ্গে পদ্যমালা ১ম ভাগের (১৩৫১) শেষ মলাটের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়:—'কিছু-কাল যাবৎ শ্রীযুক্ত নুটবিহারী মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ দে নামক তিনজন বিভিন্ন পুস্তক বিক্রেতা আইন বিরুদ্ধভাবে কবিবর ৺মনোমোহন বসু প্রণীত পদ্যমালা ১ম ভাগ প্রকাশ ও বিক্রয় করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ৺মনোমোহন বসুর পৌত্রগণ উল্লিখিত প্রথম পুস্তক বিক্রেতার নামে মহামান্য হাইকোর্টে নালিশ করায় তিনি এবং অপর দুইজন পুস্তক বিক্রেতা স্ব স্ব প্রকাশিত সমুদয় অবিক্রীত পদ্যমালা ১ম ভাগ উহার স্বত্বাধিকারিগণকে অর্পণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও পদ্যমালা ১ম ভাগ প্রকাশ করিবেন না, এই সর্তে আবদ্ধ হইয়াছেন।

অতএব এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, যে কেহ পদ্যমালার কপিরাইটের বিরুদ্ধে কোনওরূপ অপরাধ অর্থাৎ পুনর্মুদ্রণ আংশিক অপহরণ রূপান্তরিতভাবে গ্রহণ বা বিনা-অনুমতিতে অনুবাদাদি করিবেন তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।'—এই বিজ্ঞাপনটি সৌরেন্দ্র-কৃষ্ণ বসু স্বাক্ষরে প্রচারিত হয়।

হলে 'দুলীন' পুনঃ প্রকাশিত হতে থাকে।[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে পুনঃ প্রকাশের সময় পূর্বে প্রকাশিত কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

মনোমোহনের মৃত্যুর ন'বছর পরে প্রকাশিত হয় তাঁর 'সত্যনারায়ণ কথা' (১৯২১)। এটি প্রকাশ করেন তাঁর পৌত্র অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু। 'সত্যনারায়ণ কথার' ভূমিকায় ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন :

> আমার পূজ্যপাদ পিতামহ কবি নাট্যকার স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই সত্যনারায়ণ কথা রচনা করেন। তিনি আশৈশব স্বগ্রামে ছোট জাগুলীয়ায় প্রাচীন কবি রচিত মনসা পুঁথি ও সত্যনারায়ণ পুঁথি পর্ব্বে পর্ব্বে পাঠ করিয়া গ্রামবাসী পুরনারীগণের মনোরঞ্জন করিতেন। কিন্তু প্রাচীন সত্যনারায়ণ পুঁথি তেমন সুবোধ ও সুললিত ছিল না। সেই কারণে, গ্রামবাসীগণ বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ বহুদিন যাবৎ একখানি সরল অথচ উপদেশমূলক সত্যনারায়ণ কথার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। এই অভাব মোচনার্থ গ্রামবাসীগণের প্রধানতঃ আত্মীয় ৺উমেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুরোধে এবং কুলপুরোহিত ৺কালাচাঁদ ঘটক মহাশয়ের উদ্যোগে ১২৭৮ সালে তিনি এই সত্যনারায়ণ কথা রচনা করেন।...কবিবরের জীবদ্দশায় ৺কালাচাঁদ ঘটক মহাশয় এই সত্যনারায়ণ কথা গ্রামবাসীগণের বাড়ীতে পাঠ করিতেন ; এখনও এই কথা জাগুলীয়ার ঘরে ঘরে সুর সংযোগে পঠিত হইয়া কবি-কীর্তি সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে।...এই সরল, সদুপদেশমূলক, কবিত্বরত্নখচিত মনোমোহন সত্যনারায়ণ কথা এতকাল জাগুলীয়ায় আবদ্ধ ছিল। ভরসাকরি এইবার ইহা বঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই গৃহে গৃহে আদরের সামগ্রীরূপে বিরাজ করিবে।[২]

মনোমোহনের শেষ রচনা পৌরাণিক নাটক 'সতীর অভিমান' ধারাবাহিকভাবে নাট্য

---

১. 'দুলীনে'র আশ্চর্য্য জীবন' (মধ্যস্থ ১২৭৯—৮২), ১২৭৯ সালের বৈশাখ-চৈত্র অর্থাৎ প্রথম বর্ষ 'মধ্যস্থে' নিয়মিত প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে (১২৮০) বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত প্রকাশ বন্ধ থাকে। এ সম্পর্কে মনোমোহন লেখেন—'বহুকালের' পর পুনর্ব্বার আমরা আমাদিগের প্রিয়তম, মান্যতম ও বিজ্ঞতম বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত দুলীন বাবুর অথবা তৎকাল খ্যাত দুলীন সাহেবের আশ্চর্য জীবন বিবরণে হস্তক্ষেপ করিলাম। এরূপ বিষয়ের বিরতি জন্য সাপ্তাহিক পত্রাপেক্ষা মাসিক পুস্তক সমধিক উপযোগী। সাপ্তাহিক মধ্যে স্থল সংকীর্ণ ; প্রচলিত নানা ব্যাপারে সাপ্তাহিক ব্যাপৃত ; সাপ্তাহিক সম্পাদক রাশি রাশি সংবাদপত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত ; সাপ্তাহিক লেখনী প্রতি প্রবন্ধের দীর্ঘতা ভয়ে সদা শঙ্কিত, অথচ এরূপ আখ্যায়িকান্তর্গত অভাববশতঃ এক এক অধ্যায় এক একবারে না লিখিলেও অঙ্গ-ভঙ্গ ও তৃপ্তি ভঙ্গের চিন্তায় অল্প প্রকাশে অনিচ্ছুক। যে অপ্রার্থনীয় দৈহিক পীড়ার কারণে মধ্যস্থ এক্ষণে মাসিক হইয়াছেন...ফলতঃ মধ্যস্থ মাসিক হওয়াতে কোনো কোনো প্রকরণের খর্ব্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু পূর্বাপেক্ষা হস্ত পদ প্রসারণে সমর্থ হইতে পারিবে,'—মধ্যস্থ, অগ্রহায়ণ ১২৮০। পৃ. ৫৮১।

২. সত্যনারায়ণ কথা—মনোমোহন বসু ; গ্রন্থের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত। পৃ. i—ii।

মন্দিরে প্রকাশিত হয়েছিল।[১] নাট্যমন্দির পত্রিকার সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধ না এড়াতে পেরে মনোমোহন শেষ বয়সে কলম ধরেছিলেন।[২]

সারাজীবন মনোমোহন অজস্র বক্তৃতা দিয়েছেন। এর কয়েকটি তাঁর জীবদ্দশাতেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'হিন্দু আচার-ব্যবহার, ১ম ভাগ—পারিবারিক' জাতীয় সভায় পঠিত বক্তৃতার সংকলন, প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ 'হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক ও সামাজিক' নামে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে হিন্দুমেলার অধিবেশনে 'হিন্দু আচার ব্যবহার—সামাজিক'—এই দ্বিতীয় ভাগটি পঠিত হয়। এই দুটি বক্তৃতার সংকলন একত্রে প্রকাশিত হয় 'হিন্দু আচার ব্যবহার—পারিবারিক ও সামাজিক (১৮৮৭)' নামে। 'হিন্দু আচার ব্যবহার—প্রথম ভাগ পারিবারিক' গ্রন্থটি মনোমোহন জাতীয় সভা ও হিন্দুমেলার দুই প্রাণপুরুষকে[৩] উৎসর্গ করেছিলেন।

---

১. সতীর অভিমান। / (পৌরাণিক নাটক) / (আদি নাট্যকার—শ্রীমনোমোহন বসু বিরচিত।)—নাট্যমন্দির, অগ্রহায়ণ—১৩১৭ শ্রাবণ—১৩১৮।

২. 'পূজ্যপাদ কবি কুলতিলক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসুর নাম সমগ্র বঙ্গদেশে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর নিকট সুপরিচিত। তাঁহার "রামের রাজ্যাভিষেক" "সতী নাটক" "হরিশ্চন্দ্র" "প্রণয় পরীক্ষা" ইত্যাদি ন্যটকাবলী যে এক সময়ে বঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, একথা কে না জানেন? তাঁহারই দৃষ্টান্তে—তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত শত ব্যক্তি যে নাটক লিখিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আমায় পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সেই স্নেহের সুবিধা গ্রহণ করিয়া আমি তাহাকে নাট্য মন্দিরে লিখিবার জন্য বিশেষ করিয়া ধরিয়াছিলাম। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সীমা নাই। তিনি আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আবার লেখনি ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার অমৃতময়ী ভাষার ললিতলহরী প্রত্যেক বঙ্গবাসীর প্রাণ পুলকে ও প্রমোদে নাচাইয়া তুলিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই'—সম্পাদক, নাট্যমন্দির অগ্রহায়ণ ১৩১৭ ; পৃ. ৩৭০।

৩. 'হিন্দু আচার ব্যবহার/প্রথম ভাগ—পারিবারিক/১২৭৯ সালের ১৭ই আশ্বিন/জাতীয় সভায়/শ্রীমনোমোহন বসু কর্তৃক/বিবৃত/কলিকাতা/সিমুলিয়া ২০১ নং করনওয়ালিস্ ষ্ট্রীট/মধ্যস্থ যন্ত্রে/শ্রীরামসর্বস্ব চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত। /শকাব্দ ১৭৯৪/ফাল্গুন। পৃ. ৬৮। মনোমোহনের লেখা উৎসর্গ পত্রটি উদ্ধৃত হল :

'নানা গুণালঙ্কৃত স্বদেশহিতৈষী ভক্তি প্রেমাস্পদ
শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়
তথা
শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয়
সুহৃজ্জন সমীপেষু,

সানুরাগ সসম্মান নিবেদনমেতৎ

'হিন্দু আচার ব্যবহার, ১ম ভাগ—পারিবারিক' প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতে চলিল। কিন্তু সাধারণের হস্তে সাহসপূর্বক অর্পণ করা যায়, এমন বস্তু ইহাতে কি আছে? তবে যদি আপনারা সানুগ্রহে ইহাকে স্পর্শ করিয়া কোনো সূত্রে আপনাদের দেশব্যাপ্ত নাম ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে দেন, তবেই ভরসা হইতে পারে।

আমার এ প্রার্থনাও অসঙ্গত হইত কেবল আপনারা স্বভাবতাই ঔদার্য্যশীল এবং আমার প্রতি স্নেহবান, এ দুটী কথা আমার জানা আছে ; আমি তৎপ্রতিই নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম।

চৈত্র বা হিন্দুমেলায় প্রদত্ত বক্তৃতা, বারুইপুর মেলার বক্তৃতা, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সংকলন 'বক্তৃতামালা' (১৮৭৩)।[১] এ ছাড়া মনোমোহনের অজস্র বক্তৃতা ও রচনা আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি।[২]

'মনোমোহন গীতাবলী' (১৮৮৭),[৩] তাঁর লেখা যাবতীয় গানের সংকলন। মনোমোহন গীতাবলী প্রকাশিত হলে ভারতী পত্রিকায় সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয় :

এ পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা যে শুধু কাব্যপাঠ জনিত প্রীতিলাভ করি এমন নহে—কিছুদিন পূর্ব্বে সমাজে কিরূপ আমোদ প্রমোদ প্রচলিত ছিল, এসব সম্বন্ধে

তদ্ব্যতীত এই সাহসিকতার আরো গুরুতর উপলক্ষ আছে ;—যে জাতীয় সভার বিগত ১৭ই আশ্বিনের অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হয় ; আপনারা সেই সভার অনুষ্ঠাতা ও পালয়িতা। বিশেষতঃ আপনাদের মধ্যে এক মহাশয় ঐ অধিবেশনের পূর্ববর্তী ভাদ্রীয় অধিবেশনে 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামা সমস্ত ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ড পর্যন্ত সর্বস্থানের চমৎকৃতি-জনক ও হিন্দু সমাজের সর্বশ্রেণীর শ্রেয়ঃসার্থক একটী বক্তৃতা দিয়া হিন্দু ধর্ম-কর্ম-আচার-ভক্তজনের সাহস পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল ! সে বক্তৃতা অগ্রেই যেন সুচারু কর্ষণ দ্বারা সমাজ ক্ষেত্রে বীজবপন করিল ; এ বক্তৃতা তদুপরি মৈ টানিয়াছিল ; এই পর্যন্ত ! তাহাও যে টানিয়াছিল, সে কেবল আপনাদের স্নেহ ও সঙ্গ-সাহসে, এই বৈ তো নয়। এখনও সেই স্নেহের বশেই ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে—এখনও আপনাদের নাম-সাহায্য দান করিয়া যাহাতে সহৃদয় পাঠক-সাধারণের প্রশ্রয়লাভে বঞ্চিত না হই, তাহা করিতে হইবে, এই আমার প্রার্থনা !

কলিকাতা
ফাল্গুন ১২৭৯ সাল

অনুরক্ত প্রীতি-বাধ্য
শ্রীমনোমোহন বসু

পুঃ নিঃ 'সভাতে যাহা শুনিয়াছিলেন, ইহাতে প্রায় তাহাই আছে ; কেবল কোনো কোনো স্থলে বাক্যগত যৎসামান্য পরিবর্তন এবং সর্ব্বশেষে অন্তঃপুরের আচার ব্যবহার প্রকরণে কিঞ্চিৎ নূতন লেখার সংযোগ হইয়াছে ; এইমাত্র।'

১. 'বক্তৃতামালা'য় সংকলিত বক্তৃতার তালিকা—দ্বিতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলার বক্তৃতা '(চৈত্র-সংক্রান্তি, শনিবর ১৭৮৯ শক)। 'তৃতীয় বার্ষিক চৈত্রমেলার কর্ত্তব্যবিষয়ক ও উৎসাহ সূচক বক্তৃতা' (৩০শে চৈত্র ১৭৯০ শক)। হিন্দুমেলার উৎসাহসূচক বক্তৃতা (৩০শে মাঘ ১২৭৮)। বারুইপুর মেলার বক্তৃতা (১২৭৮ সাল, ফাল্গুন-সংক্রান্তি)। বিদ্যালয়ের ছাত্র ; ছাত্রের প্রতি কর্ত্তব্য (ছোট জাগুলীয়া-হিতৈষী সভায় বিবৃত, পৌষ ১৭৮৮ শক)।

২. 'সতীর অভিমান' (নাট্যমন্দির ১৩১৭-১৮) নাটকটি আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। এছাড়া সমকালীন পত্র পত্রিকায় তাঁর অনেক মূল্যবান রচনা প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংবাদ প্রভাকর, অনুসন্ধান, গান ও গল্প ছাড়াও মধ্যস্থে তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা বক্তৃতা আত্মগোপন করে আছে সেগুলির উদ্ধারের প্রয়োজন। অদ্যাবধি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত মধ্যস্থের কিছু উল্লেখযোগ্য রচনার তালিকা উদ্ধার করা হল : জয়াবতী (১২৭৯-৮০), কুলীনচাঁদ (১২৭৯-৮০), জাতীয়ভাব ও জাতীয় মেলা (চৈত্র ১২৮০), নাট্যশালা (ফাল্গুন ১২৮০), জাতীয় নাট্যসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবকালে মনোমোহন বসুর বক্তৃতা (পৌষ ১২৮০), জাতীয় সভা (ভাদ্র ১২৮০) জয়াবতী (ঐতিহাসিক উপাখ্যান, ১২৭৯-৮০) চাষার খেদ (পদ্য, ১২৮০), রায়জী মহাশয় (১২৮০), বঙ্গীয় কবি ও কাব্য (১২৮০) ইত্যাদি।

৩. মনোমোহন-গীতাবলী।/অর্থাৎ/বাবু মনোমোহন বসু-কৃত হাফ আখড়াই, কবি, নাটক, গীতাভিনয়, পাঁচালি প্রভৃতি বিবিধ গান।/কলিকাতা ২০১ নং করনওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরির/অধ্যক্ষ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত।/কলিকাতা।/১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন/গ্রেট ইডেন প্রেস,/শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত/মাঘ, সন ১২৯৩ সাল/ইং ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭।

সমাজের তখন কিরূপ রুচি ছিল—ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থে হাফ আখড়ায়ের একটি ইতিহাস আছে ইতিহাসটিও বিশেষ প্রীতিপদ।[১]

মনোমোহনের ভারতচিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে হিন্দুমেলার বক্তৃতা ও নাটকের গানের মধ্যে। মনোমোহন গীতাবলীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক গান বিভাগে ১২৮০ সালে অনুষ্ঠিত বারুইপুর হিন্দুমেলার জন্য গোবিন্দ অধিকারীর সুরে রচিত 'তাই বলি, বল ভাই, হিন্দুমেলার জয় জয়।' 'দিনের দিন সবে দীন, হ'য়ে পরাধীন! এবং 'নরবর নাগেশ্বর শাসন কি ভয়ংকর? দে কর, দে কর, রব নিরন্তর;—করের দায় অঙ্গ জর জর!' প্রভৃতি গান স্বাদেশিকতার এক বলিষ্ঠ নিদর্শন। হিন্দুমেলার যুগে মনোমোহনের গান প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল; পরবর্তীকালে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদ প্রমুখ রচিত স্বদেশী সঙ্গীতের জনপ্রিয়তার জোয়ারে মনোমোহনের লেখা স্বদেশী গানের কদর কমে যায়। এর কারণ দেখিয়ে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন:

> তাঁহার (মনোমোহন বসু) অধিকাংশ গানই সমসাময়িক 'রাজনৈতিক ঘটনা লইয়া রচিত, একালের পাঠকের কাছে উহার মূল্য অল্প।...গানগুলির ভাষা যত সরল, তত সুষ্ঠু নয়। হাফ আখড়াই বা দাঁড়া কবির রচনার ন্যায় ইহাতে শব্দের চমক আছে কিন্তু পদের চারুতা নাই। পরবর্তী যুগের স্বদেশী গান কবিতা হিসাবেও উপভোগ্য, মনোমোহনের গান ছড়ামাত্র। সুর ছাড়া উহা প্রায় নিরাশ্রয় এবং এই গানের সুর আজ মনে নাই বলিয়া ইহার কথা ও ভাবও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু যাহা একদিন লোকের মুখে মুখে সারা বাঙ্গালা দেশে ছড়াইয়াছে তাহা এক পবিত্র সামগ্রী হিসাবে আদরণীয়। উহা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পূর্ব কথা।[২]

তাই দেখা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের সময় মনোমোহন প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়েছেন। মনোমোহনের গানে পাওয়া যায় জাতীয়তাবোধের প্রকাশ। তাঁর গানে জাতিবৈর নাই, কিন্তু জাতীয় দুর্দশার কথা আছে। তাঁর গানে ধ্বনিত হয়েছে বিদেশী শাসনে ভারতের দুর্ভোগের কথা। জর্জ ক্যাম্বেল ও রিচার্ড টেম্পলের আমলে (১৮৭১-৭৭) করভারে জর্জরিত মানুষের দুঃখের কথা আছে মনোমোহনের গানে। লর্ড রিপনের বিদায় উপলক্ষে বেলগাছিয়া উদ্যানে যে সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও মনোমোহন বাগবাজারের সৌখিন হাফ আখড়াই দলের হয়ে গান রচনা করেছেন।[৩] এ ছাড়া 'লর্ডরিপণের গুণকীর্ত্তন'[৪] গেয়েছেন ১৮৮৪ সালে আশী জন বাউল নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে।

---

১. মনোমোহন গীতাবলী—ভারতী, বৈশাখ ১২৯৪; পৃ. ৬৪।
২. মনোমোহন বসুর স্বদেশী গান—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত; দেশ, ৫ ফাল্গুন ১৩৬২।
৩. মনোমোহন গীতাবলী; পৃ. ২২৫
৪. তদেব; পৃ. ২২৩

সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক সভার জন্য ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে রচিত গানেও[১] মনোমোহনের স্বদেশচিন্তার ছবি ফুটে উঠেছে। ঐ বৎসরের ২৮ বৈশাখ সাবিত্রী লাইব্রেরীর ষষ্ঠ বাৎসরিক অধিবেশনে গাওয়া "উন্নতির উন্নতি উল্লাস ভারতী; কেন দিবারাতি বল রে ?"[২] গানটির মধ্যে দেশের দুর্গতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির হিন্দু কমিশনারেরা কলকাতায় দুটি কসাইকালী[৩] স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই উপলক্ষে মনোমোহনের লেখা 'আয়রে ভাই সবাই মিলে' গানটি নগর সংকীর্তনে গাওয়া হয়।

১২৯২ সালে ভারত-সভার সাম্বৎসরিক উৎসবে 'মহারাণী ভিক্টোরিয়া' নাটক রচনার ভার পড়ে মনোমোহনের উপর, শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে রচনা সমাপ্ত হয়নি। এই নাটকের একটি গান সেকালের সংবাদপত্রে প্রচারিত হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ গানের মধ্যে মনোমোহন সমকালের ভারতবর্ষের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছিলেন। এই দীর্ঘ গানটির[৪] আংশিক উদ্ধৃতি থেকেও মনোমোহনের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাবে :

> কোথায় মা ভিক্টোরিয়া, দেখ্ আসিয়া ইণ্ডিয়া তোর চল্‌ছে কেমন্ !
> ছিল মা সুখের রাজ্য, ধরা পূজ্য; আর্য্যধাম্ এই ভারত্‌ভুবন।
> বাণিজ্য ধন্ ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য, আশ্চর্য্য সং ছিল তখন।১।
> তারপরে জোর্ প্রভুত্ব, ঘোর দৌরাত্ম্য, সত্য বটে ক'র্ত্তো যবন ;
> কিন্তু মা এমন্ ক'রে, অন্নের তরে, কাঁদ্‌তো না লোক্ এখন্ যেমন্।২।
> এখন্ এই পোড়া দেশে কপাল দোষে, হ'য়েছে সব্ উল্টো ঘটন্—
> ছারপোকার্ বিয়েন্ মতন্, নিত্যনূতন, আইনে দেশ্ হয়্ জ্বালাতন।৮।
> জেলাতে রন্ মাজিস্টর, ইনিস্পেক্টর, পুলিশের চর সাক্ষাৎ শমন্ ;
> জোরে কেউ হাইটী তুল্লে, গানটি ধ'র্ল্লে, ঢোলটী পিট্‌লেও করে বন্ধন।৯।
> তাই বলি সোনার দেশে, শাসন দোষে, ধনে মানে প্রজার মরণ্—
> একে তো রোগে জরা—ট্যাক্সে মরা—মাম্‌লায় সারা, সারা জীবন্।১২।
> দেশে নাই লাঠালাঠি, কাটা কাটি, চোর ডাকাতি আগের মতন্ ;
> শাসক্ জাত্ করেন গর্ব্ব,—"তাঁরা সভ্য !"—তবু পর্ব্ব কেন এমন্ ? ।১৩।

---

১. মনোমোহন গীতাবলী পৃ. ২২৫

২. তদেব পৃ. ২২৭

৩. এ সম্পর্কে জানা যায়—'সাহেবদের ও মুসলমানদের যেমন 'স্লটার হাউস' নামা কসাইখানা আছে, হিন্দুপল্লী-বাসীদের নিমিত্তও তেমি একটা বাড়ার ভাগ, সেই দুই কসাইখানায় এক একখানি কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিবার কল্পনা শুনিয়া অধিকাংশ হিন্দু মহা ভয় পাইয়া সভা ও দরখাস্ত প্রভৃতি উপায়ে তাহা এবং সেই সঙ্গে শহরে ছুটলে কসাই-কালীর দোকান যত ছিল, তৎসমুদয় রহিত করিতে সমর্থ হইয়া সিমুলিয়া ভট্টাচার্য্যের বাগান (যেখানে উহা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রস্তাব ছিল) হইতে উক্ত সালের ২৪ মে অথবা ১২৯৩ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ দিবসে মহা সমারোহে নগর সংকীর্তন বাহির করিয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।'—মনোমোহন গীতাবলী পৃ. ২২৬-২২৭।

৪. মনোমোহন গীতাবলী, 'ভিক্টোরিয়া-গীতি' ; পৃ. ২২৮-৩২।

পঙ্গপাল্ শ্বেত পুরুষে হেথায় এসে, গ্রাসে দেশের সকল্‌সার্ ধন্ ;
পড়ে রয় যে খোসা ভুষি—আগ্‌ড়া ঘাসি—তাই খেয়ে রয়্ মোদের জীবন্ ।।৫৪।
আর একটি গানের আংশিক উদ্ধৃতি থেকে জানা যাবে মনোমোহন কিভাবে অনুকরণপ্রিয় বাঙালীকে ব্যঙ্গ করেছিলেন ঃ

হায় দেশের হ'লো কি ? সব দেখি মেকি ।
প্রবল ধলোর নকল শিখে, দুর্ব্বল্ কালোর্ বুজরুকি !
সেই, কালোর্ গায়ে ধলোর পোষাকে, ময়ূর পাখ্ যেন দাঁড় কাকে !
সেই, বিট্‌কেল্ জন্তু দেখে তাকে, বিজ্ঞলোকে হয়্ দুখী !

এখন্, "ন্যাসন্যাল্‌টি' আর লিবার্টি", কথায়্ কথায়্ কয়্ !
কিন্তু কাজের্ বেলা বিজাতী চা'ল্—স্বজা'ত্ ঠেলা রয় !
যাদের নকল্ করে, তাদের ঘরে এমন্ কি কেউ সয় ?
তোদের ! নেসন্ কৈ তার ন্যাসন্যাল্‌টী !—তোরাই তো মজালি ঘরটী—
ভ্যাজাল দে খাঁটিকে মাটি, কর্লিরে ঘরের ঢেঁকি ![১]—ইত্যাদি

হিন্দুমেলার যুগে বাঙালী আগে চেয়েছিল জাতীয়তা, পরে স্বাধীনতা। এই জাতীয়তার কথা পাওয়া যাবে মনোমোহনের গানে। 'ভিক্টোরিয়া গীতি'-তে সে যুগের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রায় সমস্ত কথা ধরা আছে। এই 'ভিক্টোরিয়া গীতি'-তে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কথা। বস্তুতঃ মনোমোহনের গানে প্রতিবাদের ভাব না থাকলেও ক্ষোভের ভাব আছে পূর্ণ মাত্রায়। মনোমোহন বুঝেছিলেন বিদেশী সরকারের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশ দেখিয়ে কোন লাভ নাই ; আগে স্বদেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। সেজন্যই তাঁর রচনায় সস্তা স্বদেশীয়ানার প্রশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন ঃ

বিলাতী স্বদেশীর এই নিন্দা শুনিলে আমাদের আজও পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে। বোধ হয় ঘর ভাঙিয়া দেশ গড়িবার প্রবৃত্তি এখনো দূর হয় নাই। বিদেশের দিকে তাকাইয়া স্বদেশকে দেখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা আমরা কেহই করি না একথা বলিতে পারি না, একেবারে স্বদেশী ভাব যেন বড় পুরানো ভাব—নতুন পৃথিবীর নতুন মানুষের কাছে ইহার মূল্য বোধ হয় কমিয়া আসিতেছে। তাই মনে হয়, মনোমোহনের গানগুলি আজ অনেকের কাছে আবোল তাবোল বলিয়া ঠেকিতে পারে। তবে যাঁহারা স্বদেশ নামে একটী কোন বস্তুকে আঁকড়াইয়া রাখিতে চান তাঁহাদের কাছে এই গান অর্থহীন মনে হইবে না।[২]

মনোমোহনের গানে দেশাত্মবোধের মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। তাঁর

১. মনোমোহন গীতাবলী ; পৃ. ২০২-০৩

২. মনোমোহন বসুর স্বদেশীগান—রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ; দেশ, ৫ ফাল্গুন ১৩৬২ পৃ. ১৭৫।

সব ভাবনাই ছিল দেশকে ঘিরে। হিন্দুমেলার উৎসাহী কর্মী মনোমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"হিন্দুমেলা" কংগ্রেসের সূতিকাগার। আর সেই কংগ্রেসের ধাত্রীরা হইতেছেন—৺নবগোপাল মিত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺রাজনারায়ণ বসু, ও ৺মনোমোহন বসু। ইঁহারাই Father of Indian Nationalism. ইঁহারাই ভারতব্যাপী দেশাত্মবোধের আদিগুরু![1]

৭

সভা-সমিতির প্রতি মনোমোহনের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় হিন্দুমেলার আমল থেকেই। সারা জীবন তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে অজস্র সভাসমিতিতে। শুধু আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বক্তৃতা দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ হয়নি। সভা-সমিতি গঠনেও তাঁর আগ্রহ ছিল পূর্ণ মাত্রায়। চৈত্র বা হিন্দুমেলা, জাতীয় সভা ছাড়া বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন এগুলির গঠনপর্ব থেকেই।

১৮৭২ সালে সিভিলিয়ান জন বীমস্ (১৮৩৭-১৯০২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নয়নের জন্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' বা 'বঙ্গ একাডেমি' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে কলকাতা থেকে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। প্রকাশের পূর্বেই পুস্তিকাটির অনুবাদ বঙ্গদর্শনে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ, অনুষ্ঠানপত্র' এই শিরোনামে মুদ্রিত হয়। 'বঙ্গদর্শন সম্পাদক'-স্বাক্ষরিত মন্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন:

> যে অনুষ্ঠানপত্র উপরে প্রকটিত হইল, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জে বীমস্ সাহেব কর্তৃক বঙ্গসমাজ মধ্যে প্রচারিত হইবে। ইহা প্রচারিত হইবার পূর্বেই আমরা তাঁহার অনুগ্রহে বাঙ্গালায় প্রাপ্ত হইয়া সাদরে প্রকাশ করিলাম। বীমস্ সাহেব দেশবিখ্যাত পণ্ডিত, এবং বঙ্গদেশের বিশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃত এই প্রস্তাব যে, পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে, ইহা বলাবাহুল্য। তাহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই, এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি যে সকল বঙ্গ পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন। তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে, আমরা এই প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করিব। ইতি।
>
> —বঙ্গদর্শন সম্পাদক।[2]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন ও বঙ্গদর্শনে প্রচার সত্ত্বেও তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যানুরাগীরা বীমসের এই প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা সাহিত্যের

১. মনোমোহন বসু—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভারতবর্ষ; মাঘ ১৩৩৭; পৃ. ৩০৮।

২. বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৭৯।

স্বর্ণযুগে বীমস্ এই প্রস্তাব করেছিলেন। এসময় বিদ্যাসাগর বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যমণি। জন্ম হয়েছে মধ্যস্থ ও বঙ্গদর্শনের; হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভায় মিলিত হয়েছেন বাংলার সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। জাতীয় সভায় এবিষয়ে তীব্র সমালোচনা করে রাজনারায়ণ বসু এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন।[১] এই সভায় সভাপতিত্ব করার কথা ছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের।[২] তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন পন্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।[৩] রাজনারায়ণ বসুর প্রস্তাবিত মত এই সভা গ্রহণ করায় বাংলার পণ্ডিত সমাজ এবিষয়ে আর কোন আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। সেকালের পত্র-পত্রিকায় বীমসের প্রস্তাবের যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এসময় কর্মসূত্রে বহরমপুরে। এখানে তিনি গড়ে তুললেন বঙ্গদর্শনের লেখক গোষ্ঠী। যোগ দিলেন দীনবন্ধু মিত্র, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, লোহারাম শিরোরত্ন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জন, যাঁরা প্রায় সকলেই কর্মসূত্রে বহরমপুরে সমবেত। বঙ্কিমচন্দ্র 'ভরসা' করেছিলেন বীমসের প্রস্তাব কার্যকরী হবে। তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি একথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে এবিষয়ে তিনি অবশ্য বঙ্গদর্শনে আর কোন মন্তব্য করেন নি। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র সেকালের বিদগ্ধ সমাজের বিপক্ষে যেতে চান নি। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বঙ্কিমচন্দ্র যদি সে সময় কলকাতায় থাকতেন তাহলে হয়তো এ বিষয়ে স্থির কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান তাঁর পক্ষে সম্ভব হত।

'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ'-সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনায় মনোমোহন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বেই বলা হয়েছে মনোমোহনের মধ্যস্থকে হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভার মুখপত্র হিসাবে গণ্য করা হত। বীমসের প্রস্তাব জাতীয় সভায় আলোচিত হলে মধ্যস্থের ২৭ শ্রাবণ ১২৭৯ তারিখের সংখ্যায় এ বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ছাপা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে মনোমোহনের সুচিন্তিত মতামত সম্বলিত মধ্যস্থের উক্ত সংখ্যাটির আলোচনার পূর্বে বীমস প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও বীমসের বহুলপঠিত ও সমালোচিত

১. বর্তমান গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. এ প্রসঙ্গে মধ্যস্থে প্রকাশিত সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য—'আগামী রবিবার অপরাহ্ন সার্দ্ধ চারি ঘটিকাকালে করনওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ১৩নং ভবনে' ট্রেনিং একাডেমী বিদ্যালয়ে "ন্যাশন্যাল সোসাইটির" এক প্রকাশ্য অধিবেশন হইবেক শ্রীযুক্তবাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রধান আসন গ্রহণ করিবেন এবং শ্রীযুক্তবাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক বীমস সাহেবের প্রচারিত "বঙ্গ সাহিত্য সমাজ" ইতি প্রসঙ্গোপরি একটী প্রবন্ধ পঠিত হইবেক।—মধ্যস্থ (অতিরেক), ২৭শ্রাবণ, ১২৭৯।

৩. বর্তমান গ্রন্থের ১৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুস্তিকাটি বর্তমানে দুর্লভ।[১] এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছাকাছি পৌঁছেছে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রণালীবদ্ধ করে সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। এই সুযোগে বাংলা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতার জন্য সকল বাঙালীর প্রচেষ্টায় একটি একাডেমি গঠন করা চলে। বীমস এই প্রস্তাবে আরো বলেছেন যে ক্রমবিকাশমান বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে একটি আদর্শ ভাষা ও সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হলে অহেতুক সংস্কৃত ও নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য শব্দের ভারমুক্ত করা প্রয়োজন। এই আদর্শে একাডেমি কর্তৃক একটি অভিধান সংকলিত হবে। এই অভিধান বহির্ভূত কোন শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা চলবে না। তাহলেই ভাষা প্রণালীবদ্ধ হবে। বীমস প্রস্তাব করেছিলেন কলকাতা শহরে একাডেমির মূল সভা স্থাপিত হবে। শতাধিক সুধী সাহিত্যসেবী এই একাডেমির সদস্য হতে পারবেন। এঁদের মধ্যে ৩০ জন সদস্যকে কলকাতার অধিবাসী হতে হবে। অবশিষ্ট সদস্য বিভিন্ন স্থানের সুধীমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। একাডেমির প্রধান কাজ হবে প্রবন্ধাদি পাঠ, সভায় এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে; গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সভায় পাঠ করবেন, সভা কর্তৃক মনোনীত হলে তা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হবে। সভায় সঙ্গীতেরও আলোচনা হবে; তবে প্রাচীন কবিগানের সংগে নব্যগীতের তুলনামূলক সমালোচনায় বাংলা ভাষায় রচিত সংগীতের উন্নতি হতে পারে একই সংগে।

বীমসের এই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে মনোমোহন মধ্যস্থে যে সমালোচনা প্রকাশ করেন নিম্নে তা উদ্ধার করা হল ঃ

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাষা ও রীতি-সংস্থাপনী সভা

হুতোমের বর্ণিত বেওয়ারিস বাঙ্গালা ভাষার এত দিনে ওয়ারিসান্ হইবার প্রস্তাব হইতেছে। শ্রীযুত জন্ বিমস, বি.সি.এস মহোদয় সম্প্রতি একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। শিরোনামায় যে প্রকার সভার নাম লেখা হইল, ঐরূপ

১. বীমসের এই প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে Bengal Christian Herald, 1872. পত্রিকায় এবং সেখান থেকে Indian Daily News (5th August). পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয় সম্পাদকের মন্তব্য ছাড়া। মূল পুস্তিকাটি দুর্লভ্য। এ প্রসঙ্গে মদনমোহন কুমার জানিয়েছেন—'বীমসের রচিত এই পুস্তিকাটি কলিকাতার বিভিন্ন লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করিয়া আমরা পাই নাই, শোভাবাজার রাজ লাইব্রেরিতে পুস্তিকাটির একখানি কপি ছিল, দীর্ঘকাল পূর্বে তাহা অপহৃত হইয়াছে, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করিয়া আমরা সেখানেও এই পুস্তিকাটি পাই নাই। বীমস লিখিত পুস্তকাদির তালিকায় এই পুস্তিকাটির উল্লেখ নাই।'—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস ১ম পর্ব—মদনমোহন কুমার ; পৃ. ৪।

একটি সভা স্থাপন জন্য ঐ পুস্তকে নানা হেতুবাদের সহিত প্রস্তাব ও অনুরোধ করা হইয়াছে।

তিনি বলেন "ভারতবর্ষ মধ্যে চিত্তবৃত্তির কর্ষণ ও শিক্ষাকার্য্যে বঙ্গদেশ এতদূর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, যে অন্যান্য প্রদেশে সাহিত্যের অধুনা যে অবস্থা সে অবস্থা এখানে অনেকদিন পূর্ব্বে অতীত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য এক্ষণে ইউরোপীয় সাহিত্যের কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। অনর্থক বালকত্ব অশ্লীল গল্প অথবা বৈরক্তিজনক পৌরাণিক উপাখ্যানাদির পৌনরুক্তি, ইত্যাদির পরিবর্তে বাঙ্গালীরা আজকাল নবাখ্যান, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কাব্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিতেছেন। অতএব বাঙ্গালা ভাষার সুদৃঢ়তা ও লিখিবার রীতি পদ্ধতির একতা বন্ধন করার কাল আগত হইয়াছে।"

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করণার্থ তিনি একটি "একাডেমী" অর্থাৎ "বুধ-স-মাজ" স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন। তাহাতে শত সংখ্যক বিদ্বদ সভ্য নিযুক্ত হইবেন। তন্মধ্যে চত্বারিংশ সভ্য রাজধানীবাসী এবং অবশিষ্ট প্রাদেশিক।

ভাষার বাক্যাবলী নির্দ্ধারণ এবং বাক্য প্রয়োগের প্রণালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এই সভা হইতে হইবেক। সভা একপ্রকার পরীক্ষক ও ব্যবস্থাপক উভয় পদেই নিযুক্ত থাকিবেক। যে শব্দ সভার অভিধানে অপ্রাপ্য, তাহা ভদ্র সমাজে লিখন, পঠন ও বক্তৃতাদিতে অপ্রযুজ্য ও অগ্রাহ্য হইবে। কেহ কোনো গ্রন্থ লিখিলে, এই সভায় অর্পণ করিতে হইবে। সভা তাহার প্রতি যে মন্তব্য প্রকাশ করিবেক তদনুসারেই তাহার ভাগ্য প্রসন্ন বা অপ্রসন্ন হইতে পারিবেক, ইত্যাদি।
এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে বাঙ্গালী দিগকে তিনি অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। আর কহিয়াছেন, বাঙ্গালীর সঙ্গে ইউরোপীয়গণকে সভায় রাখা কর্ত্তব্য এবং গবর্ণমেন্ট বিশেষ রূপে এ বিষয়ে সাহায্য দান করেন, এ জন্য আবেদন করা আবশ্যক।

মেং বিমস সাহেব এ দেশীয় ভাষায় সম্পূর্ণ শিক্ষিত। তিনি যে আমাদের এবং আমাদের মাতৃভাষার একজন পরম হিতকারী বন্ধু, তা এই পুস্তক প্রকটনেই জানা যাইতেছে। তাঁহার শুভ চেষ্টার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইলাম।

বঙ্গদেশে প্রতি সপ্তাহে রাশি রাশি পুস্তকাদি প্রচার হইতেছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশের গুণ ও দশা অতি মন্দ। যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই লিখিয়া ছাপাইতেছে। সামাজিক ব্যাপারে যেমন স্বেচ্ছাচারিতা আজকাল ঘোর প্রবল, সাহিত্য-সংসারেও সেইরূপ যদৃচ্ছা-লিখিত ভাষা ও বিষয় প্রচারিত হইতেছে। উভয় পক্ষেই কোনোরূপ নিয়ম ও শাসন নাই! এ অবস্থা কোনো মতেই প্রার্থনীয় ও শুভজনক নহে। অতএব বিমস সাহেবের অনুরোধ অথবা তদ্রূপ কোনো প্রস্তাব যে আমাদের আদরণীয় হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহার প্রস্তাব গুলিন সর্ব্বাঙ্গীন সুসাধ্য এবং উপাদেয় নহে। আমরা এমন প্রার্থনীয় অনুষ্ঠানের বিরোধী নহি, কিন্তু এই প্রস্তাবের যে যে অংশ যে যে কারণে অনুমোদনীয় হইতেছে না, তাহা একে একে নিবেদন করিতেছি।

প্রথম। যখন রাজ বিধির দ্বারা সেই সভার একাধিপত্য বিধিবদ্ধ হইবার নহে, তখন লেখক ও বক্তাগণ তাহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতাকে অংগীকার করে কিনা সন্দেহ। দেশের প্রধান প্রধান বিদ্বান লইয়া সেই সভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যদিও তাবতের বিশ্বাস স্থল ও মান্যাস্পদ হওয়া উচিত, তথাপি এমন স্বাধীন ও তেজস্বী লেখক অনেক আছে, যাহারা কাহারো বিচার সাপেক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিতে ইচ্ছুক না হইতে পারে। এবং কদর্য্য লেখক শ্রেণীর মধ্যে অনেকে ভয় প্রযুক্ত-ই সভার বিচারাধীন গ্রন্থ প্রকাশের কদাচ সম্মত হইবে না।

দ্বিতীয়। কোনো গ্রন্থবিষয়ে সভা যে মীমাংসা করিবেন, তাহাই যে, অভ্রান্ত হইবেক, তাহারই বা স্থিরতা কি? উচ্চতম কবি মিলটনপ্রভৃতি যখন বহুকাল অনাদৃত থাকিয়া পরে প্রতিষ্ঠিত হন; তখন জনকত লোকের রুচির উপর নির্ভর করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। অধিকাংশ পুস্তকাদির পক্ষে যে ন্যায্য বিচার হইবেক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্পাংশের পক্ষে অবিচার হইলেও হইতে পারে। মনে করুন, কোনো কারণ বশতঃ কোনো উত্তম গ্রন্থ যদি সভ্যগণের মনোরম্য না হইয়া অধমরূপে প্রতিপন্ন হয়, তবে বংগীয় সমাজকে একখানি উপাদেয় গ্রন্থে বঞ্চিত হইতে হইবে। যদি বলেন, সুপন্ডিতগণের দ্বারা এমন ভুলের কাজ কি হইতে পারে? বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সম্বন্ধীয় ইতিহাস পাঠক মাত্রেই ইহার উত্তরে বলিবেন, যে "ইহা হইতে পারে।" প্রসিদ্ধ আবিষ্কর্তা গালিলিও পন্ডিতের জীবন বৃত্তান্ত তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের চর্চা বহুল হইয়াছে বলিয়া কি মনের প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়া উঠিয়াছে? কদাচ নহে। এককালে এক বিষয়ে যে সংস্কার, তাহা পরবর্তীকালে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মত, ভাষা, ভাব ইত্যাদি কোনো এক ব্যক্তি বা কোনো এক মন্ডলীর মীমাংসাধীন করিয়া রাখাতে অনিষ্ট বই ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। লেখনী ও মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দেওয়াতে যদিও বহুসংখ্যক অপকৃষ্ট পুস্তকাদির প্রচার রূপ মহাক্ষতি জন্মে, কিন্তু অপর পক্ষে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদিও তৎসঙ্গে আবির্ভূত হইয়া সেই ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়!

তৃতীয়। ইংরাজীতে যাহাকে "জিনিয়াস" কহে, সেই প্রতিভাশক্তি বিশিষ্ট লেখকের রচনার নিকট শতশত মহামহোপাধ্যায় পন্ডিতের পান্ডিত্য, ব্যবস্থা ও উপদেশ কোনো কার্য্যের নহে। এই শেষোক্ত মহাশয়েরা লিখনের প্রণালী ও ভাষা যেরূপ নিরূপিত করিয়া দিবেন, প্রথমোক্ত প্রকারের লেখকের লেখনীর এক এক

খোঁচায় সেই নিয়মাদি কোথাও উড়িয়া যায়। বরং সেই লেখকের নব প্রণালী কাল ক্রমে লোকের আদর্শ স্থান হইয়া উঠে। অতএব এ বিষয়ের শস্তাশস্তি ও নিয়ম আঁটা আঁটি সকল সময় অধিক কার্য্যকরী হয় না।

তবে কি প্রস্তাবিত রূপে সভা স্থাপন কর্ত্তব্য নহে? আমরা তাহাও বলিতেছি না। বিদ্বমণ্ডলী লইয়া সভা প্রতিষ্ঠিতা হয়; তাহা আমাদের বিশেষ অনুমোদনীয় কিন্তু সেই সভার কার্য্য কিঞ্চিত বিভিন্নতা হওয়া আবশ্যক।

প্রথম। তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট রীতিতে একখানি "পরিদর্শক-সাময়িক পত্র" (রিভিউ) প্রচারিত হউক। তাহাতে নূতন ও পুরাতন গ্রন্থাবলীর ইউরোপীয় আদর্শানুসারে এবং তদ্রূপ যোগ্যতানুসারে সমালোচনা করা হউক। সময়ে সময়ে লিখিবার প্রণালী ও ভাষার বিষয়ে প্রবন্ধ সকল লিখিত হইতে থাকুক। তৎপাঠে গ্রন্থ প্রণেতা ও বক্তাগণের যত উপকার দর্শিবে প্রকাশ্য ফল ভিন্ন অভীপ্সিত সাধন কদাচ হইবে না।

দ্বিতীয়। সেই সভা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার প্রশস্ত অভিধান একখানি ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হউক।

তৃতীয়। অনুবাদ সাধনোপযোগী একখানি স্বতন্ত্র অভিধানের অধুনা যেরূপ অভাব অনুভূত হয়, তদ্বারা সেই অভাব মোচনের উপায় করা হউক, ইংরাজী গ্রন্থপাঠে বিদ্বান হইয়া অনেকের মনে মাতৃভাষায় সেই সকল উচ্চতর বিষয় অনুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বাঙ্গালায় অনুরূপ শব্দ না থাকায় সে বাসনা সিদ্ধ হইয়া উঠে না। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক রাজকীয় ও শিল্পাদি সম্বন্ধীয় ভাষায় নিতান্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলে, সেই এক কাজের জন্যই তদ্রূপ সভা দেশের মহোপকার করিবে সন্দেহ নাই।

চতুর্থ। বিশ্ববিদ্যালয় যেমন উপাধিদানের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সভা তদ্রূপ ক্ষমতা গবর্ণমেন্ট হইতে গ্রহণ করিয়া উত্তম উত্তম গ্রন্থ লেখকগণকে মর্য্যাদা ও উপাধি দান করিতে থাকুক, তাহা হইলেই দেখিবেন, সেই সভা ছোট বড় সকল লেখকের নিকট পূজা পাইবার স্থান হইয়া উঠিবে। তখন সভা আপনা হইতেই সাহিত্য সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইতে পারিবেক, বেশী চেষ্টা করিতে হইবেক না। কিন্তু প্রথম উপায় অবলম্বন ও এই শেষোক্ত ক্ষমতা গ্রহণ ব্যতীত অন্যবিধ যত্ন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবার নহে।

শ্রীযুক্ত বিমস সাহেব মহাশয়ের বিবেচনাধীনে আমরা এই কয়টী প্রস্তাব অর্পণ করিলাম তিনি আমাদের গ্রাহক নহেন, এজন্য মানস করিয়াছি, তাঁহাকে বর্তমান সংখ্যার এক খণ্ড বিনীত উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিব। প্রার্থনা, আমাদের মাতৃভাষা-বিষয়িনী চিন্তাকে ঔদ্ধত্য না ভাবিয়া অনুগৃহীত করেন।[১]

১. মধ্যস্থ, ২৭ শ্রাবণ ১২৭৯।

মনোমোহন একটি চিঠি লিখে মধ্যস্থের এই সংখ্যাটি বিম্‌সকে পাঠালেন তাঁর মতামত জানতে চেয়ে। তিনি মধ্যস্থ মারফৎ তাঁর পাঠকদের জানালেন :

> বালেশ্বরের মাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর গুণকর শ্রীযুক্ত জন্ বিম্‌স সাহেব মহোদয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাষা ও রীতি সংস্থাপনী সভাস্থাপনের প্রস্তাব সূচক যে পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, অষ্টাদশ সংখ্যক মধ্যস্থে আমরা তাহার সম্যগ্ সমালোচনা করি। আমরা তাহাতে 'একাডেমী' অর্থাৎ "বুধ-সমাজ" স্থাপনের মূল প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া সভার ক্ষমতা ও কার্য্যরীতি সম্বন্ধে তিনি যে যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে তিনটী বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলাম। এবং তৎপরিবর্ত্তে আমাদের মতে যে প্রকারের সভা হইলে দেশের অবস্থানুসারে সাহিত্য সংসারের যথার্থ উপকার হইতে পারিবে, তাহাও নূতন চারিটী প্রস্তাবরূপে লিখিয়াছিলাম। লিখিয়া ভাবিলাম, এইগুলিন মেং বিম্‌স সাহেবের বিচারাধীনে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি আমাদের গ্রাহক নহেন, অতএব তাঁহাকে ইংরাজীতে স্বতন্ত্র একখানি পত্র লিখিয়া উক্ত মধ্যস্থখানি বিনীত উপহার স্বরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, বঙ্গ হিতৈষী বিম্‌স মহোদয় উক্ত পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতিপদে আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ দয়া ও শুভ ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে।[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বীম্‌সের প্রস্তাবের মূল বক্তব্যের সঙ্গে জাতীয় সভা তথা মনোমোহনের কোন বিরোধ নাই। মনোমোহন এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্যকরী করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। জাতীয় সভায় আলোচনার পর এবিষয়ে সেকালের পণ্ডিত সমাজের 'ইতি প্রসঙ্গোপরি ইতি ঘটে'। কিন্তু মনোমোহন বুঝেছিলেন একাডেমির প্রয়োজন তখন কতখানি। বীম্‌সকে মনোমোহন মাতৃভাষার পরম বন্ধু আখ্যা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় বীম্‌সের প্রস্তাবকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে সেকালের সাহিত্য সমাজের শিরোমণিদের বিরাগভাজনও হয়েছেন। কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্য ঘটলেও তিনি বীম্‌সের সঙ্গে এ বিষয়ে একটা রফা করতে চেয়েছিলেন। মনোমোহনের ৩১শে আগস্ট ১৮৭২ তারিখের পত্রটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> ...As you are wellknown to take deep interest in the progress of our Vernacular Literature and as I with many of my countrymen, feel heartily greteful to you for your recent publication of a pamphlet proposing the inauguration of an Academy which might be the sole guiding star of Bengalee Authors, I beg most respectfully to forward a copy of my Bengalee weekly "Madheastha" as an humble present and draw your attention to the Article contained in it on your much esteemed pamphlet.

---

১. মধ্যস্থ, ৩০ ভাদ্র ১২৭৯।

I hope to be pardoned for differing a little in the main plan; but I am not singular in opinions expressed therein. Baboo Raj Narain Bose, a well writer and speaker in Bengalee; has since the publication of this number of Madheastha, delivered a lecture in the National Society on the Subject of your most interesting book and has nearly drawn the same conclusions and suggested similar modifications as contained in the said number of Madheastha.

Most humbly apologiging for this encroachment on your valuable time.[১]

বীমসের কাছে অনেকেই এ বিষয়ের সমালোচনা করে পত্র লিখেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে সকলকে তিনি উত্তর দিতে পারেন নি। মনোমোহনের সারগর্ভ আলোচনা সম্বলিত মধ্যস্থের এই সংখ্যাটি বীম্‌স মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছিলেন। মনোমোহনকে তিনি যে 'উত্তর পত্র' লেখেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি উদ্ধার করা হল :

Dear Sir,

I beg to thank you for kindly enclosing me a copy of your Journal the 'Madhyastha' and for the thoughtful and appreciative article on my proposal. I quite understand your objections and I admit that they have some weight. I have received many communications from Bengalee gentlemen on the subject; so many in fact that I really have not time to answer each one seperately. I propose therfore to collect them all or at least the best of them and write an answer to them which will be published in Bengalee in "বঙ্গদর্শন" my friend Juggodish Babu will help me to prepare it.

I select this course not from any want of respect for your opinion or for that of the other gentlemen, who have kindly notcied my propcsal, but because I have very little leisure, as you know a collector has a great deal of work on his hands. I

১. মধ্যস্থ, ৩০ ভাদ্র ১২৭৯

hope you will therefore excuse my not answering your objections seperately.

I take a deep interest in all that concerns your country and its inhabitants, among whom I have formed many sincere friends and its my earnest hope that I may be able to induce them to make some effort to improve the beautiful language which they possess, and that I may always be able to be of use in every way to Bengal as long as I remain among them.

Balasore
September 1st. 1872

Yours & c
John Beams

বীম্‌সের এই চিঠি পড়লে তাঁর বাংলাভাষা প্রীতি আমাদের মুগ্ধ করবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। জগদীশনাথ রায়-এর সাহায্যে তিনি বঙ্গদর্শনে যে 'উত্তর পত্র প্রকটন' করতে চেয়েছিলেন তা যদি সম্ভব হত তাহলে একাডেমি গঠনের কাজ ত্বরান্বিত হত সন্দেহ নাই। ইংরেজী শিক্ষিত কৃতবিদ্য বাঙালীরাও আর এ বিষয়ে মাথা ঘামান নি। পরবর্তী কালে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে যা লিখেছেন তাতে দেখা যায় বীম্‌স সম্পর্কে তাঁদের কারো কারো ব্যক্তিগত ধারণাও খুব স্বচ্ছ ছিল না। তিনি লিখেছেন :

…সিভিলিয়ান Beams সাহেবের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনি দেনা করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছুদিনের জন্য পদাবনতি শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েন। ইনি বাঙ্গালী বিদ্বেষী সাহেব বলিয়া বিখ্যাত। বীমস্ সাহেবের যেমন দোষ আছে তেমনি কতকগুলি গুণও আছে। ইনি একজন নিপুণ ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী, ইনি ১৮২১ সালে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনার্থ ফরাসীস্ দেশের Franch Academy-র ন্যায় একটি একাডেমি (academy) সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই academy-র সভ্যেরা বাঙ্গালা ভাষার শব্দ প্রয়োগের শুদ্ধতা বিষয়ে যাহা অবধারণ করিবেন তাহা আমাদিগের সকলকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংবাদপত্রে ও ছাপান circular-এ এই প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। আমি এই প্রস্তাবের বিপক্ষে জাতীয় সভায় (National Society-তে) বক্তৃতা করি, সেই বক্তৃতার সারমর্ম National Paper-এ প্রকাশিত হয়। তাহা দেখিয়া Dr. Rajendralal Mitra বলেন "It is a settler" অর্থাৎ বীম্‌স সাহেব ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। যদিও বীম্‌স সাহেব বলিয়াছেন "I shall refute all the arguments of the Baboo", কিন্তু তাহার পরে তাহা আর করিলেন না অথবা পারিলেন না। ভাষাকে প্রথমে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈয়াকরণিক ও আলঙ্কারিকেরা ভাষাকে

প্রথমে নিয়মিত ও সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন। ভাষা তাহা তুচ্ছ করতঃ একটি অট্টহাস্য করিয়া আপনার গতিতে চলিয়া যায়। তবে ভাষা স্বেচ্ছাচার বিশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় চিরকাল থাকে এমত মত নহে। একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিলে তাহাকে নিয়মিত করা কর্ত্তব্য।[১]

১৮৭২ সালে বীম্‌স যে একাডেমির বীজ বপন করেছিলেন ১৮৮২-৮৪ সালে তার একবার অঙ্কুরোদগম হয়।[২] কিন্তু নানা কারণে তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। এই প্রস্তাবের ২১ বৎসর পর অর্থাৎ ২৩ জুলাই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে (৮ শ্রাবণ ১৩০০) The Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হয় শোভাবাজার রাজবাড়িতে। বিনয়কৃষ্ণ দেবের উৎসাহে একাডেমি গঠনে এগিয়ে এলেন মিঃ এল. লিওটার্ড, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রমুখ সাহিত্যানুরাগীর দল।

Bengal Academy of Literature-এর প্রথম অধিবেশনে মনোমোহনের অনুপস্থিতি বিস্ময়জনক। এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগীরা।[৩] দ্বিতীয় অধিবেশনে মনোমোহন উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একাডেমির প্রায় জন্মলগ্ন থেকে মনোমোহন এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ২৯ অক্টোবর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন একাডেমির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে ১৯ নভেম্বর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু একাডেমির সদস্য হন।[৪]

১. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত ; ২য় সং। পৃ. ১৯২-৯৩।

২. ভারতী পত্রিকায় সরলা দেবী The Bengal Academy of Literature এর মুখপত্রের প্রথম চার সংখ্যা সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বীম্‌সের প্রস্তাবের সঙ্গে এই নব গঠিত একাডেমির যোগসূত্রের কথা উল্লেখ করেন। ১৮৮২-৮৪ সালে একাডেমি গঠনের প্রয়াসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে—'দশ বার বৎসর পরে একবার একটা ক্ষীণ উদ্যম ইহাতে ব্রতী হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিল।'—বাঙ্গলা একাডেমি ; ভারতী ; পৌষ ১৩০০। পৃ. ৫৭৪।

৩. এ প্রসঙ্গে ভারতী পত্রিকায় লেখা হয়,—'মহারাজা কুমার বিনয়কৃষ্ণের শোভাবাজারস্থ ভবনে গত ২৩শে জুলাই ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। যে সকল সভ্য লইয়া এই সাহিত্য-সভা গঠিত হইয়াছে তাঁহারা কেহই সাহিত্য জগতে সুপরিচিত নহেন।···তাঁহারা প্রসিদ্ধ সাহিত্যকার না হইলেও তাঁহারা সাহিত্যানুরাগী বটে। ইঁহাদের মধ্যে একজন সভ্য আছেন তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য—মিঃ লিওটার্ড। যতদূর দেখা যাইতেছে এই বিদেশীয় সভ্য উক্ত সভার মস্তিক, দেশীয়েরা তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।'—বাঙ্গলা অ্যাকাডেমি ; ভারতী, পৌষ ১৩০০।

এই প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন—'হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মি. এল. লিওটার্ড, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, বিনয়কৃষ্ণ দেব, কালীপ্রসন্ন সেন, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামলাল গোস্বামী, আশুতোষ মিত্র, গোপালচন্দ্র গুপ্ত, সরোজমোহন দাশগুপ্ত, শ্রীমোহন দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ব্রজভূষণ গুপ্ত, হরিমোহন সরকার ও অক্ষয়কুমার দাসগুপ্ত প্রমুখ ১৭জন সভ্য।

৪. পরিষৎ পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ২২।

১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৭ই বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় Bengal Academy of Literature-কে পুনর্গঠিত করে।[১] মনোমোহন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন যথাক্রমে ১৩০১-০২, ১৩০৫ ও ১৩০৬ সালে। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য থেকে তিনি ১৩০৩ সালে নির্বাচিত হলেন সহকারী সভাপতি। কার্যনির্বাহক সমিতির বিভিন্ন অধিবেশনে মনোমোহন সভাপতিত্ব[২] করেছেন। ১৩০৬ সাল পর্যন্ত উপস্থিত থেকেছেন প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনে। এছাড়া মনোমোহন কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি ও গ্রন্থ প্রকাশ সমিতির সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছেন বিভিন্ন সময়ে। পঞ্চম বার্ষিক কার্যবিবরণ থেকে জানা যায় যে ১৩০২ সালের ২৪শে আষাঢ় তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অধিবেশনে বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীন কাব্য ও অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গ্রন্থ প্রকাশ সমিতির সৃষ্টি হয়। এই সমিতির অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন মনোমোহন। উল্লিখিত অধিবেশনেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতির উৎপত্তি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মনোমোহনের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষায় বাংলা ভাষা প্রবর্তনে পরিষদের প্রচেষ্টা সম্পর্কিত তাঁর প্রস্তাবে এটি স্পষ্ট।[৩]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৭ আষাঢ় ১৩০১ সালে। এই অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের অন্যতম ছিলেন মনোমোহন।[৪] ২৫ চৈত্র রবিবার ১৩০১ (৬ এপ্রিল ১৮৯৫) অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন ও সম্মেলন আড়ম্বরপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। মনোমোহন চেয়েছিলেন পরিষদ আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আড়ম্বর বন্ধ করতে। এই মর্মে তাঁর

১. '...১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণে পূর্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার, বর্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নামে অভিহিত করেন।—পরিষৎ পরিচয়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; পৃ. ১।

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যবিবরণ (হস্তলিখিত) থেকে জানা যায় মনোমোহন ১৩০১ সালে ৬ষ্ঠ থেকে ১৩শ অধিবেশন সভাপতিত্ব করেছেন। ১৩০২ সালে সভাপতিত্ব করেছেন যথাক্রমে ৫ম, ১০ম ও ১৪শ অধিবেশনে, ১৩০৩ সালে ৩য়, ১৩শ এবং ১৫শ অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৩০৩ সালের ১৫শ অধিবেশনের কার্যবিবরণ থেকে জানা যায়—৫. মাননীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্-এ. বি-এল মহাশয়ের পদত্যাগ পত্র পঠিত হইল। তৎপরে অন্যতম সহসভাপতি শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী সহসম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় স্ব স্ব পদ হইতে অবসর গ্রহণে ইচ্ছা করিলেন।—১৫শ অধিবেশন ১৩০৩, ৩০ চৈত্র।

৩. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস (১ম পর্ব)—মদনমোহন কুমার; পৃ. ১৫০।

৪. উপস্থিত সদস্যেরা হলেন বিনয়কৃষ্ণ দেব, এল্ লিওটার্ড, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, মনোমোহন বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী, ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেন বিনয়কৃষ্ণ দেব।—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা; ২য় সংখ্যা ১৩১৯। পৃ. ৬৬-৬৭।

সভাপতিত্বে (৬ ফাল্গুন ১৩০১ রবিবার) কার্যনির্বাহক সমিতি একটি প্রস্তাব পাশ করে।[১] কিন্তু এ প্রস্তাব ধোপে টেকে নি। বাৎসরিক অধিবেশন যথারীতি আড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[২] এই উপলক্ষে মনোমোহন দুটি গান রচনা করেন।[৩] পরিষদের নিয়মাবলী তৈরির ব্যাপারেও মনোমোহনের উৎসাহ দেখা যায়। দ্বাদশ অধিবেশনের (১৩০২, ৭ চৈত্র বৃহস্পতিবার) কার্যবিবরণ থেকে জানা যাচ্ছে: 'শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু মহাশয় পরিষদের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পাঠ করিলে পর স্থির হইল যে উহা আপাততঃ মুদ্রিত করিয়া কার্যনির্বাহক সভার সভ্যগণের নিকটে প্রেরিত হউক।' ১৩০৩ সালের ৪ বৈশাখ বুধবারের সভায় জানান হয় যে 'বিগত ২৬-এ চৈত্র তারিখের আহূত কার্য্যনির্বাহক সভায় আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধীয় মন্তব্য নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্ত্তিত হইল—সভাপতি: চন্দ্রনাথ বসু, সহ সভাপতি: নবীনচন্দ্র সেন; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।'

পরিষদের সেবায় মনোমোহনের আত্মনিয়োগ স্মরণযোগ্য। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সর্বদা নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছেন। প্রথমদিকে পরিষদ্ পুনর্গঠনে মনোমোহনের সহায়তা পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল অনেকখানি। মধ্যস্থ সম্পাদনার গুরুতর পরিশ্রমে মনোমোহন ১২৮২ সাল থেকে শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। ১৩০৬ সালে পীড়া বৃদ্ধির ফলে তাঁকে পরিষদের কর্ম থেকে বাধ্য হয়েই অবসর গ্রহণ করতে হয় বটে, তথাপি আমৃত্যু পরিষদের সঙ্গে তাঁর আত্মিক বন্ধন ছিন্ন হয় নি। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২১ মাঘ (৪ ফেব্রুআরি ১৯১২) রবিবার মনোমোহন ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মনোমোহনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুই শতাব্দীর সংযোগ-সেতু ভেঙে গেল। তাঁর মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র তাঁর অভিভাষণে বলেন: 'গত বৎসর সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনেক কর্ম্মবীর আমাদিগকে শোকসন্তপ্ত করিয়া মানবদেহ ত্যাগ করিয়াছেন।…কবিবর মনোমোহন বসু পুরাতন ও নূতন কাব্য-প্রণালীর মধ্যবর্তী ছিলেন।…কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখনী বঙ্গের কাব্যসংসার হইতে অপসৃত হইলে মনোমোহন তাঁহাদের স্থান অধিকার করিয়া কাব্য সাহিত্যকে জাগ্রত রাখিয়া যথাকালে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। মধুসূদন; দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র; নবীনচন্দ্র

১. প্রস্তাবটি ছিল 'বাৎসরিক অধিবেশন বেশী ধুমধামের সহিত না করিয়া এবং অধিক অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা না করিয়া সাধারণ ভাবে সম্পন্ন করা হউক'— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস (১ম পর্ব) —মদনমোহন কুমার ; পৃ. ১৭২।

২. তদেব ; পৃ. ১৭৪।

৩. গান দুটির প্রথম লাইন যথাক্রমে— 'আর কেন দীন হীনা মলিনা বেশে' ও '(দেখ) আসিছে, হাসিছে, উল্লাসে ভাসিছে উৎসবে' ইত্যাদি। —তদেব ; পৃ. ১৭৫-৭৬।

প্রভৃতি মহারথীগণের ভাবে, পদবিন্যাসে ও রচনাপ্রণালীতে ইউরোপীয় সাহিত্যের বিলক্ষণ আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য অলঙ্কার; অর্থ-গৌরব, ভাব ও চরিত্র রচনার মিশ্রণে আমাদের সাহিত্যকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন। মনোমোহন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন; তিনি ভারতচন্দ্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাপ্রণালীর অনুবর্ত্তী ছিলেন।'[১]

মনোমোহনের মৃত্যুর পর ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৭ ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ অধিবেশন '৺মনোমোহন বসু ও ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষদের শোক প্রকাশ'-এর জন্য আহূত হয়েছিল। এই শোক সভায় সভাপতিত্ব করেন চুণীলাল বসু। সভাপতির নাম প্রস্তাব করেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির ভাষণে চুণীলাল বসু বলেন 'অল্পদিন মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মৃত্যু হইয়াছে মৃত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মনোমোহন বসুর নিকট নাট্যসমাজ বিশেষভাবে ঋণী।' এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বাণীনাথ নন্দী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ বসু, অমূল্যচরণ ঘোষবিদ্যাভূষণ, দীনেশ-চন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, মন্মথমোহন বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙালী সাহিত্যিক। এই সভায় মনোমোহনের মৃত্যুতে পরিষদের শোক-প্রস্তাব পাঠ করেন বাণীনাথ নন্দী। শোক-প্রস্তাবে লেখা হয়:

> বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইহার আশৈশব হিতৈষী; ইহার জনৈক ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বঙ্গসাহিত্যের অতীত ও বর্তমান যুগের সন্ধি স্বরূপ বঙ্গদেশের বিশেষ বিশেষ প্রাচীন সংগীতকলায় পারদর্শী আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের মধ্যযুগের জনৈক শ্রেষ্ঠ নাট্য লেখক, সেকালের শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, প্রাচীন শিশুসাহিত্যের শক্তিমান রচয়িতা সুকবি রসভাষপটু প্রাচীন সাহিত্যিক মনোমোহন বসু মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে একটি যুগচিহ্ন লুপ্ত হইল এবং তাহাতে সাহিত্য পরিষদের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। এজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অত্যন্ত শোকানুভব করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই সভায় বাণীনাথ নন্দী 'কবি মনোমোহন বসু'[২] শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠের পর মনোমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র প্রিয়নাথ তাঁর পিতার ব্যবহৃত একটি লাঠি পরিষদের সংগ্রহশালায় উপহার দেন। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মনোমোহন নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদে ক্রীড়াকৌতুকে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বটে; কিন্তু সেই সময়ে তাঁহার হস্তে কোন না কোন পুস্তক থাকিত এবং তিনি কিছুমাত্র

১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা ১৩১৯। পৃ. ৬৬-৬৭।

২. প্রবন্ধটির জন্য জন্মভূমি, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অবকাশ পাইলেই অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন।' দীননাথ বসু মনোমোহনের অধ্যবসায় ও চারিত্র মাধুর্যের কথা উল্লেখ করেন। বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব করেন—'পরলোকগত সুকবি ও নাট্যকার ৺মনোমোহন বসু মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যকলাপ স্মরণ করিয়া তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হউক এবং ইহার সম্পাদন ভার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যনির্বাহক সমিতির প্রতি অর্পিত হউক।' প্রস্তাব পাঠের পর বিপিনচন্দ্র পাল মনোমোহনের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, মনোমোহনবাবুর বাঙ্গালা বক্তৃতা শুনে তিনিও মনে মনে বক্তা হবার আশা পোষণ করেন। মনোমোহন বসু ও রাজনারায়ণ বসুই বাংলা ভাষায় প্রথম বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। বিপিনচন্দ্র এজন্য তাঁদের 'যুগ প্রবর্তক' আখ্যা দেন। মনোমোহনের স্মৃতি তর্পণ করে নগেন্দ্রনাথ বসু, বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য, ললিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথমোহন বসু, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভায় পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র অনুপস্থিত ছিলেন।

মনোমোহনের মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিল কিনা জানা যায় না। এক সপ্তাহের মধ্যে বাণীর দুই বরপুত্র নাট্যকার মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ মাত্র চার দিনের ব্যবধানে পরলোক গমন করেন। সাহিত্য সংবাদে লেখা হয়—'মনোমোহন ও গিরিশচন্দ্র…বঙ্গ সাহিত্য গগনে দুই জনে দুই জ্যোতিষ্ক রূপে দিক আলোকিত করিয়া দিলেন। এক সময়ে সহসা দুইটী জ্যোতিষ্কই নির্বাপিত হইল।[১]

এই দীর্ঘ জীবনলাভের ফলে মনোমোহনকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়। তাঁর জীবদ্দশায় পত্নীর মৃত্যু তাঁকে অনেকখানি নিঃসঙ্গ করে তোলে। ডায়েরির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তাঁর এই নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা। হিতবাদী পত্রিকায় মনোমোহনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে লেখা হয়—'দীর্ঘজীবীদিগের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, মনোমোহন বাবুর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল; তিনি জীবনে অনেক শোক তাপ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আধিব্যাধির যন্ত্রণা ও শোকের দাবদাহ তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি স্থির, ধীর ও গম্ভীর প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন—দুঃখে দুর্দ্দিনে তিনি মেরুর ন্যায় অটল এবং তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া থাকিতেন। নিদারুণ পুত্রশোকে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইলেও তিনি নীরবে সে শোক সহ্য করিয়াছিলেন। মনোমোহন বাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার সজ্জন সমাজের সৌজন্য ও উদারতার একটী উজ্জ্বল নিদর্শন বঙ্গের বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল।[২]

তাঁর দুই পুত্র প্রিয়নাথ ও মতিলাল বিখ্যাত বোসের সার্কাসের দল গঠন করে পিতার স্বাদেশিকতার ধারাকে প্রবহমান রেখেছিলেন।[৩]

১. সাহিত্য সংবাদ ১৩১৮ ; পৃ. ৩১৭।
২. হিতবাদী, ৪ঠা ফাল্গুন, শুক্রবার ১৩১৮ সাল। সাহিত্য সাধক চরিতমালায় উদ্ধৃত।
৩. বাঙালীর সার্কাস—অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী সমাজ মনোমোহনের কর্মে ও দানে নানাভাবে পুষ্ট। ঐতিহ্যে আস্থাশীল হয়েও তিনি যুগের দাবীকে অস্বীকার করেন নি। তিনি সমকালের সামাজিক ভাবাদর্শের সহযাত্রী ছিলেন। কাব্যচর্চা, সমাজ-সংস্কার, নাট্যরচনা, সাংবাদিকতা, সভাসমিতি সংগঠন—বহুমুখী জীবনসাধনার ব্যাপ্তিতে এই মননশীল কর্মী-পুরুষটি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বহুধা কর্মকৃতিত্বের যে স্বীকৃতি সমকালের বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে দিয়েছিলেন, তার পরিচয় আজ বিস্মৃতির ধূলায় ধূসর। বর্তমান রচনায় আমরা অতীতের যবনিকা তুলে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি সমকালের প্রেক্ষাপটে এই ব্যক্তি-মনীষীর জীবনযজ্ঞের সামগ্রিক একটি পরিচয় সন্ধান করতে। তাঁর জীবন-সাধনার যদি কোন সত্যমূল্য থাকে তবে কালান্তরেও তার পরিচয় হারিয়ে যাবে না। যেদিন বাঙালী নিজেকে জানতে শিখবে সেদিন তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে।

নির্দেশিকা